গৌড় কাহিনী



শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ধারাবাহিক প্রকাশ
ভারতজ্যোতি

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক
ভারতজ্যোতি প্রকাশনী
৩০, রাখালদাস আঢ্য রোড,
কলিকাতা-২৭

মুদ্রাকর
সুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য,
ভারতজ্যোতি প্রেস
৩০, রাখালদাস আঢ্য রোড,
কলিকাত

প্রচ্ছদপট ও মানচিত্র
কয়াধুনন্দন দাস

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
দি আর্ট সেণ্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গৌড় কাহিনী

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভূমিকা

ভারতজয়ের পর ইংরাজগণ তাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় স্থাপন করায় বাঙালী হিন্দুরা বহু দিক দিয়ে লাভবান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী গ্রহণ করে তাদের অনেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে—দেশবিদেশে বহু বাঙালী উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আবার প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলার সীমান্ত বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটে। মুষ্টিমেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান এসে সরকার পরিচালনা করতেন, কিন্তু সমগ্র শাসনযন্ত্র ছিল বাঙালী কর্মচারীদের করতলগত। এই অভূতপুর্ব প্রভাবের ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির স্বাভাবিক বিদ্রোহপ্রবণতা বহুকাল স্তিমিত থাকলেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে সশস্ত্র বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক সেই সময়ে প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে বাংলাবিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করায় বিদ্রোহ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তার ফলে ইংরাজ শাসকগণ পুর্ব বিভাগ রদ করেন, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত বাংলা ত্রিখণ্ডিত হয়ে বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে এক অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। সদ্যস্থষ্ট আসাম এবং বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ দুটিতে তাদের পুর্ব প্রভাব জলবুদ্বুদের মত শূন্যে মিলয়ে যায় এবং নিজ গৃহে তারা হয়ে পড়ে পরবাসী।

সমুদ্র মন্থনের ফলে হলাহল উঠল যথেষ্ট, অমৃত বিন্দুমাত্রও নয়। কিন্তু এমন কোন মহেশ্বর ছিলেন না যিনি সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে বাঙালীর প্রাণ বাঁচান। পুর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে তাদের জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল নেতারা তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেই গুরু ভারের তলায় তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ঐশ্বর্য্য সবই নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, কিন্তু তারা প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

তৃতীয় দশকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পর অবস্থা চরমে ওঠে ; নিখিল ভারত মুসলীম লীগ তাদের নির্মমভাবে শাসন করবার সুযোগ পায়। বাংলা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়।

রোম যখন জ্বলছিল নীরো তখন মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে সংযুক্ত বাংলা যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল এখানকার হিন্দু নেতারা তখন মিলনের মধুর সঙ্গীতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলছিলেন। সেই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে ধ্বনি ওঠে—এ পথ মরণের পথ, এ পথে মুক্তি আসবে না। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করো, আগুন আপনি নিভে যাবে।

নেতাদের কাছে: যখন আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হই তরুণের বাচালতায় তাঁরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন ; জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সংবাদপত্রগুলি বঙ্গবিভাগের অনুকূলে কোন লেখা ছাপতে অস্বীকার করে। কিন্তু যে বিশ্বাস পর্বত টলায় তা আমাদের ছিল। তারই জোরে আমাদের নিউ বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং স্বাধীনতা লাভের পুণ্য দিবসে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এক শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

আমাদের আন্দোলন কোন সাময়িক হৃদয়াবেগ ছিল না। সংযুক্ত বাংলার পূর্বার্দ্ধে মুসলমানের এবং পশ্চিমার্দ্ধে হিন্দুর বিপুল সংখ্যাধিক্য অন্য সবার ন্যায় আমাদেরও বিস্ময়াবিষ্ট করত। এর হেতু অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখি উভয় অঞ্চলের ভৌগলিক ব্যবধান যেমন যথেষ্ট ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভিন্ন খাত ধরে প্রবাহিত হয়েছে। আর্য্যাবর্তের বিশাল সমভূমি পার হয়ে সুদূর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান রচনার পিছনে সেই ইতিহাসের প্রভাব বড় কম নয়। একই ঐতিহাসিক কারণে সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অস্বীকার করে।

পশ্চিমবঙ্গই গৌড়। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম উন্মেষের সময়ে

এখানকার এক যুবরাজ লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে সেখানে ভারতীয় উপনিবেশের সূত্রপাত করেন। আবার ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড় এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হোলে কনৌজের সঙ্গে যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সূত্রপাত হয় সেই সময়ে কিছু সংখ্যক গৌড় যোদ্ধা আশ্রয়ের জন্য চীন সমুদ্রের উপকূলে গিয়ে দ্বিতীয় এক উপনিবেশ স্থাপন করে। সুদূর অতীত কাল থেকে এই জনপদের উপর দিয়ে এমনি বহু ঝড়ঝঞ্ঝা যেমন বহে গেছে তেমনি এখানকার কৃষ্টি শুধু ভারতকে নয় সমগ্র পুর্বএশিয়াকে ফলেফুলে ভরিয়ে তুলেছে। বেদোত্তর যুগের কোন সময়ে এই গৌড়ভূমিতে মহর্ষি কপিল আবির্ভূত হয়ে সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তন করেন। সে সময়ে এখানে বেদের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও ধীরে ধীরে জৈনমতের প্রাধান্য দেখা দেয়; গৌড়ের পরেশনাথ পাহাড় অধিকাংশ জৈন তীর্থঙ্করের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে জৈনমতে দীক্ষা দেন এখানকার এক মহাযোগী শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহু।

জৈন ধর্মের এই প্রতিপত্তির জন্য স্বয়ং অশোক পর্য্যন্ত গৌড়ে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হোলেও বৌদ্ধমত এখানে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে স্থবির কাশ্যপ মাতঙ্গকে সম্রাট মিং-তির দূত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি গৌড়ের অধিবাসী হওয়া সম্ভব। চীনের চ্যান ও জাপানের জেন মতের প্রবর্তক মহাস্থবির বোধিধর্ম যে গৌড়ীয় সন্ন্যাসী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সঙ্গত কারণ আছে। কোন কোন দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহাসিক তাঁকে কাঞ্চিপুরের রাজপুত্র বলে দাবী করলেও সমর্থনসূচক কোন সূত্র দেখাতে পারেন নি।

অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধমত ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোপ পায়, কিন্তু পাল রাজগণের নেতৃত্বে গৌড় হয়ে দাঁড়ায় এর শেষ আশ্রয়স্থল। সে সময়ে এখানকার বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব সমগ্র এশিয়ায় অনুভূত হয়। সেই তন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্থবির কুমারঘোষ এবং অর্হৎ অতীশ দীপঙ্কর সুবর্ণভূমি ও তিব্বতে গমন করেন। গৌড়নন্দিনী তারাদেবীর প্রচেষ্টায় শ্রীবিজয়

সাম্রাজ্য মহাযানমতের পীঠভূমিতে পরিণত হয়।

পালশক্তির পতনের পর গৌড়ে বৈদিকমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হোলেও বৌদ্ধতন্ত্রের জঠর থেকে যে শৈবতন্ত্রের উদ্ভব হয় আজও তা আমাদের সমাজ ও ধর্মজীবনকে সকল দিক দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে গৌড়ে তান্ত্রিকতার এই জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে কর্ণাটাগত সেনরাজগণের উদ্যম ও কান্যকুব্জাগত কয়েকটি পরিবারের নিষ্ঠা। তাঁরা শুধু তন্ত্রকে নূতন রূপ দেন নি সমগ্র পূর্ব ভারতের রঙ্গমঞ্চে বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় করেছেন। আজও করছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরুতে এরূপ এক শক্তিশালী সমাজের চক্ষের সম্মুখে জনৈক নিরক্ষর তুর্কী সেনানায়ক বিনা যুদ্ধে সেনশক্তিকে অপসারিত করে গৌড় জয় করে নেন। কিন্তু তিনি কোন অজ্ঞাত অন্তরীক্ষ থেকে নবদ্বীপ প্রাসাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন নি; তাঁর মুষ্টিমেয় সৈনিক কোন যাদুমন্ত্র জানত না। তুর্কীদের গৌড় জয়ের পিছনে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল এবং তার ব্লু-প্রিণ্ট রচিত হয় খলিফার রাজধানী বাগদাদে। এ সম্বন্ধে বৎসরের পর বৎসর ধরে নানা গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে যে সব উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তা দিয়ে এই পুস্তকখানি রচিত হোল। হয় তো আরও বহু উপকরণ অজ্ঞাত থেকে গেছে; সেগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ গবেষকদের।

পুস্তকখানি যখন সাপ্তাহিক ভারতজ্যোতিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় পাঠকদের মনে তখন যথেষ্ট কৌতূহল জাগে। বহু পত্র আমার কাছে আসে। তা সত্বেও পুস্তকের কলেবর কমাবার জন্য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হোল।

ক র ঞ্জ লি ভ ব ন
পি ৪৫০, সি-আই-টি স্কীম নং ৪৭,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা-২৯

—শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ

সূচীপত্র

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

চতুর্স্ত্রিংশ অধ্যায়

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন যুগ

অতীতের আর্য্যাবর্ত

বাঙলা অত্যন্ত নমনীয় প্রদেশ। প্রাচীন বা মধ্য যুগে এই নামে কোন জনপদ ছিল না, বাঙালী নামে কোন সম্প্রদায়ও ছিল না। পূর্ববঙ্গকে বলা হোত বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গকে রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন—পরে বরেন্দ্র। অধিবাসীরা যথাক্রমে বঙ্গজ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে অভিহিত হোত। ভবিষ্যৎকালে অঞ্চলগুলি এক প্রদেশে সন্নিবেশিত হয়; বাসিন্দারাও ব্যাপকভাবে স্থান পরিবর্তন করে। তা সত্ত্বেও তাদের সামাজিক সংস্কার কোন পরিবর্তন হয় নি।

হরিবংশের* বিবরণ অনুসারে পরম যোগী রাজা বলি সমগ্র ভূভাগটির উপর রাজত্ব করতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে উর্দ্ধরেতা হোলে বংশরক্ষার প্রশ্ন এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এক দিন গঙ্গাস্নানের সময়ে রাজর্ষি বলি দেখেন নদীর স্রোতের উপর দিয়ে অন্ধ মুনি দীর্ঘতমা ভেসে চলেছেন। তাঁর চক্ষের সম্মুখে আশার রশ্মি ভেসে উঠল, অনেক অনুনয় করে সেই মুনিকে প্রাসাদে এনে নিজ দুর্ভাবনার কথা জানালেন। মুনিবরের ঔরসে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্মক, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কুমারগণ যৌবনে পদার্পণ করলে মহারাজ বলি নিজ রাজ্য তাদের মধ্যে

* হরিবংশ—মহাভারতের ৯৮শ পর্বাধ্যায়। শ্লোক সংখ্যা ১৬,৩৭৪। এই অংশকে ওই মহাগ্রন্থের খিল বা পরিশিষ্ট বলে মনে করা হয়।

ভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাজ্য পাঁচটি তাঁদের নামানুসারে অভিহিত হতে থাকে।১

বলির অধস্তন সপ্তদশ পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন অঙ্গাধিপতি কর্ণ। সেই কারণে হরিবংশ বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কিছু সত্যতা থাকলে রাজ্য পাঁচটির উদ্ভব হয়েছিল ভারতযুদ্ধের পাঁচ শ'—এখন থেকে প্রায় চার হাজার—বৎসর পূর্বে। অঙ্গ গঠিত হয়েছিল এখনকার ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কতকাংশ নিয়ে। রামায়ণের যুগে এখানকার অধিপতি লোমপাদ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এর রাজধানী চম্পা প্রাচীন যুগের এক প্রসিদ্ধ নগর। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গ ছিল বর্ত্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে। বৈদিক যুগ থেকে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিঙ্গ একটি উপকূলীয় রাজ্য—উত্তরে সুবর্ণরেখা ও দক্ষিণে গোদাবরী নদী এর সীমানা। সুবর্ণরেখার উত্তরদিকস্থ ভূভাগ সুহ্ম ছিল পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে মগধ ও উত্তরে অঙ্গ দ্বারা বেষ্ঠিত। এখনকার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল এই ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত। পুণ্ড্র গঠিত হয়েছিল এখনকার রাজসাহী, দিনাজপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি নিয়ে। মালদহের পূর্বাংশ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।

পরস্পর সংলগ্ন এই পাঁচটি জনপদের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট। পরবর্তী যুগে এদের সম্মিলিতভাবে পঞ্চ গৌড় বলা হোত। মূল গৌড় অবশ্য সুহ্ম, অঙ্গ ও পুণ্ড্রের সম্মেলনে গঠিত এক স্বতন্ত্র জনপদ। সে কথা পরে আলোচনা করা হবে। ভবিষ্যৎ কালে গৌড় যখন উচ্চ গৌরবের আসনে উন্নীত হয় সেই সময়ে অন্যান্য জনপদও নিজেদের বিকল্প পরিচয় হিসাবে এই নামটি ব্যবহার করতে থাকে। এইভাবে কান্যকুব্জ অঞ্চলে এক দীর্ঘস্থায়ী গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়। আবার গৌড়েশ্বরগণের বিজিত রাজ্যও পরে গৌড় নামে অভিহিত হোত।

সন্নিহিত মগধ, মিথিলা ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ সহ পঞ্চ গৌড় চিরদিন পূর্ব-ভারত বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

মহাভারতের যুগে মগধরাজ জরাসন্ধ ছিলেন পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি। তাঁর আধিপত্য নিজ রাজ্যের বাহিরেও বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চতুর্দশ দিবসব্যাপী দ্বৈরথ সমরে ভীমের হস্তে তাঁর মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র সহদেব পাণ্ডবদের আনুগত্য স্বীকার করেন। তার ফলে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞের পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হয়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কনিষ্ঠ চার সহোদরকে দিগ্বিজয়ের জন্য ভারতের চার প্রান্তে পাঠিয়ে দেন। পূর্বাঞ্চল জয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল ভীমের উপর। পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দ, চেদি, অযোধ্যা, কোশল, মৎস্য ও মিথিলার অধীশ্বরগণকে ছলেবলেকৌশলে বশীভূত করে ভীমের অভিযাত্রী বাহিনী এল সদ্য-বিজিত সামন্ত রাজ্য গিরিব্রজে—মগধে।

হেথায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি।
গিরিব্রজে সদ্য গেল ভীম মহামতি॥
সহদেব নৃপতি লইয়া বহু ধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কুলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে॥
তাহাদের জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীসুত॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর!
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর॥২

মগধ থেকে পুণ্ড্রে যেতে ভীমকে কর্ণের বিস্তীর্ণ রাজ্য অঙ্গ পার হতে হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত সহ সমগ্র সুহ্ম সে সময়ে অঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাম্রলিপ্তরাজ নীলধ্বজ কর্ণের সামন্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কর্ণ তখন হস্তিনাপুরের সদর নেতৃত্বের অন্যতম,

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দান বিতরণের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। সেই কারণে অঙ্গ পার হবার জন্য ভীমকে কোন প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। বঙ্গেশ্বর সমুদ্রসেন কিন্তু তাঁকে বাধা দেন। তাতে পরাজিত হয়ে তিনি পরে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়ে। পৌণ্ড্রাধীপ বাসুদেব তার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিলেন।

ভীষ্মের মৃত্যুর পর কর্ণ সেই মহাসমরে কৌরবদের সেনাপতি নিযুক্ত হন। অর্জুনের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হোলে তাদের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যায়। তার পর কোনও সময়ে অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পশ্চিমার্দ্ধ মগধের সঙ্গে যুক্ত হয়; পূর্বার্দ্ধ সুহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাঢ় নাম ধারণ করে। সেই রাঢ় আজও আছে।

বাংলার সংজ্ঞা

যে পাঁচটি ভূভাগ নিয়ে পৌরাণিক যুগের পূর্ব-ভারত গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বঙ্গ বরাবর অবিচ্ছিন্নভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। বাকি চারটির উপর দিয়ে বহে গেছে অন্তহীন ঝঞ্ঝা। বাহিরের আক্রমণে তারা বার বার হয়েছে বিধ্বস্ত, আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে হয়েছে বিপন্ন। এই সব বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হোলে হয় বিচ্ছিন্ন নতুবা সন্নিহিত কোন অঞ্চলের সঙ্গে মিশে নূতনতর এক জনপদে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপ বিবর্তনের ফলে পৌরাণিক যুগের কলিঙ্গ ঐতিহাসিক যুগের কোন সময়ে দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ উড়িষ্যা ও অন্ধ্রে পরিণত হয়। সুহ্ম তার বহু পূর্বে অঙ্গের একাংশ গ্রাস করে বর্দ্ধিত জনপদ রাঢ়ে পরিণত হয়েছিল। পুণ্ড্র পরিণত হয়েছিল বরেন্দ্রে। অধিবাসীদের সামাজিক সংজ্ঞার মধ্যে রাঢ় ও বরেন্দ্র আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলেও তারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বেশী দিন

রক্ষা করতে পারে নি। অজ্ঞাতনামা এক শাসক উভয় জনপদকে সম্মিলিত করে গৌড় রাষ্ট্র গঠন করেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

বঙ্গ এক বৈচিত্র্যময় ভূভাগ। এর সর্বত্র বহে চলেছে উদ্দাম স্রোতস্বিনী। সেগুলির জলরাশি ভূভাগটিকে বৎসরের কয়েক মাস জলমগ্ন করে রাখে। এই কারণে অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল যানবাহনে আরোহণ করে স্থানান্তরে গমনাগমন করা যেত এখানে সেগুলি ছিল অচল। অশ্ব ও রথ পিছনে রেখে আক্রমণকারীগণকে বিশেষ জলযানের ব্যবস্থা করতে হোত। শুষ্ক অঞ্চলের আয়ুধ ও বাহন দিয়ে বঙ্গে যুদ্ধ চালান যেত না। প্রকৃতিদত্ত এই দুর্ভেদ্যতার জন্য অপর চারিটি জনপদের বিবর্তন বঙ্গকে সহজে স্পর্শ করত না।

একই কারণে জনপদটি ছিল আর্য্য ঋষিদের কাছে অগম্য—তাই অপবিত্র। কিন্তু সে অবজ্ঞা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। পূর্ব দিকে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যরা বঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে থাকে। অযোধ্যাপতি দশরথ তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর মান ভঞ্জনের জন্য যে সব অঞ্চলের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখান বঙ্গ তাদের অন্যতম—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশীকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥ ৩

ক্রুদ্ধা মহিষীর মনস্তুষ্টির জন্য অযোধ্যাপতি বঙ্গ-মগধের ঐশ্বর্য্য এনে দিতে চাইলেও বঙ্গ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল না। মহাভারতের যুগে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নামক দুইজন রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। ভারতযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই জনপদকে কতখানি স্পর্শ করেছিল তা বলা যায় না, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এর স্বাতন্ত্র্য পরবর্তী যুগে খুব কম ক্ষুণ্ণ হোত। যে সব শক্তিশালী রাজবংশ সমগ্র

আর্য্যাবর্ত শাসন করেছে বঙ্গ তাদের অধিকারের বাইরে না থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কখনও বেশী প্রভাবিত হয় নি।

পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গকে সমতট ও দেবক নামে দুইটি সামন্ত শাসিত প্রদেশে বিভক্ত করেন। বৈন্যগুপ্ত ৫০৭ খৃষ্টাব্দে সমতটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র উত্তর ভারতে যে আলোড়ন দেখা দেয় বঙ্গ তা থেকে মুক্ত ছিল। নূতন এক গুপ্ত বংশ সেই সময়ে গৌড় অধিকার করে কান্যকুব্জের মৌখরীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়। সেই দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদের দূরে রেখে এখানকার নূতন শাসকগণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক যখন গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন বঙ্গ তখন খড়্গ বংশ শাসিত এক স্বতন্ত্র রাজ্য। সমস্ত-পৃথিবী-বিজেতা শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র জাতখড়্গ সম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখেছেন, 'বায়ু যেমন তৃণকে এবং করী যেমন অশ্ববৃন্দকে বিধ্বস্ত করে তিনিও তেমনি স্বীয় শৌর্য্য প্রভাবে সমস্ত শত্রুকুলকে ধ্বংস করেছিলেন।' তাঁর পুত্র অশেষ-ক্ষিতিপাল-মৌলমালা-মণিদ্যুতি-পাদপীঠ-নির্জর-শক্র দেবখড়্গ ছিলেন হর্ষবর্দ্ধন ও শশাঙ্কের সমসাময়িক। একদিকে হর্ষবর্দ্ধন-ভাস্করবর্মা ও অন্যদিকে শশাঙ্ক-দেবগুপ্তের কলহে উত্তর ভারত সে সময়ে যে বিশাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তা থেকে নিজ রাজ্যকে দূরে রেখে তিনি চমৎকার কূটনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই নিরপেক্ষতা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। ভাস্করবর্মার তিরোধানের পর নূতন কামরূপরাজ হর্ষদেব সসৈন্যে জনপদটি আক্রমণ করলে দেবখড়্গের পুত্র রাজারাজ সে অভিযান প্রতিহত করতে অসমর্থ হন। তাঁর রাজধানী কর্মান্ত সহ সমগ্র বঙ্গ কামরূপ রাজ্যের অধিকারে চলে যায়। কিন্তু

হর্ষদেবের এই সাফল্য একেবারেই সাময়িক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর থেকে তিব্বতীগণ এসে সমস্ত পূর্ব-ভারত অধিকার করে নেয়। ভাগ্য-দেবতা তাদের উপরও প্রসন্ন ছিলেন না। যখন তারা আর্য্যাবর্তের সমতলক্ষেত্রের উপর অবতরণ করে বিভীষিকার সৃষ্টি করছিল সেই সময়ে চীনারা এসে লাসা অধিকার করে নেওয়ায় তাদের দেশে ফিরতে হয়। সেই শূন্যতা পূরণ করেন কনৌজরাজ যশোবর্ম্মন। তড়িতাক্রমণে সমস্ত আর্য্যাবর্ত অধিকার করে তিনি দক্ষিণাপথের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু তাঁকেও পথ ছেড়ে দিতে হয় নূতনতর এক আক্রমণকারীর কাছে। কনৌজ বাহিনীকে পরাভূত করে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় সমগ্র আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ভূভাগ অধিকার করে নেন।

ললিতাদিত্যের সেই সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হোলেও তাঁর জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ আদিশূর রাঢ়ে এক সার্বভৌম রাজ্য স্থাপন করেন। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করতেন রাজা জয়ন্ত; কিন্তু বঙ্গের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তার পরই অভ্যুদয় হয় পাল বংশের। পাল রাজগণের দীর্ঘস্থায়ী শাসনের সময়ে পূর্ব ভারতের বহু জনপদসহ বঙ্গ ছিল গৌড়ের এক অঙ্গরাজ্য।

দশম শতাব্দীতে পাল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে রোহটাস্ গড়ের ভূস্বামী সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী বিক্রমপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি তখন থেকে এক বিশিষ্ট জনপদে পরিণত হয়। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্রের সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সুলতান মাহ্মুদ বার বার ভারতের ধর্ম্মমন্দিরগুলি লুণ্ঠন করেন এবং দক্ষিণ থেকে সম্রাট রাজেন্দ্র চোল রাঢ় জয় সম্পন্ন করে বঙ্গে এসে উপনীত হন। চোল বাহিনীর কাছে বিজয়চন্দ্র পরাজিত হোলেও রাজ্যচ্যুত হন নি।

বিজয়চন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্র এই বংশের শেষ নৃপতি। ইনি রূপকথার

থেকে জনপদটির অবয়ব নিয়ত পরিবর্তিত হওয়ায় তাকে বরাবর অনামা থাকতে হয়েছে। নিজস্ব নামে পরিচিত হবার সুযোগ তার কোন দিন হয় নি।

এমনি এক অনামা দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলের আগন্তুকদের সমন্বয়ে গঠিত এই দেশের ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা নেই। এখানকার অধিবাসীরা আধুনিক সভ্যতার ধারাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তেমনটি আর কেউ করে নি। অথচ নিজেদের বাসভূমির নামকরণ উৎসব পালন করা তাদের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তেরটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ নিয়ে এই দেশ যখন প্রথম গঠিত হয় তখন যেমন এর নিজস্ব কোন নাম ছিল না, অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন পঞ্চাশে দাঁড়ালেও তেমনি বৈশিষ্ট্যসূচক কোন নাম নেই। মার্কিনীদের ষ্টেট্‌সের ন্যায় আমাদের রাঢ়ও চিরদিন এক নামগোত্রহীন ভূখণ্ড!

পৌরাণিক যুগের সুহ্ম যেখানে অবস্থিত ছিল রাঢ়ের অভ্যুদয় হয় সেখানে। অঙ্গের কতকাংশকে কুক্ষিগত করে যে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তখন তার অবয়ব সঠিক কিরূপ ছিল তা বলা যায় না। বহু দিন পরে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে রাঢ়ের সীমানা দেওয়া আছে—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এই বর্ণনানুসারে গৌড় নগরীর পশ্চিম দিকে, বীরভূমের পূর্বে এবং দামোদর নদীর উত্তরে অবস্থিত এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড রাঢ় দেশ নামে পরিচিত। এখনকার বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি এই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের রচয়িতা কিন্তু লিখে গেছেন যে রাঢ় ও অঙ্গ একই জনপদ এবং গৌড়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। দুই মতের মধ্যে যে মতই নির্ভুল হোক না কেন রাঢ়ের মূল ভূভাগ যে

ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানকার মাটি কঠিন ও প্রস্তরময় এবং এতে চূণ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ যথেষ্ট দেখা যায়। কয়লা ও আকরিক লৌহে এই ভূখণ্ড খুবই সমৃদ্ধ। ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ভূত নদীগুলি দ্বারা বিধৌত এই জনপদটি উত্তরে রাজমহল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এও সম্পূর্ণ রাঢ় নয়। ভাগীরথীর পূর্ব দিকে বেশ কিছু দূরের অধিবাসীরা রাঢ়ী নামে পরিচিত। আবার ভাগলপুর অঞ্চলে যথেষ্ট রাঢ়ীর বাস আছে। তাদের ভাষা না বাংলা, না হিন্দী, না মৈথিলী। মানভূমের রাঢ়ী বোলি এর চেয়ে বেশী শুদ্ধ। রাঢ়ী অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি পূর্ব দিকে যশোর-খুলনার পশ্চিমার্দ্ধ থেকে সুরু করে রাঁচী পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত ঝালদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই রাঢ়ীদের বাসভূমি—রাঢ়।

রাঢ়ের উত্তরে বরেন্দ্র—পূর্ব নাম পুণ্ড্র। সুহ্ম যেমন বিবর্তিত হতে হতে রাঢ়ে পরিণত হয়েছিল পুণ্ড্রও তেমনি এক সময়ে পরিণত হয় সম্প্রসারিত জনপদ বরেন্দ্রে। মহাভারতের যুগে এখানকার অধিপতি পৌণ্ড্রবাসুদেব ছিলেন নিষাদরাজ একলব্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ নরকের বন্ধু। তিনি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণবাসুদেবের নেতৃত্ব অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। যখন বোঝা গেল যে যুদ্ধ ব্যতীত সেই বিরোধের মীমাংসা সম্ভব নয় পৌণ্ড্রবাসুদেব তখন আট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্বারকার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর উপর সদয়া ছিলেন না; যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পত্নী সুতনুর গর্ভজাত পুত্র পুণ্ড্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে রাঢ়ে যখন সিংহ বংশ রাজত্ব করছিল সেই সময়ে উড়ম্বরগণ পুণ্ড্র অধিকার করে। সে অধিকার যে কত দিন স্থায়ী হয়েছিল তা বলা যায় না। অজ্ঞাত কোন স্থান থেকে

আভীররা এসে তাদের দূরীভূত করে পুণ্ড্রের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এদের সুদীর্ঘ শাসনের কোন বিবরণ জানা যায় না, তবে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে এরা যে কালী মন্দির নির্মাণ করেছিল তার ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। গোয়ালপাড়া, গোয়ালবাড়ী প্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলি এই আভীরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ভোজগৌড় নামক এক কায়স্থ যোদ্ধা পুণ্ড্র অধিকার করে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করেন। নন্দভোজ পর্য্যন্ত এই বংশীয় নয়জন রাজার নাম আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু তাঁদের রাজত্বকালের কোন বিশদ বিবরণ দেন নি।৬

মহাভারতের সময়ে পুণ্ড্রের পশ্চিমদিকে কৌশিকীকচ্ছ নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এখানকার অধিপতি মহৌজকে যুদ্ধে পরাজিত করে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন তাঁর অভিযাত্রী বাহিনীসহ বঙ্গে উপনীত হন। তার পর রাজ্যটির কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না; বোধ হয় পুণ্ড্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

পুণ্ড্রের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাচীন যুগের এক বিশিষ্ট নগরী। এর সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেন গঙ্গাতীরের গৌড়, আবার কারও মতে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের স্মৃতি বহন করছে। এই দুই মতের খণ্ডন করে কোন কোন সুধী আবার বলেন মালদহের পাণ্ডুয়া প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী। এই মতই গ্রহণযোগ্য। কারণ পরবর্তী যুগে তুর্কীরা এখানে যে সব মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি নির্মাণ করে সেগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী নগরীর হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন দেখা যায়।

সেই প্রাচীন যুগেও পৌণ্ড্রগণ রণনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ

করেছিল। উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে বিভিন্ন পার্বত্য জাতি প্রায়ই তাদের রাজ্য আক্রমণ করত। এমনি এক আক্রমণের সময়ে বহু সংখ্যক পৌণ্ড্র যোদ্ধা পিছু হঠতে হঠতে একেবারে সমুদ্রতীরে এসে উপনীত হয়। এরাই দক্ষিণ রাঢ়ের দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় পোদ—পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়। পূর্বে এরা ছিল বৌদ্ধ, এখন ব্রাহ্মণ্যপন্থী। সরকারী কাগজপত্রে পৌণ্ড্রগণকে অন্ত্যজ বলে উল্লেখ করা হোলেও ক্ষত্রিয়োচিত বহু গুন এদের মধ্যে দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে সম্রাট বংশের এক শাখা পাটলীপুত্র থেকে সরে গিয়ে নিজেদের আধিপত্য পুণ্ড্র ও রাঢ়ের মধ্যে সঙ্কুচিত করে। সেই থেকে গৌড় নামটি ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর ভেসে ওঠে। এরূপ নামকরণ যে কেন করা হয়েছিল তা বলা যায় না। বোধ হয় রাজ্যটির রাজধানী ছিল গৌড় নগরী। ওই নগরীর উল্লেখ একাধিক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। জৈন হরিবংশ থেকে জানা যায় যে সুদূর অতীতেও এই অঞ্চলে গৌড়পুর ও অরিষ্ঠপুর নামে দুইটি নগরী ছিল।

প্রথম ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে গৌড়কে কনৌজের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। সেখানকার মৌখরীগণ ছিল গৌড়ের গুপ্ত বংশের চিরশত্রু। সেই কারণে উভয় শক্তির মধ্যে সংগ্রামের বিরাম কোন দিন হয় নি। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক গৌড়ে এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন, কিন্তু কনৌজের বৈরীতা পরিহার করতে পারেন নি। তাঁর তিরোধানের পর পশ্চিমদিক থেকে কনৌজ ও পুর্বদিক থেকে কামরূপ সৈন্যগণ এসে গৌড়কে ধ্বংস করে।

তারপর চলে শতবর্ষব্যাপী বিশৃঙ্খলা। সে সময়ে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও বহিরাক্রমণে গৌড় বার বার বিধ্বস্ত হয়। সেই অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে মহানায়ক গোপাল পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলে গৌড় আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে। শূর বংশের অধীনে রাঢ় তখন বহু

দিন নিজ সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল, কিন্তু পুণ্ড্র চিরদিনের মত বিলীন হয়ে যায়। তার সমাধির উপর গড়ে ওঠে নূতনতর জনপদ বরেন্দ্রভূমি।

এই নামটি পূর্বে কোন দিন শোনা যায় নি। পুণ্ড্র কেনই বা বরেন্দ্রে পরিণত হোল তার সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ বলেন যে মহারাজ বরেন্দ্রশূর নূতন জনপদটির জনক। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী এই নামীয় শূর নরপতি নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; ইনি আদিশূরের অধস্তন পঞ্চম বংশধর। কি কারণে তাঁর নামানুসারে একটি জনপদের নাম পরিবর্তিত হোল তা বলা যায় না। বরেন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

> পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
> বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ॥
> শতার্দ্ধযোজনযুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ।
> উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে॥
> ঘর্ঘরা সরিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা।
> পর্ব্বতানা নিরসনং যত্র শক্রেণ কারিতাম॥
> কায়স্থা বহুলা যত্র ব্রাহ্মণস্য চ মন্ত্রিণঃ।
> স্থানে স্থানে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভাবিনো রাজ্যকারিণঃ॥ ৭

—পদ্মানদীর পূর্ব ধার থেকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত নানা নদনদীযুক্ত ভূভাগ বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। শতার্দ্ধ যোজন বিস্তৃত দর্ভকুশাদি সংযুক্ত এই দেশ উপবঙ্গের নিকটে ও মালদহের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ঘর্ঘরা নামক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হয় এবং এর যে স্থলে ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতসকল নিরসন হয়েছিল সেখানে বহু সংখ্যক কায়স্থ ব্রাহ্মণদের মন্ত্রিত্ব করে।

নামকরণের ইতিহাস যাই হোক সংযুক্ত বাংলায় ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থায় বরেন্দ্র যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিখ্যাত গৌড় নগরী এর পূর্ব সীমান্তে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। পূনর্ভবাতীরস্থ দেবীকোট মধ্য

যুগের এক বিশিষ্ট নগরী। বর্দ্ধনকুটীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় পালরাজ ধর্মপাল সোমপুরীতে যে বিহার নির্মাণ করেছিলেন তা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তুলনীয়।

পাল শাসনের সময়ে বরেন্দ্র ছিল গৌড়ের এক অঙ্গরাজ্য। এই শক্তির অভ্যুত্থানের পূর্বেও যে গৌড়ের অস্তিত্ব ছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। অষ্টম শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর অনর্ঘরাঘব নাটকে গৌড়কে বঙ্গ, উৎকল, কাশী, কোশল প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র একটি জনপদ বলে বর্ণনা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক যখন গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন সেই সময় থেকে এই জনপদটির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পাল শক্তি শাসিত সমগ্র ভূভাগকে গৌড় বলা হোলেও মূল গৌড় সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। তাঁদের সময়ে একাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কৃষ্ণ মিশ্র লিখেছেন—

গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরূপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী ॥
ভূরিশ্রেষ্টীক নামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা ॥ ৮

এই বর্ণানানুসারে গৌড় এক নিকৃষ্ট জনপদ হলেও তার অঙ্গরাজ্য রাঢ়ের কোন তুলনা নেই। অনুরূপ নানা তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন: হিন্দু যুগের শেষ আমলে বাঙলা দেশ গৌড় ও বঙ্গ প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন রাঢ় ও বারেন্দ্রী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।···অষ্টম শতাব্দীতে রচিত অনর্ঘরাঘব নাটকে গৌড়ের রাজধানী চম্পার উল্লেখ আছে।···অসম্ভব নহে এই চম্পা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরী হইতে অভিন্ন। একাদশ শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে অঙ্গ দেশ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৯

গৌড় ও বঙ্গের এই সম্মিলিত প্রদেশ এত দিন সংযুক্ত বাঙলা নামে

অভিহিত হয়ে এসেছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড়।

গঙ্গারিডই

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের আবির্ভাবের ফলে শুধু যে দেশের সামাজিক জীবন বহু আবিলতার হাত থেকে মুক্ত হয় তা নয় ইতিহাস সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। তার পূর্বে—বহু পূর্বে—ভারতে রচিত হয়েছিল বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা। অযোধ্যার এক রাজপুত্রের জীবনকাহিনী নিয়ে মহর্ষি বাল্মিকী যে মহাকাব্য রচনা করেছেন তার কোন তুলনা নেই। মহাভারত শুধু একখানি কাব্যগ্রন্থ নয়; একাধারে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও বিজ্ঞান। গ্রন্থগুলি বিশ্বের প্রাচীনতম তো বটেই, একাধিক মানদণ্ডে আজও শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু কবে যে এগুলি রচিত হয়েছিল, আর কেই বা রচয়িতা সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। ইতিহাস তার সত্যমিথ্যা কাহিনী নিয়ে তখনও মানুষের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে নি।

বৌদ্ধদের বিবরণ অনুসারে তথাগতের আবির্ভাবের সময়ে ভারতবর্ষ অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি ষোলটি প্রধান রাষ্ট্র বা মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। কলিঙ্গ, সৌবির, বিদেহ প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলিকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। এগুলি ছিল সম্ভবতঃ প্রবলতর কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। একই সময়ে রচিত জৈন গ্রন্থ ভাগবতী থেকে লাঢ় বা রাঢ় নামে অনুরূপ আর এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সিংহলের মহাবংশেও রাঢ়ের উল্লেখ আছে।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের এই সন্ধিক্ষণে রাঢ়ে রাজত্ব করত সিংহ বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিংহবাহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

কিন্তু তাঁর জীবন পৌরাণিক উপাখ্যানের মত রহস্যময়। কলিঙ্গের রাজকন্যার গর্ভজাত বঙ্গেশ্বরের দুহিতা সুসীমা রাঢ়ের অরণ্যমধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে এক সিংহের কবলে পতিত হন। তরুণীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে সেই পশুরাজ তাঁকে উদরস্থ করবার পরিবর্তে পত্নীত্বে বরণ করে; তার গুহার মধ্যে রচিত হয় সুসীমার অরণ্য আবাস। দম্পতী সেখানে সুখময় জীবন যাপন করতে থাকেন! সিংহের ঔরসে মানবীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় তাঁদের পুত্র সিংহবাহু হয়ে ওঠেন অমিতবলশালী। মাতা ও ভগ্নীসহ পিতার অরণ্যগৃহ ত্যাগ করে যখন তিনি মনুষ্যসমাজে এসে আবির্ভূত হন তখন কারও সাধ্য হয় নি তাঁর গতিরোধ করে। রাঢ় তাঁর অধিকারভুক্ত হয় এবং সিংহপুরে স্থাপিত হয় রাজধানী। ১০

সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ ছিলেন পিতারই ন্যায় বিক্রমশালী। সাগর পার হয়ে কেমন করে তিনি লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন সে কাহিনী পরে বর্ণিত হবে। পিতৃভূমি রাঢ়ে কিন্তু তাঁর স্বজনগণের পক্ষে বেশী দিন সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সেই সময়ে মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু প্রতিবেশী রাজ্যগুলি একের পর এক জয় করে সমগ্র আর্য্যাবর্তের উপর নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঢ়ের সিংহ বংশ যদি তখন বিলীন নাও হয়ে থাকে শিশুনাগ সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। শেষ শিশুনাগ সম্রাট কালাশোক কাকবর্ণীকে হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ যখন পাটলীপুত্র অধিকার করেন রাঢ়ে তখন সিংহ শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল কি না তা বলা যায় না।

দীর্ঘকালব্যাপী নন্দাধিকারের সময়ে রাঢ় যে কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছে তা জানবার উপায় নাই। এই বংশের শেষ সম্রাট ধননন্দ ছিলেন অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত। তাঁর কুশাসন থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করে তক্ষশীলাবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্য ও তাঁর শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্তের উপর একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে এসে হানা দেয়। তাদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে সে সময়ে পূর্ব ভারতে গঙ্গারিডই নামে এক রাজ্য ছিল। যে পুস্তকে রাজ্যটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যেত মেগাস্থিনিস রচিত সেই ইণ্ডিকা এখন লুপ্ত। জ্যামিতির বিন্দুর যেমন অস্তিত্ব আছে কিন্তু পরিমাণ নেই এই বহুশ্রুত পুস্তকের তেমনি নাম আছে, কিন্তু মূল গ্রন্থখানি লোপ পেয়েছে। ইণ্ডিকার ভিত্তিতে ডিওডোরাস লিখেছেন: এখন এই গঙ্গা নদী, যা উৎপত্তিস্থলে ৩০ ষ্টেডিয়া প্রশস্ত এবং যার জলরাশি সমুদ্রে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছে, তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্ব সীমা রচনা করেছে। গঙ্গারিডই জাতি হস্তীযূথ সমন্বিত এক শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী। এই কারণে কোন বিদেশী এ দেশ জয় করতে পারে না। সব জাতি এই জন্তুগুলির শক্তি ও সংখ্যাকে ভয় করে। ১১

গ্রীকদের দেওয়া নামগুলি বিভ্রান্তিকর। চন্দ্রগুপ্ত তাদের কাছে সন্দ্রবোতাস; তাঁর প্রাচ্য সাম্রাজ্য—প্রাসাই; রাজধানী পাটলিপুত্র—পালিবোথরা; হিমালয়—হিমোকোস বা কাউকোশোস; ভৃগুকচ্ছ—বারগোসা; পাণ্ড্য—পান্দি ইত্যাদি। গঙ্গারিডই অনুরূপভাবে গঙ্গা-রাঢ় হতে পারে, অঙ্গ-রাঢ় হতে পারে, আবার গৌড়ও হতে পারে। গৌড় হওয়াই সম্ভব। কারণ একই সময়ে লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ীয় স্বর্ণের উল্লেখ আছে। গৌড় হোক আর গঙ্গা-রাঢ় হোক জনপদটি যে কখনও কোন বিদেশী কর্তৃক বিজিত হয় নি মেগাস্থিনিসের এই উক্তি মেনে নেওয়া শক্ত। ইণ্ডিকার বিবরণে দেখা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৯ হাজার রণহস্তী। পক্ষান্তরে গঙ্গারিডই বাহিনীতে ছিল ৬০ হাজার পদাতিক, ৯ হাজার অশ্বারোহী এবং ৭ শত রণহস্তী। শক্তির এই তারতম্য দেখে মনে হয়, গঙ্গারিডইর পূর্বেকার

অবস্থা যাই হোক চন্দ্রগুপ্ত অতি সহজে এই রাজ্যটি জয় করেছিলেন।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পরও গঙ্গারিডইর বিলোপ হয় নি। কুষাণদের উত্তর সাম্রাজ্য যখন আর্য্যাবর্তের অধিকাংশ অঞ্চল আচ্ছাদিত করে ফেলেছে সেই সময়ে গ্রীক ভৌগলিক টলেমি তাঁর পুস্তকে গঙ্গারিডই ও তার রাজধানী গাঙ্গে নগরীর উল্লেখ করেছেন। গ্রীক পণ্ডিত আরিয়ান এই সময়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে পুস্তক সঙ্কলিত করেন তাতেও গঙ্গারিডইর স্থান নগণ্য নয়। এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী পরে গঙ্গারিডই আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। মেগাস্থিনিসের সময়ে এর রাজধানী ছিল পার্থেলিস, এখন সরে এসেছে গাঙ্গে নগরে। কেন সরে এল তা জানবার উপায় নেই। নগর দুটির সঠিক অবস্থানও অজ্ঞাত। মাক্‌ক্রিণ্ড্‌ল অনুমান করেন, এখনকার বর্দ্ধমান নগরী মৌর্য্য যুগের পার্থেলিস।

সাংখ্যাচার্য্য কপিল

জাহ্নবীর পুণ্যধারা গৌড়ের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে এই জনপদকে কোন দিন আর্য্যবাসের অনুপযুক্ত স্থান বলে মনে করা হয় নি। এখানকার ত্রিবেণী ও গঙ্গাসাগর স্মরণাতীত কাল থেকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে স্বীকৃতি পেয়েছে; যুগ-যুগান্তর ধরে অসংখ্য নরনারী এইসব তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান করেছে।

বেদোত্তর যুগের কোনও সময়ে এখানকার সরস্বতী* তীরে এক পর্ণকুটীরে বাস করতেন মুনিবর কর্দম। তাঁর পত্নী দেবাহুতির গর্ভে নয় কন্যা ও এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার রূপের যেমন কোন তুলনা ছিল না পুত্র কপিল তেমনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা-

*সরস্বতী—এই নামীয় তিনটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মধ্যে প্রথমটির অবস্থান পাঞ্জাবে, দ্বিতীয়টির রাজস্থানে এবং তৃতীয়টির গৌড়ে—হুগলী জেলায়।

শালী। যৌবনে পদার্পণের পর তিনি যে নূতন দর্শনের প্রবর্তন করেন আজও তা সমাজ জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে।

কপিল ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানবিদ ও দার্শনিক। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে বস্তুর বিনাশ নাই—উৎপত্তিও নাই। সকল পদার্থই অবিনশ্বর। আজ তুমি দেখছ কোন বস্তু তোমার সম্মুখ থেকে লোপ পেল। ভেবো না! কাল হোক বা পরশু হোক অন্য রূপে তা ধরাপৃষ্ঠে আবার আবির্ভূত হবে। পদার্থ রূপান্তরিত হয়—লোপ পায় না। মহর্ষি কপিলের এই তত্ত্বজ্ঞান ভবিষ্যৎকালের সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার একেবারে গোড়ার কথা।

এই মহাবৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। সবাই বলে সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। যদি তাই হয়, তাঁর স্রষ্টা কে? তিনি যদি সবার ঈশ্বর, একজন সুখী ও অন্য জন অসুখী হয় কেন?

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ ১২—প্রমাণের অভাবে তাঁকে সিদ্ধ করা যায় না। কোন্ প্রমাণ তোমরা দেবে? তোমরা কেউ তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছ? আর কেউ দেখেছে? অতএব তাঁকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা চলে না। অনুমান দিয়েও তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সকল অনুমানের ভিত্তি থাকা চাই। জ্ঞাত কোনও বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এরূপ বস্তুর অনুমান করা সম্ভব নয়। এমন কোন বস্তু তোমাদের জানা আছে যার সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছেন? সে ক্ষেত্রে তিনি অনুমানসিদ্ধ নন। আপ্তসিদ্ধ?—না তাও নন। শ্রেষ্ঠতম আপ্তবাক্য তো বেদ। কিন্তু বেদে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ থাকলেও প্রকৃতি যে শ্রেষ্ঠতর সে কথা তো ভালভাবেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

তোমরা কল্পনা দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছ, আবার কল্পনা দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছ। তাই জিজ্ঞাসা করি তোমাদের কল্পিত এই ঈশ্বর বদ্ধ না মুক্ত? যদি তিনি বদ্ধ হন, তাঁকে অনাদি অনন্ত বলা

হয় কেন? যদি মুক্ত হন, তিনি প্রতিনিয়ত জীব সৃষ্টি করছেন কিসের প্রয়োজনে?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন এত সংশয় রয়েছে তখন কি দরকার তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাবার? তাঁকে স্বীকার না করলে ক্ষতিই বা কি? জীবের প্রয়োজন তো মুক্তি। সে মুক্তি আসে সম্যকজ্ঞান লাভ করলে —বিবেক সাক্ষাৎ হোলে। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্বীকার বা অস্বীকারে কি আসে যায়? হয় তো তিনি আছেন, হয় তো নেই। তাঁর প্রসঙ্গ ত্যাগ করে নিজেকে জানতে শেখো, হৃদয় শুদ্ধ রাখো, জীবহিংসায় বিরত থাকো, সামবেদ গান করো—একদিন না একদিন তুমি অনন্তের মাঝে বিলীন হবে। তখন মুক্তি—তার পূর্বে নয়।

যে যুগে অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে, অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টঙ্কারে, রথের ঘর্ঘর আর পথের কল্লোলে, বীণার সঙ্গীত আর নূপুর ঝঙ্কারে রাজপথ মুখরিত হোত এবং তারই অদূরে নির্বাক শান্ত স্নিগ্ধ সংযত গম্ভীর উদার তপোবনের মাঝে ব্রাহ্মণ তপস্যায় রত থাকতেন সেই যুগে যে কপিলদর্শনের উদ্ভব হয়েছিল এমন কথা কল্পনা করা যায় না। এরূপ উৎকট নাস্তিকবাদ মেনে নেওয়া শক্ত, আবার এই বিরাট প্রতিভাকে উপেক্ষা করাও চলে না। তাই যুগে যুগে দার্শনিকরা কপিলকে নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ গোড়ার দিকে তাঁর অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁদের মনে সংশয় দেখা দেয়। কপিলদর্শনের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঘোষণা করেন, সাংখ্য শব্দের অর্থ যখন সম্যক বিবেক দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ তখন সর্বভূতের উপর যে একজন ঈশ্বর আছেন এ কথা না মেনে উপায় নেই। তবে তিনি অপ্রমেয়—প্রমাণের উর্দ্ধে। ঈশ্বরাসিদ্ধে।

পাতঞ্জলি আরও এক ধাপ এগিয়ে পুরাপুরি ঈশ্বরবাদী হয়ে উঠলেন। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর উচ্চ স্থান পেলেন। শঙ্করাচার্য্য সমর্থন

করলেন পাতঞ্জলিকে—কিন্তু কপিলকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। কপিল যুগমানব—কপিল মহর্ষি। তিনি ঈশ্বর না মানলেও উচ্ছৃঙ্খলতাকে তো সমর্থন করেন নি। আস্তিকদের ন্যায় তিনিও তো মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই শঙ্কর ঘোষণা করলেন, কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য ও পাতঞ্জলির সেশ্বর সাংখ্যের লক্ষ্য যখন এক তখন উভয় সাংখ্যই সমর্থন-যোগ্য। কপিলের মতে আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি, পাতঞ্জলির মতে যোগ প্রভাবে মুক্তি। কপিল বাসুদেব, পাতঞ্জলি অনন্ত।

এমনি সব ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে জনসাধারণ কপিলকে বাসুদেবের অবতার বলে গ্রহণ করল, তাঁর মধ্যে বহু অলৌকিক শক্তি আরোপিত হোল। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি এরূপ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। ঈশ্বরবাদীদের কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্যই বোধ হয় তাঁকে আসুরি প্রভৃতি শিষ্যসহ লোকালয় থেকে বহু দূরে সরে যেতে হয়েছিল। গৌড়ের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে রচিত হয়েছিল তাঁর আশ্রম। ষড়্‌দর্শনের অন্যতম দর্শন সাংখ্যসূত্র এখানে প্রথম প্রচারিত হয়। সে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বের কথা। কিন্তু আজও প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য নরনারী সেখানে সমবেত হয়ে সেই মহামুনির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়।

১ হরিবংশ ৩১।৩২-৪২

২ মহাভারত, সভাপর্ব, ভীমের দিগ্বিজয়

৩ বাল্মিকী রামায়নম্, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, ৩৭-৩৯

৪ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রম্, ৭ম পটল, ১৭, ৫২

৫ যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬

6 Abul Fazle Allami *Ain-i-Akbari, Gladwin's trans., Vol. 11, p. 313*

৭ কবিরাম, দিগ্বিজয় প্রকাশ, ৭৫৫-৬৩

৮ কৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্, দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃঃ ৭

৯ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৭

10 *Mahavamsa, Chap. VI*

11 McCrindle J. W. *Ancient India as described by Magasthenes and Arrian, p. 33, 139, 155*

১২ সাংখ্যসূত্রম্ ৫।১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক যুগের উন্মেষ

একদা যাহার বিজয়ী সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়

ভারতের ন্যায় সিংহলেও ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত হয় তথাগতের আবির্ভাবের সময় থেকে এবং সে ইতিহাস রচনা করেন রাঢ়ের যুবরাজ বিজয় সিংহ। রঙ্গমঞ্চের পর্দা তিনি উত্তোলন করেন। তার পূর্বে সিংহলে মানুষ ছিল, কিন্তু ইতিহাস রচনার মত উপাদান তারা সৃষ্টি করতে পারে নি। মেণ্ডিস বলেন: সাত শত অনুচরসহ বিজয়ের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের ইতিহাস সুরু হয়েছে বলে সবার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, এই দ্বীপের প্রাচীন কাহিনীর প্রামাণ্য গ্রন্থ মহাবংশে সেই ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে সিংহলে প্রথম সভ্য মানুষের বসতি সুরু হয় এই সময় থেকে।[১]

মহাবংশের বিবরণ অনুসারে বিজয় সিংহ ছিলেন রাঢ়পতি সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতার সিংহাসন লাভের পিছনে রয়েছে নিজ সার্থপতি পিতাকে হত্যা। তিন তীরের আঘাতে সেই পশুরাজকে নিহত করায় তাঁর মাতামহ কলিঙ্গাধিপতি তাঁকে রাঢ়ের আধিপত্য প্রদান করেন। কিন্তু হউন তিনি রাজা, জন্ম তো সিংহের ঔরসে! তাঁকে পতিত্বে বরণ করবে কে? উপযুক্ত পাত্রী যখন মিলল না তখন জননী সুসীমার নির্দেশে সিংহবাহু নিজ ভগ্নী সিহসিবলির পাণি গ্রহণ

করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁদের বত্রিশটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বিজয় জ্যেষ্ঠ।

সর্ব দেশের সর্ব কালের ঔপনিবেশিকদের ন্যায় বিজয় সিংহ ছিলেন শৈশব থেকেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। সংযত জীবন তাঁর ধাতে সইত না। রাঢ়ের যুবরাজ তিনি, দুদিন পরে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হবে। সে কথা তিনি জানতেন, কিন্তু নিজেকে তৈরী করবার জন্য একটুও আগ্রহ দেখাতেন না; শিক্ষকদের সকল অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে দলবলসহ সারাদিন চারিদিকে উপদ্রব করে বেড়াতেন। তাঁর নাম শুনলে সবাই ভয়ে শিউরে উঠত। প্রতিকারের আশায় প্রজারা মাঝে মাঝে রাজদরবারে অভিযোগ জানাত। কিন্তু রাঢ়াধীশ নিরুপায়! উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সংশোধন তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তিনি বিজয়কে উপদেশ, পরে তিরস্কার এবং তারও পরে উত্তরাধিকার হরণের ভয় দেখালেন। কিন্তু যুবক তখন সকল সংশোধনের বাইরে চলে গেছে। অসহায় রাঢ়পতি পুত্রের মস্তকার্দ্ধ মুড়িয়ে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন!

তাম্রলিপ্ত বন্দরে প্রস্তুত হোল তিনখানি প্রকাণ্ড অর্ণবপোত। প্রথমখানিতে উঠলেন বিজয় সিংহ ও তাঁর সাত শত অনুচর, দ্বিতীয়খানিতে তাঁদের সাত শত সহধর্মিণী এবং তৃতীয়খানিতে পুত্র কন্যাগণ। আহারবিহার ও বিলাসব্যসনের পর্য্যাপ্ত আয়োজন নিয়ে সব জাহাজই এক সঙ্গে নোঙ্গর তুলল। মনঃক্ষোভ গোপন করবার জন্য মহারাজ সিংহবাহু রাজসভায় যোগদানে বিরত থাকলেন, মহারাণী সিহসিবলি প্রাসাদাভ্যন্তরে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন!

প্রতিখানি জাহাজের কাণ্ডারী ছিলেন নৌ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। বহু বার তাঁরা সমুদ্রযাত্রা করেছেন এবং যাত্রাশেষে নিরাপদে দেশে ফিরেছেন। এবারও তাঁদের মনে কোন সংশয় জাগে নি। সুরু থেকেই জাহাজগুলি অনুকূল হাওয়া পেয়ে নদীর মোহনা ছাড়িয়ে সমুদ্রে

গিয়ে পড়ল, তাদের মৃদুমন্থর গতি দেখে যাত্রীদের মুখে হাসি ফুটল। তারা বুঝে নিল যাত্রা শুভ হয়েছে। কিন্তু আবহাওয়ার কথা কেউ বলতে পারে না। একদিন ঈশান কোণে এক টুকরা ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল; দেখতে দেখতে সারা আকাশ সেই মেঘে ছেয়ে গেল। সুরু হোল ঝঞ্ঝার প্রলয় নৃত্য। নাবিকরা প্রাণপণে চেষ্টা করল নিজ নিজ জাহাজকে বাঁচাতে, কিন্তু ঝড়ের বেগে কে যে কোথায় চলে গেল তা কেউ বুঝতে পারল না।

কোন দুর্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সে দিনের সেই দুর্যোগেরও অবসান হতে বেশী সময় লাগে নি। ঝড় থেমে গেলে প্রতি জাহাজের আরোহীরা সানন্দে দেখল, তারা অক্ষত রয়েছে। অন্যেরা হয় তো সমুদ্রের অতল জলে ডুবে গেছে! কিন্তু কেউ ডোবে নি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সবার উপর ছিল। ঝড়ের দাপটে শিশুদের জাহাজ ভাসতে ভাসতে নাগদ্বীপে গিয়ে নোঙ্গর করে, স্ত্রীলোকদের জাহাজ নোঙ্গর করে মহেন্দ্রদ্বীপে এবং পুরুষদের জাহাজ সুর্পারকপত্তনে। বিজয় ও তাঁর অনুচরগণ সেই দ্বীপে অবতরণ করলেন।

কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েও বিজয়ের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নি। তাঁকে বিপন্ন দেখে সুর্পারকপত্তনবাসীরা যথেষ্ট সমবেদনা দেখিয়েছিল; সমাদরের কোন ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু তার প্রতিদানে বিজয় সিংহ সাধারণ সৌজন্য দেখানর প্রয়োজনও অনুভব করেন নি। আতিথেয়তার এই অপব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে দ্বীপবাসীরা সকল আগন্তুককে বলপ্রয়োগে দূরীভূত করে দেয়।

আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হোল। বিজয়ের জাহাজ চলেছে তো চলেছে। চারিধারে জল, সুধু জল। ভূভাগের লেশমাত্রও কোথাও নেই। অথচ জাহাজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত খাবার কমে আসছে, পানীয় জল আর বেশী নেই। এইভাবে আর কয়েক দিন চললে সব

শেষ হয়ে যাবে; মহাসমুদ্র হবে সবার সলিল সমাধি। এমনি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে নাবিকদের মন যখন ভারাক্রান্ত সেই সময়ে এক দিন দিকচক্রবালে দেখা গেল গাছের সারি, পাখীর ঝাঁক। বিজয়ের জাহাজ উপনীত হয়েছে তাম্রপর্ণী দ্বীপে—লঙ্কায়।

একই দিনে দুই হাজার মাইল উত্তরে আর্য্যাবর্তের কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘটে। সে আজ দুই হাজার পাঁচ শ' ছয় বৎসর পূর্বের কথা। সিংহলের ইতিহাস সুরু হয় সেই দিন থেকে, ভারতের ইতিহাস সুরু হয়েছিল তার বিরাশী বৎসর পূর্বে বুদ্ধাবির্ভাবের সময়ে।

তাম্রপর্ণীতে সে সময়ে যক্ষরাজ মহাকালসেনা রাজত্ব করতেন। রাঢ়ীদের আগমন সুনজরে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু যক্ষকন্যা কুবেণী বিজয়ের প্রতি অনুরক্তা হয়ে তাঁকে বললেন: শোন বিজয় সিংহ, শীঘ্রই আমাদের রাজকন্যা পোলামিত্তার বিবাহ। তাই তিনি মায়ের সঙ্গে এই শিরিবাত্তু সহরে এসেছেন। দেখছো না সারা সহরে উৎসবের বন্যা বইছে! আরও সাত দিন এমনি চলবে। এই উপযুক্ত সময়, আজই তুমি যক্ষদের ধ্বংস করো।—বিভীষণ আর একবার সোনার লঙ্কাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিল! কুবেণীর সাহায্য পেয়ে বিজয় সিংহ অক্লেশে দ্বীপটি জয় করে নিলেন। তাঁর বংশের নাম থেকে লঙ্কার নূতন নাম হোল সিংহল। তাম্বপালি নগরে স্থাপিত হোল রাজধানী। পরে তাঁর মন্ত্রীগণ অনুরাধাপুর, উপাতিস্স, উজ্জেনী, উরুবেলা ও বিহিতা নামে পাঁচখানি গ্রাম নির্মাণ করেন।[২]

রাজ্যলাভের পর কুবেণীকে দূরে নিক্ষেপ করতে বিজয় একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। রাঢ় থেকে সস্ত্রীক রওনা হলেও তিনি ও সহযাত্রীরা সহধর্মিণীদের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহাসমুদ্রে ঝঞ্ঝা উঠে সেই যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার পর তাদের আর কোন সন্ধান নেই। অথচ সিংহাসনে বসতে হোলে রাণী চাই; রাণী না

থাকলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না ; রাজবংশ রক্ষা পায় না। বিজয় সিংহ তাঁর মহিষী হবার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

মান্নার উপসাগরের এপারে সে সময়ে পাণ্ড্যগণ রাজত্ব করত। তাদের রাজধানী মাদুরা তখন দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরী। রাজা মলয়ধ্বজের ঐশ্বর্য্যের কোন অন্ত ছিল না। কিন্তু তিনি অপুত্রক, কন্যা তাতাতকৈকে পুত্রবৎ পালন করছিলেন। এই কন্যাই পাণ্ড্যরাজ্যের ভাবী অধিশ্বরী। অথচ প্রতিবন্ধক অনেক। সেই কারণে রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করে বিজয়ের দূত যখন বহুমূল্য উপঢৌকন-সহ মাদুরায় এসে উপনীত হোলেন রাণী কাঞ্চনমালার সঙ্গে পরামর্শ করে পাণ্ড্যরাজ সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। রাজকুমারী তাতাতকৈর সঙ্গে বিজয়ের ও তাঁর সাত শত অনুচরের সঙ্গে সাত শত পাণ্ড্য তরুণীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হোল।

দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর বিজয়ের মৃত্যু হোলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অমাত্য তিসানউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে উপাতিস্য নগরী অধিকার করে নেন।৩ তাঁকে দমন করেন বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব। শাক্যবংশীয় তরুণী ভদ্রকছন্দের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের পুত্র অভয়সহ কয়েকজন নরপতির অধীনে লঙ্কায় সিংহ শাসন অর্দ্ধশতাব্দীকাল চলবার পর ৪৫৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে এক গণ-অভ্যুত্থানের ফলে এই বংশের পতন ঘটে। তখন তারা গৌড়-বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে!

গৌড়ের ইতিহাস চলতে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরে।

শিশুনাগ সাম্রাজ্য

ভারত ইতিহাসের তরঙ্গ বেয়ে চলেছে গৌড়ের ইতিবৃত্ত। সেই কারণে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে এই জনপদের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে ভগবান বুদ্ধ

যখন মানুষকে নূতন পথের সন্ধান দিচ্ছিলেন সেই সময়ে সমকালীন গ্রীসের ন্যায় ভারতও কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে রাজ্যগুলির অধিপতিরা মহাজনপদগুলি শাসন করতেন। এই রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কোশলপতি প্রসেনজিৎ, অবন্তির প্রদ্যোৎ, কৌশম্বীর উদয়ন, গিরিব্রজের ভট্টির এবং চম্পার ব্রহ্মদত্ত। রাজ্যগুলি সার্বভৌম হলেও অধিপতিরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। কৌশম্বীরাজ উদয়নের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা বাসবদত্তার। আবার গিরিব্রজাধিপতি ভট্টিয়ের পুত্র কুণিক বিম্বিসার বিবাহ করেছিলেন প্রসেনজিতের ভগ্নী বাসবীকে। শাসককুলের এই সব বৈবাহিক সম্পর্ক সমসাময়িক ইতিহাসের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

বিম্বিসারের জন্ম হয় খৃষ্টের ৫৫৮ বৎসর পূর্বে। তাঁর পিতামহ শিশুনাগ ছিলেন কাশীর অধিপতি, পিতা ভট্টির মগধের। কি ভাবে মগধ ভট্টিরের অধিকারভুক্ত হয় তা জানা যায় না। উত্তরাধিকারসূত্রে বিম্বিসার কাশী ও মগধের অধীশ্বর হয়ে বসেন এবং কোশলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় প্রভূত শক্তির অধিকারী হন। রাজন্যসমাজে কোশলরাজ প্রসেনজিতের মর্য্যাদা ছিল খুবই উচ্চ। ভগ্নী বাসবীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই স্নেহের অংশভাগী হয়ে বিম্বিসার আত্মপ্রসারের জন্য পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেরাতে থাকেন।

চম্পার অধিপতি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিম্বিসারের পিতা ভট্টিরের সম্পর্ক কিছু মধুর ছিল না। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধও একবার হয়েছিল। পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সেই যুদ্ধের জের টানতে থাকেন। তাঁর সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী চম্পার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে বৃদ্ধ রাজা ব্রহ্মদত্ত তাদের গতিরোধ করতে অসমর্থ হন। চম্পা বিম্বিসারের রাজ্যভুক্ত হয় এবং সেখানকার ক্ষত্রপ নিযুক্ত হন তাঁর পুত্র অজাতশত্রু।[৪]

চম্পার পরই রাঢ়। সমসাময়িক জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সুহ্মভূমি ও ব্রজভূমি নামে দুই অংশে বিভক্ত এই জনপদে সে সময়ে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী ধর্মসাধনায় রত ছিলেন। এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জৈনগণ নীরব থাকলেও মহাবংশে সিংহবাহুকে রাঢ়ের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় কোন সূত্র থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। এর হেতু কি? চম্পা জয়ের পর বিম্বিসার কি কোনও সময় রাঢ়ের উপর নিজের অধিকার প্রসারিত করেছিলেন? সিংহ বংশ কি ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর জলবুদ্বুদের ন্যায় ভেসে উঠে আবার শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল?

বিম্বিসারের পিতামহ শিশুনাগের নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ শিশুনাগ বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সময়ে এই বংশের অধিকার যে কত দূর বিস্তৃত হয়েছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। রাজ্যলাভের জন্য অজাতশত্রু পিতাকে কারারুদ্ধ করতেও ইতস্ততঃ করেন নি। যে মাতুল প্রসেনজিতের* সহায়তা তাঁর বংশের উন্নতির মূল তাঁর রাজ্য পর্য্যন্ত তিনি আক্রমণ করেছিলেন। তাতে তিনি পরাজিত ও বন্দী হলেও ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ প্রসেনজিৎ ভাগিনেয়ের মুক্তি দিয়ে নিজ কন্যা বাজিরাকে তাঁর হস্তে অর্পণ করেন।

এই বিবাহের ফলে কোশলের সঙ্গে মগধের মৈত্রীবন্ধন নূতন করে স্থাপিত হয় এবং অজাতশত্রুর উত্তর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পড়ে কোশলের উপর। পরাক্রান্ত শাক্য বংশের দক্ষিণমুখী অগ্রগতির পথে প্রধানতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কোশল। সেই থেকে শাক্যদের সঙ্গে কোশলের যে সংঘর্ষ সুরু হয় প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক কর্তৃক শাক্য বংশ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তার বিরাম হয় নি। এই সীমান্তে অন্য দুই

* অজাতশত্রুর মায়ের নাম চেল্লনা। প্রসেনজিতের ভগ্নী বাসবী তার বিমাতা।

শত্রু বৃজি ও লিচ্ছবিদিগকে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর বশীভূত করে অজাতশত্রু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তার ওপারে সাইরাস প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য। প্রথম দারায়ুস ৫২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে সেখানকার সিংহাসনে আরোহণের পর বিশ্বজয়ে বহির্গত হয়ে পশ্চিমে মিশর ও এশিয়া মাইনর থেকে সুরু করে পূর্বে গান্ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সকল ভূভাগ জয় করেন। তাঁর বিজয়বাহিনী সিন্ধুনদের তীরে এসে উপনীত হোলে সেনাপতি সাইলাক্সের উপর নির্দেশ আসে এক শক্তিশালী নৌবহর প্রস্তুত করবার জন্য।৫ অজাতশত্রুর সঙ্গে দারায়ুসের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। তাতে দারায়ুস জয়ী হোলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যেত, পরাজিত হোলে শিশুনাগ সাম্র্যাজ্য প্রসারিত হোত ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত।

দারায়ুস এত দিন পরে তাঁর সমকক্ষ শক্তির সম্মুখীন হয়েছেন। যে যুদ্ধে লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনা বেশী তাতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে তীক্ষ্ণধী দারায়ুস পূর্ব সীমান্ত থেকে গোপনে সৈন্য অপসারণ করে ইউরোপের দিকে পাঠাতে লাগলেন। বিচ্ছিন্ন গ্রীসের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু হোল। কিন্তু প্রথম অভিযান গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত পৌছাতে পারে নি ; দ্বিতীয় অভিযাত্রী বাহিনী ম্যারাথন প্রান্তরে গ্রীকদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি যতখানি ক্ষয় হয়েছিল মর্য্যাদাহানি হয়েছিল তার চেয়ে বেশী। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য দারায়ুসের উত্তরাধিকারী জারেক্সিস ব্যাপকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করেন। গজ ও রথসৈন্য সংগৃহীত হয় ভারতের গান্ধার ও পাঞ্জাব থেকে। সেই বিশাল অভিযাত্রী বাহিনী গ্রীসে উপনীত হোলে লিওনিদাসের নেতৃত্বে স্পার্টানগণ থার্মোপলির গিরিবর্ত্মে প্রবলভাবে বাধা দেয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই যুদ্ধে জারেক্সিস জয়ী হোলেও তাঁর সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সালামিসের

যুদ্ধে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ীভদ্র জারেক্সিসের সমসাময়িক শিশুনাগ সম্রাট। তাঁর সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠা। তাঁর পরে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ৫০৩-৪৯৭), নাগদশক (৪৯৭-৭১), দ্বিতীয় শিশুনাগ (৪৭১-৫৩) এবং কালাশোক (৪৫৩-৪০৩) পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনিরুদ্ধ ছিলেন অত্যন্ত স্ত্রৈণ। রাণী ভদ্রাদেবীর উপর তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিল না। তাঁর সময় থেকে শিশুনাগ সাম্রাজ্যের যে অধঃপতন সুরু হয় কেউ তা রোধ করতে পারে নি। অঙ্গরাজ্যগুলি একে একে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, সর্বত্র দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। অবশেষে কালাশোক কাকবর্ণীকে হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ যখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন সাম্রাজ্যের আয়তন তখন সঙ্কুচিত হতে হতে মগধ ও গৌড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

পাটলিপুত্র নগরীর উত্থান ও পতন

মগধের প্রাক্তন রাজধানী গিরিব্রজ ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনাপুরের ন্যায় প্রাচীন নগরী। বেদোত্তর যুগের কোন সময়ে কুশাত্মজবসু এই নগর নির্মাণ করেন। মহাভারতের সময়ে জরাসন্ধ এখান থেকে মগধ শাসন করতেন। তারপর আসেন বৃহদ্রথ ও তাঁর বংশধরগণ। বুদ্ধাবির্ভাবের সময়েও গিরিব্রজ মগধের রাজধানী; কিন্তু তখন জীর্ণতার ছাপ সর্বত্র। নগরীর পুনর্গঠন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ায় বিম্বিসারের নির্দেশে স্থপতি মহাগোবিন্দ গিরিব্রজের এক প্রান্তে নূতন রাজধানী নির্মাণের কাজ সুরু করেন। রাজা তখনও জৈন মতে বিশ্বাসী বলে প্রথমে নির্মিত হয় জিন মন্দির। তার অদূরে বিম্বিসারের সুরম্য প্রাসাদ দেখিয়ে পথিকগণ নূতন রাজধানীকে রাজগৃহ বলে অভিহিত করতে থাকে।[৬]

এই নির্মাণকার্য্য যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল সেই সময়ে ভগবান

বুদ্ধ সশিষ্য সেখানে আসেন। বৈভার শৈলের শীর্ষদেশে বসে তিনি যখন জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দিতেন দলে দলে লোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই অমৃতবাণী শুনত। অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষা নেয়—নৃপতি বিম্বিসারও নেন। সেই থেকে বৌদ্ধমত হয় মগধের রাজধর্ম এবং নূতন রাজধানী রাজগৃহ গড়ে উঠতে থাকে বৌদ্ধকেন্দ্ররূপে। তার পর থেকে তথাগত মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। তাঁর তপস্যার জন্য দক্ষিণমুখী নামে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার অদূরে জীবকগৃহে বসে তিনি জনসাধারণকে দর্শন দিতেন। তাঁর সদ্ধর্মপুণ্ডরীকাক্ষ এই রাজগৃহে রচিত হয়। এখানে বসে তাঁর প্রিয় শিষ্য কাত্যায়ন জ্ঞান-প্রস্থান, সারিপুত্ত ধর্মস্কন্ধ ও সঙ্গীতিপর্য্যায়, মোগ্গলানা প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র এবং বসুমিত্র প্রকরণপাদ রচনা করেন। সকল অর্হতেরই আশ্রম এখানে ছিল। এখানকার শৈলকুঠীতে তপস্যা করতেন তথাগতের দক্ষিণ হস্ত অর্হৎ আনন্দ। এই রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি।

আবার এই রাজগৃহে বার বার বুদ্ধদেবের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়। বিম্বিসার তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন শুনে জৈন নিগ্রন্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারবার চক্রান্ত করে। দেবদত্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি রাজগৃহে এসে তাঁকে বধ করবার চেষ্টা করতে থাকেন এবং একদিন সুযোগ বুঝে তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। যুবরাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের বন্ধু হোলেও এরূপ গর্হিত কার্য্য সমর্থন করেন নি। তাঁর আদেশে তথাগতের নির্বাণলাভের পর তাঁর দেহাবশেষ রাজগৃহে রক্ষিত হয়।

অজাতশত্রু যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন রাজগৃহের নির্মাণকার্য্য তখন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে এখানে রাজধানী রাখা তিনি সমীচীন মনে করেন নি। চম্পা তাঁর নিজের হাতে গড়া সহর। সেখানকার ক্ষত্রপ থাকার সময়ে তিনি নগরীর

পৌরব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন করেছিলেন। তাঁর আদেশে শিশুনাগ সাম্রাজ্যের রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

উদায়ীভদ্র সিংহাসনে আরোহন করে দেখেন, বিশাল শিশুনাগ সাম্রাজ্যের রাজধানী ধারণ করবার মত শক্তি ক্ষুদ্র চম্পার নেই। দূরবর্তী প্রদেশগুলির সঙ্গে এই নগরীর যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। তাই তিনি আর একবার রাজধানী অপসারণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর পিতার সময়ে বৃজীদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গঙ্গাতীরবর্তী কুসুমপুর গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ তখন জীবিত। বৈশালী যাবার পথে গ্রামটি দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সেই স্থান এক বহুল জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হয়ে অগ্নি, জল ও বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত সইবে।

বহু জায়গায় অনুসন্ধানের পর স্থপতিরা মত দিলেন যে তথাগত কোন ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। নগর নির্মাণ ও রাজধানী স্থাপনের পক্ষে কুসুমপুর উত্তম স্থান। তাঁদের সুপারিশে এবং মহামন্ত্রী বিশ্বাকরের সমর্থনে সম্রাট উদায়ীভদ্র তাঁর অভিষেকের চতুর্থ বৎসরে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শিশুনাগ সাম্রাজ্যের এই নূতন রাজধানী প্রাচীন ভারতের বৃহত্তম নগরী—পাটলিপুত্র।

উদায়ীভদ্র ছিলেন জৈন। সেই কারণে জৈন স্থবিরাবলীতে লেখা আছে যে তিনি জিন মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও সৌধমালা শোভিত পাটলিপুত্রকে এমনই সুষমামণ্ডিত করেছিলেন যে দেখলে মনে হোত যেন অর্হৎ ধর্ম প্রচারের জন্য নগরটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য নগরীর এই সমৃদ্ধি বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। উদায়ীভদ্রের তিরোধানের পর শিশুনাগ সাম্রাজ্যের যে পতন সুরু হয় তা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে পাটলিপুত্রের পল্লীতে পল্লীতে। রাজধানীর শ্রীহীনতা তখন নগরবাসীদের বিমর্ষ করে তুলত।

নন্দযুগের সুরুতে পাটলিপুত্র নূতন জীবন লাভ করে। তখন

পাটলিপুত্র শুধু ভারতের নয় বিশ্বের এক সমৃদ্ধতম নগরী। ঐশ্বর্য্যশালী নন্দ সাম্রাজ্যের নাভিকেন্দ্ররূপে শাসকগণ এর উন্নয়নের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। এখানকার পথঘাট ও পৌরব্যবস্থা দেখে গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী পর্য্যটকরা বিস্ময় প্রকাশ করত। অট্টালিকা ও উদ্যানশোভিত এই নগরীর স্থান তখন এথেন্সেরও উপরে। মেগাস্থিনিসের হিসাব অনুযায়ী পাটলিপুত্রের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ ষ্টেডিয়া—১৬ মাইল; প্রস্থ ১৫ ষ্টেডিয়া—৩ মাইল। চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত এই নগরীর বিভিন্ন তোরণদ্বার দিয়ে নগরবাসীরা বহিরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত।

পাটলিপুত্রের বিখ্যাত সুগাঙ্গেয় প্রাসাদ নির্মিত হয় নন্দ যুগে। রাজধানীর অন্যান্য হর্ম্মরাজির ন্যায় প্রাসাদটিও ছিল কাষ্ঠনির্মিত। তা সত্বেও এর কারুকার্য্যের কোন তুলনা ছিল না। মেগাস্থিনিসের মতে সুসা বা এগবাতানা প্রাসাদের তুলনায় সুগাঙ্গেয় ছিল অধিকতর মনোরম ও জমকালো।[৭] পাতঞ্জলির লেখায়ও এই প্রাসাদের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত কাষ্ঠনির্মিত পুরাতন প্রাসাদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁর সময়ে সুগাঙ্গেয় প্রাসাদের প্রভূত সংস্কার সাধন করা হয়—প্রস্তর ব্যবহৃত হয় ব্যাপকভাবে। অশোকের সময়ে প্রাসাদটি পুরাপুরি প্রস্তর নির্মিত।

মৌর্য্যযুগের বহু পরে ফা-হিয়েন যখন পাটলিপুত্রে আসেন সুগাঙ্গেয় তখন পরিত্যক্ত। গুপ্ত সম্রাটরা বাস করতেন অন্যত্র। তবু ভগ্নপ্রায় সুগাঙ্গেয় প্রাসাদের বিশালত্ব দেখে তিনি অনুমান করেছিলেন যে এর নির্মাণের জন্য মৌর্য্য সম্রাটকে নিশ্চয়ই যক্ষদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ওই যে প্রকাণ্ড পাথরে গড়া প্রাকার ও তোরণদ্বার যক্ষ ছাড়া আর কে সেগুলি নির্মাণ করতে পারে?

সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং দেখেন, পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অতীতযুগের বহু স্মৃতি লুক্কায়িত রয়েছে, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যের একান্তই অভাব। পূর্বের মত রাজপথ দিয়ে রাজার রথ চলে না,

ফেরিওয়ালারা সওদা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ফেরে না, গৃহিণীরা দুধে জল দেওয়ার জন্য গোয়ালাকে তিরস্কার করে না। মন্দির আছে পুরোহিত নেই, বিহার আছে শ্রমণ নেই, পাঠশালা আছে ছাত্র নেই। শুধু ইট আর ইট। চারিদিকে ভগ্ন অট্টালিকা, শুষ্ক কূপ আর বনাকীর্ণ উদ্যান। সব শেষ হয়ে গেছে!

কোথায় গেল প্রাচীন ভারতের সেই গর্বিত নগরী? এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হোলে সম্রাট বংশের এক শাখা পূর্ব দিকে সরে এসে সঙ্কুচিত গৌড়ের উপর রাজত্ব করতে থাকে। কান্যকুব্জের মৌখরীদের সঙ্গে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলবার সময়ে পাটলিপুত্র বার বার হাত বদলায়। যুদ্ধমান সৈনিকদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাটলিপুত্রবাসীরা সে সময়ে নগর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায়। সেই কারণে তার দুই শত বৎসর পরে হিউয়েন-সাং ভারত পর্য্যটনে এসে বিধ্বস্ত পাটলিপুত্রে ভগ্ন অট্টালিকা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি।

সেই ধ্বংসাবশেষও এখন আর নেই। মা ডৌন-লিন্ নামক এক চীনা পরিব্রাজক ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করতে এসে দেখেন, হো-লং বা হিরণ্যবাহ—শোন নদী—উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে; তার পূর্ব তীর স্রোতের বেগে ধ্বসে পড়ছে। সেই ধ্বসের ফলে বোধ হয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় কিম্বদন্তীর নগরী পাটলিপুত্র।

তথাগতের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়!

গরিমাময় নন্দ যুগ

যে মহাপদ্মনন্দ শিশুনাগ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে পাটলিপুত্র অধিকার করেন তাঁর সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। পুরাণের বিবরণ অনুসারে তিনি শিশুনাগ বংশীয় রাজা মহানন্দীর পুত্র—শূদ্রানীর গর্ভজাত। জৈন গ্রন্থে কিন্তু লিখিত আছে

যে পাটলিপুত্রবাসী ক্ষৌরকার দিব্যকীর্তি তাঁর পিতা। ক্ষৌরকারপুত্র এক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রীক লিপিকারগণ বলেন যে শেষ শিশুনাগ সম্রাট কালাশোকের মহিষী প্রাসাদের এক ক্ষৌরকারের প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য গোপনে স্বামীহত্যা করেন।

স্বামীঘাতিনী নারী এক নাপিতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করল এবং মন্ত্রী ও সভাসদরা তাকে রাজা বলে মেনে নিল এরূপ কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। একই সময়ে লিখিত বৌদ্ধ উপাখ্যান অনুসারে মহাপদ্মনন্দের আসল নাম উগ্রসেন। প্রথম জীবনে তিনি এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের দলপতি হয়ে চারিদিকে লুঠতরাজ চালাতে থাকেন। দুর্বল রাজশক্তির পক্ষে তাঁকে দমন করা সম্ভব হয় নি। সুযোগ পেলেই তিনি অরণ্যকন্দর থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর সাহস ও শক্তি বেড়ে যায়, রাজসৈন্যদের হাত থেকে কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে নেন। এইভাবে ছোটখাটো একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোলে উগ্রসেন শিশুনাগ শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন এবং ৪৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সম্রাট কালাশোক কাকবর্ণীর হাত থেকে পাটলিপুত্র অধিকার করেন।

নন্দাধিকার যে ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক মহাপদ্মনন্দ যে একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্যলাভের পর তিনি উপযুক্ত লোকের অন্বেষণ করতে থাকেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে সে সময়ে পাটলিপুত্রবাসী পণ্ডিত কল্পের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁকে মহামন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হয়। মহাপদ্মের অধিনায়কত্ব ও কল্পের শাসনব্যবস্থার ফলে পুর্বের অন্ধকারময় যুগের অবসান হয়, নন্দাধিপত্য আর্য্যাবর্তের সর্বত্র প্রসারিত হয়। যে সব সামন্ত নরপতি এত দিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন কল্পের দৃঢ়তার ফলে তাঁরা কর্তব্য

সচেতন হয়ে ওঠেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের প্রয়োজনও হয়েছিল। এ বিষয়ে মহাপদ্মের ভ্রাতাগণ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের পর মহাপদ্মনন্দ প্রজাদের আর্থিক ও নৈতিক মান উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁর উদ্যমের ফলে জাতি নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে থাকে। শুধু ধনেজনে নয়, শিল্প ও কৃষ্টিতে পাটলিপুত্র এই সময়ে সমসাময়িক এথেন্সের সমকক্ষ নগরীতে পরিণত হয়। এখানে যে পণ্ডিতসভা বসত পাণিনি, পিঙ্গলা, বররুচি প্রমুখ মনীষীগণ তাতে অংশ গ্রহণ করতেন।[৮] সবার রচনা সেই বিদগ্ধ সভায় পঠিত হোত। তাঁদের মনীষার দ্যুতি আজও বিচ্ছুরিত হোলেও পাণিনির স্থান সবার উপরে। ম্যাক্সমুলারের মতে এই মহাবৈয়াকরণ নন্দযুগের শেষ দিকে বিদ্যমান ছিলেন।[৯] সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে কৌশম্বি নগরে তাঁর জন্ম হয়। আবার মতান্তরে জন্মস্থান গান্ধারের অন্তর্গত সালাতুর। পিতার নাম সোমদত্ত, মাতার নাম দাক্ষী। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি পাটলিপুত্রে এসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে থাকেন। তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ এখানেই রচিত হয়। এরূপ সুসম্পূর্ণ ব্যাকরণ পৃথিবীর কোন ভাষায় কখনও রচিত হয় নি।

বররুচি ছিলেন পাণিনির সহধ্যায়ী। তাঁর অপর নাম পুনর্বসু। কাত্যায়ন নামেও তিনি অভিহিত হোতেন। জন্মস্থান পাটলিপুত্র। সংস্কৃত ও পালী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং যৌবনে পদার্পণের পর তিনি নন্দ সম্রাটের সভাকবি নিযুক্ত হন। কথিত আছে যে প্রত্যহ ১০৮টি নূতন শ্লোক রচনা করে তিনি সম্রাটের মনোরঞ্জন করতেন। কিন্তু রাজানুগ্রহ লাভ করেও মন্ত্রী শকটালের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁকে বহু উৎপীড়ন সইতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত মনঃক্ষোভে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁর পত্নী উপঘোষা পতিবিরহে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দেন।

ভবিষ্যৎকালে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায়ও বররুচি নামীয় দ্বিতীয় এক কবির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু নন্দযুগীয় বররুচির গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত বররুচিবাক্যকাব্য, যোগসাধক, রাক্ষসকাব্য, একাক্ষর কোষ, একাক্ষর নামমালা, একাক্ষরাভিধান, পত্রকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মহাপদ্মনন্দের পর তাঁর পুত্র সুমালী পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন কল্পের পুত্র। এইভাবে রাজবংশের ন্যায় মন্ত্রীবংশ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়লেও কোন অযোগ্য হস্তে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার পড়ে নি। কল্পবংশীয় মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতার গুণে ব্যবসা বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। বহুমূল্য পণ্যসম্ভার নিয়ে 'দ্রব্যক'গণ দেশবিদেশে যেত এবং নানা দেশের ঐশ্বর্য্য আহরণ করে 'বঞ্চক'গণ নন্দরাজ্যে ফিরত। এই সমৃদ্ধি রাজার রাজকোষেও প্রতিফলিত হয়। রাজকোষে এত অর্থ জমে গিয়েছিল যে প্রজারা শেষ নন্দরাজের নাম ভুলে গিয়ে তাঁকে ধননন্দ বলে ডাকত।

যোগনন্দের মন্ত্রী শকটাল সে যুগের একজন বিখ্যাত শাসক। তাঁর কথা একবার বলেছি। তাঁর সঙ্গে কবি বররুচির মনোমালিন্য হওয়ায় রাজা তাঁকে সরিয়ে বররুচিকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনা কবির কাজ নয়; তাই বররুচিরই অনুরোধে শকটালকে পুনর্নিয়োগ করা হয়।

শকটালের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলভদ্র জৈনমতে দীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করায় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীয়স মন্ত্রীত্বের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু পিতার প্রতিভা বা ভ্রাতার নীতিজ্ঞান এই যুবকের মধ্যে ছিল না। সে সময়ে ম্যাসিডন থেকে যে ঝঞ্ঝা উঠে প্রবলবেগে পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছিল তার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা তাঁর কাজ নয়। সে কথা বুঝতে পেরে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে নন্দ বংশ ধ্বংস করেন।

এ্যারিষ্টোটল ও চাণক্য

দারায়ুস ও জারেক্সিস গ্রীক সর্পকে কাঠি-ঘা করেছিলেন, সংহার করেন নি। ম্যারাথন-থার্মোপলিতে পারসিকদের কাছে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তাদের আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন অনুভব করে। সে দিক দিয়ে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হোলেও পেরিকলস্ নামক এক প্রতিভাবান নায়কের পরিচালনায় এথেন্স যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। সেখানে বহু কালজয়ী সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের শীর্ষে ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টোটল। ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসী শেষোক্ত মনীষী জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রীসে গিয়ে দীর্ঘ ১৭ বৎসর প্লেটোর কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। ম্যাসিডোনিয়ারাজ ফিলিপ গ্রীসের বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি একে একে জয় করে দেশে ফিরবার সময়ে তাঁকে নিজ রাজধানীতে এনে পুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার ভার তাঁর হস্তে অর্পণ করেন।

সে যুগে ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহারবিজ্ঞানে এ্যারিষ্টোটলের সমান পাণ্ডিত্য আর কারও ছিল না। তাঁর লিখিত এথিক্স, পোয়েটিক্স ও পলিটিক্স থেকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মেটাফিজিক্সে তিনি দেখিয়েছেন যে যুক্তি দিয়ে সব জিনিষের ব্যাখ্যা করা চলে না। বিভিন্ন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির তারতম্য স্বীকার করে তিনি বলতেন যে একজনের সামর্থ্যে যে কাজ সম্পন্ন হয় অন্যের দ্বারা তা নাও হতে পারে। এই গুরুর কাছে প্রেরণা লাভ করে তরুণ আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

উত্তর ভারত সেই সময়ে নন্দ সম্রাটদের অধিকারভুক্ত। এই বংশীয় রাজা সর্বার্থসিদ্ধি মোরীয় নগরের শাসক নিযুক্ত হয়ে দুই পত্নী মুরা ও সুনন্দা সহ সেখানে অবস্থান করতেন। এক সময়ে সন্নিহিত অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে গর্ভবতী মুরাকে নিরাপত্তার জন্য পাটলিপুত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে জন্ম হয় তাঁর একমাত্র পুত্র চন্দ্রগুপ্তের।

বৈমাত্র ভ্রাতাদের সঙ্গে সেই শিশুর বনিবনা না হওয়ার জন্য হোক বা সুশিক্ষার জন্য হোক জননী মুরা তাঁকে পাঠিয়ে দেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশীলায়। সেখানকার অধ্যাপক বিষ্ণুগুপ্তের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত তাঁর চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন।

বিষ্ণুগুপ্তই চাণক্য। পিতা চণকের নাম থেকে তাঁকে এই নামে অভিহিত করা হোত। আবার রাজনীতিতে তিনি কূটমন্ত্রবিশারদ ছিলেন বলে কৌটীল্য নামেও পরিচিত হয়ে রয়েছেন। তিনি গ্রীসের সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টোটলের সমসাময়িক। ভারতের পাণিনি ও বররুচিও তাঁর সময়কার লোক। কিন্তু কি গ্রীক, কি ভারতীয় কোন মনীষীই রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। সকলের সম্মিলিত প্রতিভা যেন তাঁর একার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ছয় হাজার শ্লোক সম্বলিত কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রের তুলনা কোথায়? রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে এরূপ প্রাঞ্জল রচনা খুব কম আছে। জ্যোতিষে তাঁর বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর নীতিসারের বাণী চিরনূতন ও চিরপুরাতন। এই মহাপ্রতিভাধর ভারতে থাকবেন, আর গ্রীকরা এসে এ দেশ জয় করে নেবে? এ্যারিষ্টোটল তৈরী করেছেন আলেকজাণ্ডারকে—চাণক্য তৈরী করলেন চন্দ্রগুপ্তকে।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎকার কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। নন্দ রাজসভায় অপমানিত ব্রাহ্মণ কুশ ঘাস তুলতে তুলতে অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবকের সাক্ষাৎ পেলেন এবং উভয়ে নন্দ বংশ ধ্বংসের শপথ গ্রহণ করলেন এরূপ নাটকীয় ঘটনা নাটকেই সম্ভব—বাস্তবে নয়। চাণক্য পণ্ডিতের কালজয়ী গ্রন্থগুলি রাতারাতি লেখা হয় নি। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাঁর উপজীবিকা এবং এই উপলক্ষে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর চতুষ্পাঠীতে সেই মহাবীরের জীবনের ছয় সাত বৎসর সময় কেটে যায়। তিনি ও অনার্য্য রাজপুত্র পর্বত

ছিলেন সেখানকার সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র। অসাধারণ ধীশক্তির জন্য গুরু উভয়কে স্বহস্তনির্মিত স্বর্ণসূত্র পরিয়ে সম্মানিত করেন। চতুষ্পাঠীর আরও একজন ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কবিখ্যাতিও একজন পেয়েছিলেন। কিন্তু গুরুর দেওয়া উচ্চতম সম্মান লাভ করেন কেবলমাত্র চন্দ্রগুপ্ত ও পর্বত।

1 Mendis G. C. *Early History of Ceylon, p. 1*
2 *Mahavnsa, Trans. W. Geiger, Chap. VII & VIII*
3 Philalathes H. *History of Ceylon, p. 23*
4 *Cambridge History of India, Vol. I, p. 309-10*
5 Vincent A. Smith *Early History of India, 3rd ed. p. 37*
6 *Ibid. p. 309-13*
7 Panikkar K. M. *Survey of Indian History, p. 35*
8 Diwakar R. R. *Bihar Through the Ages, p. 238*
9 Max Muller F. *Ancient Sanskrit Literature, p. 304-10*

তৃতীয় অধ্যায়

মৌর্য্য যুগে গৌড়

গ্রীক-মৌর্য্য সংঘর্ষ

পিতার জীবদ্দশায় আলেকজাণ্ডার চিরোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই জয় ও এ্যারিষ্টোটলের শিক্ষা তাঁকে বিশ্বজয়ের প্রেরণা জোগায়। তাঁর অন্তর্নিহিত যে শক্তি আত্ম-প্রসারের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল ফিলিপের মৃত্যুর পর কুড়ি বৎসর বয়সে তা বিকাশের সুযোগ পায়। দারায়ুস ও জারেক্সিস নির্মিত পথ ধরে তিনি পূর্ব দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তাঁর অভিযাত্রী বাহিনী ৩৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে দার্দেনেলিশ প্রণালী পার হয়ে এশিয়া মাইনরে অবতরণ করে। অঞ্চলগুলি তখনও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে সাম্রাজ্যের ছায়া আছে—কায়া নেই। প্রায়-স্বাধীন ক্ষত্রপদের নিয়ে সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করছিলেন। তাঁর না ছিল শক্তি, না ছিল বৈভব। নিজের ছায়া দেখলেও তিনি শিউরে উঠতেন।

শত্রু যখন সীমান্ত অতিক্রম করেছে তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না। সম্রাট দারায়ুস তাঁর জামাতার অধীনে এক শক্তিশালী বাহিনী পশ্চিম সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গ্রীকদের হাতে তারা বারবার পরাস্ত হচ্ছে শুনে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজেও রণক্ষেত্রে চলে গেলেন। তাঁর আগমনে যুদ্ধের ধারা বদলে যায়, আলেকজাণ্ডারের অগ্র-গতি প্রতিহত হয়। কিন্তু এই সাফল্য সাময়িক। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ইসাসের যুদ্ধে পারসিকগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তৃতীয় দারায়ুস সাহায্যের জন্য ভারতে দূত পাঠান।

পাঞ্জাব তখন পারস্য সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পেলেও সেখানকার প্রধান নরপতি পুরুর সঙ্গে তৃতীয় দারায়ুসের সৌহার্দ্য ছিল। তাঁর আহ্বান পেয়ে পুরুরাজ সৈন্য সংগঠিত করতে থাকেন। সেই অভিযাত্রী বাহিনী পারস্যে পৌঁছাবার পূর্বে তৃতীয় দারায়ুসের পতন হয় এবং আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে ভারতের দ্বারদেশে এসে উপনীত হন। তাঁর বিশাল বাহিনী দেখে সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। দারায়ুস-বিজয়ীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার সামর্থ্য কার আছে? তক্ষশীলারাজ অম্ভি বিনা যুদ্ধে গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধি করেন।

ক্ষুদ্র তক্ষশীলা যা করেছে শক্তিমান পুরুর পক্ষে তা শোভা পায় না। শতদ্রু তীরে তিনি আলেকজাণ্ডারের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। সংখ্যাবহুল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ের আশা অবশ্য তিনি করেন নি, কিন্তু বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণও সম্ভব নয়। আলেকজাণ্ডার ইচ্ছা করলে তাঁর রাজ্য গ্রাস করতে পারতেন, কিন্তু তাতে এ্যারিষ্টোটলের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যেত। ভারত জয়ের জন্য পুরুকে তাঁর চাই! নারায়ণী সৈন্য অপেক্ষা নারায়ণ বড়। বিজয়ী ম্যাসিডোনীয় ঔদার্য্যের ভাণ করে পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন, তাঁর প্রসার-পরিকল্পনায় পুরুরাজ বিশিষ্ট স্থান পেলেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁর অভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে যখন পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছিলেন তক্ষশীলা চতুষ্পাঠীতে বসে চাণক্য সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। যুদ্ধের গতি দেখে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে মুমূর্ষু পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষে গ্রীকদের গতিরোধ করা সম্ভব হবে না। ভারত সীমান্তের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও তাদের চাপ সইতে পারবে না। কিন্তু জন্মভূমিকে বাঁচাতে হবে। এই মহান ব্রত পালন করবার জন্য তৃতীয় দারায়ুসের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কোনও সময়ে চাণক্য তক্ষশীলা ছেড়ে চলে আসেন মগধে। সেখানে রচিত হয় তাঁর মহামন্ত্র—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

মগধে এসে চাণক্য দেখেন, অগাধ ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও নন্দবংশের সর্বত্র ঘুণ ধরেছে। ম্যাসিডন থেকে যে ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসছে তার গতিরোধ করা এই আত্মসর্বস্ব রাজবংশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে দুই তরুণ শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত ও পর্বতকে প্রেরণা দেন নন্দবংশ ধ্বংসের জন্য।

এদিকে পুরুর পরাজয়ের পর আলেকজাণ্ডার সংবাদ সংগ্রহের জন্য আর্য্যাবর্তের সর্বত্র গুপ্তচর পাঠান। তাদের নেতা ফিজিয়াস তাঁকে জানান যে সিন্ধুর মরুভূমি পার হয়ে ১২ দিনের হাঁটাপথ অতিক্রম করলে পৌঁছান যাবে গঙ্গাতীরে; সেখান থেকে সুরু হয়েছে প্রাসাই বা প্রাচ্য দেশ। তার সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে ২ লক্ষ পদাতিক, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৪ হাজার গজসৈন্য ও ২ হাজার রথী। সংবাদ শুনে আলেকজাণ্ডার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতদিন তাঁর ধারণা ছিল যে দারায়ুসকে যখন তিনি পরাজিত করেছেন তখন তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া আটকায় কে? কিন্তু ফিজিয়াস একি সংবাদ আনল? এই বিশাল বাহিনী—একি সত্য? পুরুরাজের ডাক পড়ল। তিনি সে রিপোর্ট সমর্থন করায় যুদ্ধবিলাসী ম্যাসিডোনীয় বিপর্য্যয় এড়াবার জন্য স্বদেশের দিকে রওনা দিলেন।

কিন্তু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। পথে তাঁর মৃত্যু হোলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভারতস্থ প্রতিনিধি ইউমেডিস পাঞ্জাব অধিকার করবার দূরাকাঙ্খা নিয়ে পুরুরাজকে গোপনে হত্যা করেন। ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত গিয়ে উপনীত হন শতদ্রু তীরে। গ্রীকরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হয়, কিন্তু গবিনীর যুদ্ধে তাদের সামরিক বল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হয়।

এই বিপর্য্যয়ের সংবাদ মূল গ্রীক শিবিরে পৌঁছালে গ্রীক-এশিয়ার নূতন অধীশ্বর সেলুকস নিকেটর* তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ ভারতে

*নিকেটর=বিজয়ী

আসেন। কিন্তু তিনিও চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজয় বরণ করেন এবং পশ্চিমে কাবুল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁর হস্তে সমর্পণ করে সন্ধি করতে বাধ্য হন। নিজ কন্যাকেও তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। বিজয়ী শত্রুকে কন্যা সম্প্রদান সে যুগে বশ্যতা স্বীকারের লক্ষণ বলে মনে করা হোত।

চন্দ্রগুপ্তের মগধ জয়

ভারতের যে সকল সীমান্ত অঞ্চল আলেকজাণ্ডার জয় করেছিলেন প্রথম দারায়ুসের সময় থেকে দুই শত বৎসর ধরে সেখানে চলছিল পারস্য প্রভাব। শিশুনাগ, নন্দ বা অন্য কোন ভারতীয় শক্তি সেগুলি মুক্ত করবার চেষ্টা করে নি। গ্রীকদের আঘাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অরাষ্ট্র জনপদগুলির ভারতভুক্তি সম্ভব হয় নি। এখন সেগুলিকে সম্মিলিত করে নিজস্ব এক রাজ্য গঠন করবার পর চন্দ্রগুপ্ত নন্দ সম্রাটের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর সৈন্য বাহিনীতে শক, হূণ, কম্বোজ, পারসিক, বাহ্লিক সবই ছিল। এক অক্ষৌহিণী গ্রীক সৈন্যও বাদ যায় নি। কিন্তু শত্রু অত্যন্ত প্রবল। যে শক্তির ভয়ে আলেকজাণ্ডারের ভারত জয়ের স্বপ্ন টুটে গিয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়া সহজ কথা নয়।

নন্দ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর মিশ্র বাহিনীসহ বার বার এগিয়ে আসেন আর ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিজ শিবিরে ফিরে যান। হয় তো তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করে কোন অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু পশ্চাৎ দিক থেকে নন্দ সৈন্যগণ এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাদের তুলনায় তাঁর সামরিক বল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাই আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে বিজিত ভূভাগ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। উৎকৃষ্টতর রণকৌশল ব্যতীত এরূপ অসম যুদ্ধে জয়লাভের আশা কম। চিন্তাভারাক্রান্ত মনে এক দিন নগর ভ্রমণে বেরিয়ে অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে চন্দ্রগুপ্ত নিজের ভুল বুঝতে পারেন। জনৈক গৃহিণী তাঁর

পুত্রকে পিষ্ঠকের মধ্যভাগ খেতে দেখে বলছিলেন : ছেলেটার সব কাজ ঠিক যেন চন্দ্রগুপ্তের মত। সেই যোদ্ধা যেমন নন্দ সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ উপেক্ষা করে সুরক্ষিত নগরগুলোর উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন ও তেমনি পিঠের পাশগুলো বাদ দিয়ে মাঝখানে কামড় দিচ্ছে!

ছদ্মবেশী চন্দ্রগুপ্তের কানে জননীর অনুযোগ পৌঁছালে তিনি বুঝতে পারেন কোথায় তাঁর ভুল হচ্ছে। শিবিরে ফিরে গিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষদের উপর আদেশ দিলেন নন্দ সাম্রাজ্যের অরক্ষিত অঞ্চলগুলি আগে জয় করতে। এই নূতন রণনীতিতে যুদ্ধ পরিচালনা খুব সহজ হয়ে যায়। একের পর এক জনপদসমূহ জয় করতে করতে তাঁর ঝটিকাবাহিনী যখন মগধের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে দলে দলে নরনারী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। সম্রাট ধননন্দের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ এতদিন ধূমায়িত হচ্ছিত এইবার তা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। জনগণের এই নৈতিক সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তের মিশ্রবাহিনী যত পাটলিপুত্রের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে নন্দ সৈন্যদের মনোবল তত ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত ধননন্দের পক্ষাবলম্বন করবার মত লোক বেশী ছিল না। মহামন্ত্রী শ্রীয়স করেন আত্মগোপন।

জনসাধারণ চন্দ্রগুপ্তকে মেনে নিলেও নন্দপক্ষীয়রা চুপ করে বসে থাকে নি। ধননন্দের সিংহাসন ত্যাগের পর মন্ত্রী শ্রীয়স ম্লেচ্ছরাজ মলয়কেতুকে দলে টেনে নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করেন। এই কাহিনী অবলম্বন করে বিশাখদত্তের বিখ্যাত নাটক মুদ্রারাক্ষস রচিত হয়েছে। নাটক বর্ণিত রাক্ষস শ্রীয়সের নামান্তর। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অবশ্য চাণক্যের কৌশলে বশীভূত হয়ে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।

এরূপ বিদ্রোহের আশঙ্কা চাণক্য পূর্বাহ্ণে করেছিলেন। সেই কারণে নন্দবংশের পতনের পর তাঁর আর একজন ছাত্র জাতিল্য

মন্ত্রতর্পের উপর সদ্য-বিজিত রাজ্যের সংহতি সাধনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। দৃঢ় হস্তে তিনি বিদ্রোহ দমন, রাজ্যের পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। তাঁকে পাটলিপুত্রে রেখে চন্দ্রগুপ্ত সশস্ত্র বাহিনীসহ যাত্রা করেন দূরান্ত প্রদেশগুলি জয়ের জন্য। এইভাবে মহামনীষী গুরুর নির্দেশে তক্ষশীলা চতুষ্পাঠীর তিনজন ছাত্র ভারতকে নবজীবন দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সম্রাজ্ঞী দুর্দ্ধরা

গ্রীক রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করলেও চন্দ্রগুপ্তের পাটরাণী ছিলেন শেষ নন্দসম্রাট ধননন্দের কন্যা দুর্দ্ধরা। বিশাল এক রণক্ষেত্রের মাঝে এই রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চারিদিকে তখন অগণিত সৈন্য, কিন্তু তারই মাঝে তিনি নিজের জীবনসঙ্গিনীকে চিনে নিয়েছিলেন। সেদিনকার সেই দৃষ্টি ছিল শুভদৃষ্টি। তাই দুর্দ্ধরার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ফল কল্যাণকর হয়েছিল। অভিষেকের সময়ে তাঁকে তিনি সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং যতদিন সেই নারী ইহলোকে বিদ্যমান ছিলেন ততদিন তাঁর সমস্ত সাফল্য আবর্তিত হয় তাঁকে ঘিরে।

নন্দ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সামগ্রীক অভিযানের সময়ে চন্দ্রগুপ্তের ঝটিকা-বাহিনী একের পর এক জনপদ মুক্ত করতে করতে পূর্ব দিকে এগিয়ে আসে, আর বিক্ষুব্ধ নন্দ-প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। অসংখ্য পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথী নিয়ে যখন তিনি রাজধানী অবরোধ করেন নন্দ সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ভীতসন্ত্রস্ত নন্দসম্রাট সন্ধির প্রস্তাব করে তাঁর কাছে দূত পাঠান। সে প্রস্তাবে তিনি সম্মত হোলে বিনা যুদ্ধে রাজধানী তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয় এবং প্রতিদানে তিনি ধননন্দের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি

দেন। সন্ধির সর্তানুসারে সুসজ্জিত একখানি রথে আরোহণ করে সম্রাট ধননন্দ তাঁর দুই রাণী, এক কন্যা ও সামান্য জিনিষপত্রসহ ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান।

ছিন্নমূল তরু আজ ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু পাতা শুখায় নি, ফুলের সৌরভ শূন্যে মেলায় নি। নন্দসম্রাটের মণিমুক্তাখচিত রথ যখন পাটলিপুত্রের তোরণদ্বার পার হচ্ছিল সেই সময়ে তার উপর উপবিষ্টা সম্রাটনন্দিনী দুর্দ্ধরাকে দেখে চন্দ্রগুপ্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন। এত রূপ! এ কি মানবীতে সম্ভব? শাপভ্রষ্টা ওই দেববালা নির্বাসিত পিতামাতার সঙ্গে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? সেই অজানা দেশে তার অপ্সরাবিনিন্দিত সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা দেবে কে? সুগাঙ্গেয় প্রাসাদের কুঞ্জবনের মধ্যে যে তরুণী বনহরিণীর মত আশৈশব বিচরণ করেছে সে কোন অন্ধকার কন্দরে গিয়ে আবদ্ধ থাকবে? তা হোতে পারে না—কিছুতেই হোতে পারে না। ওই প্রাসাদে তার জন্ম, ওই প্রাসাদই হবে তার বাকি জীবনের আশ্রয়স্থল।

কে জানিত এই ক্ষণিকা মূরতি দূর করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ,
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসরঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ বিরচন—
একি রূপে দিলে দরশন॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ॥

চারিদিকে অসংখ্য সৈনিক উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ধননন্দের রথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সবাই সুসজ্জিত ও সদা-প্রস্তুত। বলা যায় না, নন্দপক্ষীয় কোন গুপ্তবাহিনী অন্তরাল থেকে তীর বর্ষণ করবে কি না! তাদের নায়ক কিন্তু নিশ্চল—নিষ্পলক। সেই তরুণীর মুখ তাঁর চক্ষুর সম্মুখে বার বার ভেসে উঠছে ; তাকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাঁর আদেশে অশ্বারোহী দূত ছুটল ধননন্দের কাছে। শেষ নন্দ তাঁর মহিষীদের মতামত চাইলেন। সবার সম্মতিক্রমে এক শুভ দিনে দুর্দ্ধরার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের পরিণয় সুসম্পন্ন হোল। সিংহাসনচ্যুত নন্দ সম্রাটের কন্যা হোলেন প্রথম মৌর্য্য সম্রাজ্ঞী![২]

দুর্দ্ধরার পিতৃত্ব সম্বন্ধে অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। এই মতাবলম্বীরা বলেন যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের মাতুল কন্যা। কিন্তু মাতুল কন্যাকে বিবাহ করবার প্রথা উত্তর ভারতে কোন দিনই প্রচলিত ছিল না—চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তার প্রয়োজনও হয় নি। সেই কারণে এই মত মেনে নেওয়া শক্ত।

শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহু

ম্যাসিডোনিয়ায় এ্যারিষ্টোটলের কাছে আলেকজাণ্ডার ও তক্ষশীলায় চাণক্যের চতুষ্পাঠীতে চন্দ্রগুপ্ত যখন শিক্ষালাভ করছিলেন সেই সময়ে সমান প্রতিভাশালী এক তরুণ ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রাচীন ধর্মমতের বন্যায় ভারতভূমি প্লাবিত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আলেকজাণ্ডার বা চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় দেশজয়ের গৌরব না থাকলেও তাঁর ধর্মবিজয় কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়।

এই তরুণ ভদ্রবাহুর পিতা সোমশর্মা ছিলেন গৌড়ের পুণ্ড্রবর্দ্ধন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোটিকপুরের অধিপতি পদ্মরথের পুরোহিত। ব্রাহ্মণ সকাল সন্ধ্যায় রাজমন্দিরে পূজার্চনা করতেন এবং অবসর সময়ে গৃহ-সংলগ্ন টোলে কয়েকজন ছাত্রকে পড়াতেন। কিন্তু পুত্রের অধ্যাপনার

দায়িত্ব নিজে না নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেন সে যুগের খ্যাতিমান জৈন পণ্ডিত অক্ষশ্রাবকের চতুষ্পাঠীতে। সেখানে সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র আয়ত্ব করে। অধ্যক্ষ জৈন, তাই চতুষ্পাঠীতে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা জৈন শাস্ত্রসমূহের অধ্যাপনা হোত বেশী। তার ফলে বালক ভদ্রবাহুর মনে ব্রাহ্মণ্য প্রথায় বিতৃষ্ণা এবং জৈনমতের প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকে।

পিতামাতার ইচ্ছা ছিল, অধ্যয়ন সমাপনান্তে ভদ্রবাহু প্রথামত সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। কিন্তু সে পথ তাঁর নয়। জৈন সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে তিনি সংসারত্যাগী হন। গোবর্দ্ধনস্বামী তখন জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য। ভদ্রবাহুর নিষ্ঠা, প্রতিভা ও সংগঠনীশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। পরে অল্প দিনের ব্যবধানে শ্রুতকেবলি স্থূলভদ্র ও শ্রুতকেবলি সম্ভূতিবিজয়ের তিরোধানের পর তিনি হন শ্রুতকেবলি—সকল জৈনের মহাগুরু।

জৈনমত যে কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল তা বলা যায় না। এখন এই মত পূর্ব ভারতে বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও অতীতে রাঢ় ছিল জৈন ধর্মগুরুদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। স্মরণাতীত কাল থেকে যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জৈনগণকে পরিচালিত করেছেন তাঁদের অধিকাংশই রাঢ়ের কোন না কোন স্থানে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য ছিলেন চম্পার অধিবাসী। তাঁর পূর্বে ও পরে বহু তীর্থঙ্কর কৈবল্যলাভ করেন পশ্চিম রাঢ়ের সমেত শিখরে। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামানুসারে এই শিখর পরেশনাথ পাহাড় নাম ধারণ করে। এখানে ৭৭৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করবার পর দীর্ঘ আড়াই শ' বৎসরের মধ্যে কোন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয় নি। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-বর্দ্ধমান ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁর নাম থেকে রাঢ়ে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রটি বর্দ্ধমান নামে পরিচিত

হয়। বুদ্ধ নির্বাণের তিন বৎসর পূর্বে তিনি কৈবল্য লাভ করেন সমেত শিখরে ৫৪১ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

মহাবীর অন্তিম জিন। তাঁর তিরোধানের পর জৈনদের মধ্যে আর কোন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব হয় নি। তাঁর প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভূতি গুরুর মুখ থেকে শোনা উপদেশ অনুযায়ী জৈনগণকে পরিচালিত করে শ্রুতকেবলি নামে পরিচিত হন। সেই থেকে যে শ্রুতকেবলি যুগের সূত্রপাত হয় ভদ্রবাহু তার উজ্জ্বলতম রত্ন।

ভদ্রবাহুর অভিষেকের সময়ে কূটবুদ্ধি চাণক্য ক্ষীয়মান বর্ণাশ্রম প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার আয়োজন করছিলেন। তাঁর চেষ্টায় মৌর্য্য রাজসভায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে শিক্ষাগুরু ও রাষ্ট্রগুরু বলে মানলেও তাঁর ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। সেই কারণে চাণক্যের তিরোধানের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

এক সময়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে আকাল দেখা দেয়, বহু লোক অনাহারে প্রাণ হারায়। নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদের রক্ষা করতে না পারায় চন্দ্রগুপ্তের মনে শান্তি নেই। যাদের তিনি সন্তান বলে মনে করেন তারা যদি পোকা মাকড়ের মত মরতে থাকে কি প্রয়োজন তাঁর সিংহাসনে? সম্রাটের মন যখন এইরূপ চিন্তাভারাক্রান্ত সেই সময়ে ভদ্রবাহুস্বামী আসেন পাটলিপুত্রে—শিষ্যদের তত্ত্বকথা শোনাতে। তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করে চন্দ্রগুপ্ত নূতন আলোকের সন্ধান পান, তাঁর বেদনাকাতর হৃদয়ে শান্তি আসে। তিনি জৈনমতে দীক্ষা নেন।

ভারত সম্রাট জৈনমতে দীক্ষা নিয়েছেন! সংবাদটি দাবাগ্নির ন্যায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কে সেই মহাশক্তিধর যিনি চাণক্যশিষ্য চন্দ্রগুপ্তকে ধর্মান্তরিত করেছেন? শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহুর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে, বহু অলৌকিক কাহিনী তাঁর নামে উদ্ভাবিত

হয়। জৈনমতের উপর সবার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-গণ কিন্তু প্রমাদ গণে। এত দিন তারা রাজশক্তির কাছ থেকে যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল সেগুলি পাছে লোপ পায় সেই ভয়ে সম্রাটের নামে সত্যমিথ্যা নানা অপবাদ রটাতে থাকে। অথচ তিনি তাদের কোন অনিষ্ট করেন নি! নিজে জৈনমতে দীক্ষা নিলেও এই মতকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধর্ম বলে ঘোষণা করেন নি। তবুও মুদ্রারাক্ষস রচয়িতা বিশাখদত্ত প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ তাঁকে 'বৃষল' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন!

চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় পর্য্যন্ত বিকৃত করতে এই ধর্মান্ধগণ সঙ্কোচ বোধ করেন নি। তাঁদের প্রচারের ফলে জননী মুরা হয়ে পড়েন অজ্ঞাতপরিচয় এক নন্দরাজের শুদ্রাণী পত্নী। অথচ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ চাণক্য তাঁর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন! বৌদ্ধ ও জৈন লেখকগণ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর পৌত্র অশোক প্রিয়দর্শী এক সময়ে পিঁয়াজ-সংযুক্ত ঔষধ সেবন করতে অস্বীকার করে স্বীয় মহিষীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—দেবি! অহং ক্ষত্রিয়ঃ কথং পলাণ্ডু পরিভক্ষামি।[৩]

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে জৈনদের উদ্দীপনার অন্ত নেই। বৌদ্ধসঙ্গীতির অনুকরণে তারা পাটলিপুত্রে শ্রীসঙ্ঘের অনুষ্ঠান করে। তাতে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের সংস্কার সাধন করা হোলেও জৈনমত প্রচারের জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নি। শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহু ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। যারা অজ্ঞ ও নিষ্ঠাহীন তাদের নিয়ে দলবৃদ্ধি করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

জৈনমতে দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে চন্দ্রগুপ্তের মনে সেই যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তার হাত থেকে তিনি কোন দিন নিষ্কৃতি পান নি; তরুণ পুত্র বিম্বিসারের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে প্রায়ই গুরুর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হোতেন। শেষ জীবনে গুরুশিষ্য একত্রে মহীশূরের

জৈন তীর্থ শ্রারণবেলগোলায় বাস করতে থাকেন। সেখানে ৩১২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়। চন্দ্রগুপ্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভদ্রবাহুর প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হলেও জন্মভূমি গৌড় ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখানকার বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান করে তিনি কল্পসূত্র, অবশ্যকনিযুক্তি, ভদ্রবাহুসংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য গোদাস গুরুর নির্দেশে গৌড়ের চার প্রান্তে চারটি শক্তিশালী জৈনকেন্দ্র স্থাপন করেন। গোড়ার দিকে কেন্দ্রগুলি ছিল অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল। সেগুলির কর্মীদের প্রচারের ফলে গৌড়ের সর্বত্র জৈনমত প্রাধান্য লাভ করে, ব্রাহ্মণ্যমত প্রায় লোপ পায়। কিন্তু ধীরে ধীরে গৌড়ীয় জৈনদের মধ্যে ঐক্যের অভাব দেখা দেয়; কেন্দ্রগুলির নামানুসারে তারা তাম্রলিপ্তিয়া, কোটিবর্ষিয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনিয়া ও দাসীকর্বটিয়া এই চারটি সুনির্দিষ্ট শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শক্তিক্ষয় এবং জনমতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া!

ঠিক এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ভদ্রবাহুস্বামী বহু পূর্বে করেছিলেন। তিনি শিষ্যদের বলতেন, জৈন মতের প্রসার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। সে আজ দু'হাজার বৎসর পূর্বের কথা, কিন্তু জৈনধর্মের মূল তত্ত্বগুলি ভদ্রবাহুস্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন আজও তাই রয়েছে। জৈনদের ধর্মজীবন সে দিন যা ছিল আজও তাই।[৪]

অমিত্রাঘাত বিন্দুসার

বিবাহের কিছুকাল পরে দুর্দ্ধরার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের একমাত্র পুত্র বিন্দুসারের জন্ম হয়। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে আসন্নপ্রসবা সম্রাজ্ঞী একদিন ভ্রম বশে বিষপান করেন। সেই বিষের দহনে তাঁর দেহ জ্বলে যাচ্ছিল, অথচ বৈদ্যগণ কোন সাহায্য দিতে পারছিলেন না। এই দুঃসংবাদ রাজসভায় পৌঁছালে চাণক্য চলে আসেন প্রাসাদা-ভ্যন্তরে। ভাববার আর সময় নেই। শুধু ভারত সম্রাজ্ঞী চিরনিদ্রায়

ডুবে যাচ্ছেন না, তাঁর সঙ্গে ডুবছেন ভারতের ভারতের ভাবী অধীশ্বর। গর্ভস্থ ভ্রূণকে বাঁচাতে হবে, চন্দ্রগুপ্তকে অবলম্বন করে যে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে উঠেছে তার অঙ্কুরে বিনাশ বন্ধ করতেই হবে। বিষের স্পর্শে ভ্রূণ সংক্রামিত হবার পূর্বে চাণক্য তরবারির দ্বারা প্রসূতির উদর ছেদন করে সেটিকে বার করে আনেন। তাতে দুর্দ্ধরার মৃত্যু হয়, কিন্তু মৌর্য্য বংশ রক্ষা পায়।

বিন্দুসারের রাজত্ব মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশের যুগ। তাঁর মহামন্ত্রী খল্লাটক চাণক্যের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হোলেও প্রশাসনিক দক্ষতায় ছিলেন অসাধারণ। এই মন্ত্রীর শাসন নৈপুণ্যের গুণে শুধু যে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায় তা নয় উন্নয়নমূলক বহু পরিকল্পনাও রূপায়িত করা হয়। কাথিয়াবাড় প্রদেশে এই সময়ে যে সর্বার্থসাধক সেচ প্রণালী নির্মিত হয় তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও বিদ্যমান আছে। গির্ণারের সুদর্শন হ্রদের নির্মাণও এই সময়ে সম্পন্ন হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ক্ষত্রপ পুষ্যগুপ্ত সুবর্ণ শিকত, পালসিনি প্রভৃতি নদীর জলরাশি ধরে রাখবার জন্য উর্য্যয়ৎ পাহাড়ের উপর এই বিশাল হ্রদ নির্মাণের পরিকল্পনা রচনা করেন। ইট ও পাথরের বাঁধ দিয়ে নদীর স্রোত অবরোধ করে যেভাবে হ্রদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারগণকে বিস্মিত করে। ভারতের সর্বত্র এইরূপ অসংখ্য ছোটবড় খাল ও হ্রদ চন্দ্রগুপ্ত-বিন্দুসারের সময়ে খনন করা হয়।

বর্তমানে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে কথিত জাতীয় সড়কটির নির্মাণ-কার্য্য বিন্দুসারের সময় সম্পন্ন হয়। রাজপথটি অবশ্য পূর্বেও ছিল। চাণক্য এই পথ ধরে তক্ষশীলা থেকে পাটলিপুত্রে এসেছিলেন। মেগাস্থিনিস এই পথের বিবরণ লিখে গেছেন। চন্দ্রগুপ্ত-বিন্দুসারের সময়ে পথটির এমনভাবে সংস্কার সাধন করা হয় যে তার উপর দিয়ে রথ ও গজবাহিনী চলতে পারত। দীর্ঘকাল পরে সুলতানী আমলে

রাজপথটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লে শের শাহ্ তাঁর সৈন্য চলাচলের জন্য স্থানে স্থানে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি এই পথের সংস্কারক, নির্মাতা নন। অনুরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু রাজপথ চন্দ্রগুপ্ত-বিম্বিসারের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। মহাভারতের সময়ে অঙ্গাধিপতি কর্ণের রথ যে রাজপথ দিয়ে চম্পা থেকে হস্তিনাপুর যেত সেটির ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার ও জনসাধারণের দায়িত্বের কথা লিখিত আছে।

এই মহাগ্রন্থে মৌর্য্যদের শাসন প্রণালীর যে বর্ণনা আছে গত দুই হাজার বৎসর ধরে দেশী বিদেশী সকল শাসক তা অনুসরণ করে চলেছেন। পারস্য সীমান্ত থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য অগ্রামাত্য ও মহামাত্রগণকে সকল সময়ে কর্মব্যস্ত থাকতে হোত। চারটি প্রধান প্রদেশ তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোসালি এবং সুবর্ণগিরিতে অবস্থান করতেন মৌর্য্যবংশীয় কুমারগণ। ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলি সামন্ত বা বেতনভুক ক্ষত্রপদের দ্বারা শাসিত হোত। তাঁরা সবাই ছিলেন সম্রাট ও অগ্রামাত্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। আজও সেই নিয়মই অনুসৃত হচ্ছে।

মৌর্য্যদের বিচার ব্যবস্থা ও এখনকার বিচার ব্যবস্থায় পার্থক্য বিশেষ নেই। রাজস্ব ও শুল্ক নির্দ্ধারণে মৌর্য্যপদ্ধতি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আজও চলে আসছে। সে সময়ে ভূমি রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ, আয়করের হার লভ্যাংশের এক-চতুর্থাংশ। বিক্রয়কর ছিল না, কিন্তু করহীন পণ্যও বেশী ছিল না।

দেবানাম্ প্রিয়দর্শী অশোক

বিন্দুসারের পট্টমহিষী শুভদ্রাঙ্গী ছিলেন গৌড়ের এক ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা। তিনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলেন না, আবার তাঁর পুত্র অশোকও তেমনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। কিন্তু শৈশবে

তিনি যে শুধু রণবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তা নয়, চারিত্রিক মাধুর্য্যের জন্য সর্বত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একবার তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করবার জন্য বিন্দুসার তাঁকে সেখানে পাঠান। কিশোর কুমারের আগমন সংবাদে বহু বিদ্রোহী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, অন্যদের অস্ত্রবলে বশীভূত করা হয়। এই সাফল্যের জন্য অশোক তক্ষশীলার ক্ষত্রপের পদ লাভ করেন। পরে তিনি উজ্জয়িনীতে বদলী হন।

অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুসীম ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই কারণে পিতৃ সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার তিনি। কিন্তু তাঁর রূঢ় ব্যবহারের জন্য মহামন্ত্রী খল্লাটক ও সভাসদগণ ছিলেন অসন্তুষ্ট। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁকে পাশ কাটিয়ে খল্লাটক অশোককে মৌর্য্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। সুসীম তখন তক্ষশীলায়। এই চক্রান্তের কথা সেখানে পৌঁছালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গতির অভাব কোথায় ? মহামন্ত্রী তাঁর বিরোধী হোলেও স্বপক্ষীয়ের সংখ্যা নগণ্য নয়। তাঁদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে সুসীম পাটলিপুত্রের দিকে রওনা হোলেন। মৌর্য্য বংশের গৃহযুদ্ধ সুরু হোল।

অশোকপক্ষীয়গণ বিনা বাধায় রাজধানী অধিকার করলেও প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির স্বীকৃতি পান নি। তাদের বলে বলীয়ান হোয়ে সুসীম-বাহিনী যখন এগিয়ে আসতে থাকে কোথাও তাদের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হোল না। সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করতে করতে সুসীমের সৈন্যগণ একদিন পাটলিপুত্রের নগরদ্বারে এসে উপনীত হয়। রাজধানী বহু দিন তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। নগররক্ষীরা জয়ের সকল আশা ত্যাগ করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রাজধানীর প্রবেশপথে এক দুর্ঘটনার ফলে সুসীম নিহত হন। যুদ্ধেরও সেই সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘ চার বৎসর ধরে চলেছিল বলে অশোকের

অভিষেকোৎসব বিলম্বিত হয়ে যায়। মহাসমারোহে খল্লাটক সেই উৎসব পালনের আয়োজন করলে সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে সামন্ত ও ক্ষত্রপগণ এসে নূতন সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু খল্লাটকের আশা পূর্ণ হয় নি। কারও ক্রীড়নক হবার ইচ্ছা অশোকের ছিল না, তাই তাঁকে বিদায় দিয়ে শূন্য আসনে নিয়োগ করেন রাধাগুপ্তকে। এই মহামন্ত্রী ছিলেন প্রভুর ন্যায় কৌটীল্যের অনুগামী; অর্থশাস্ত্রের নীতি অনুসারে উভয়ে রাজ্য শাসন সুরু করেন। বিন্দুসারের সময়কার সকল কোমলতা অন্তর্হিত হয়ে মৌর্য্য সাম্রাজ্য রূপান্তরিত হয় পুলিশী রাষ্ট্রে। তন্তুবায়পুত্র চন্দ্রগিরিক জহ্লাদীতে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল; তাকে বধাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য সে বহু লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। সম্রাট অশোক প্রজাদের চক্ষে হয়ে পড়েন চণ্ডাশোক।*

অশোকের জ্যেষ্ঠা মহিষী পদ্মাবতীর গর্ভজাত পুত্রের চক্ষু দুটি মৃণালের মত সুন্দর ছিল বলে তাঁকে আদর করে কুণাল বলে ডাকা হোত। সেই অপরূপ চক্ষুই যুবরাজের কাল হয়ে দেখা দেয়। তাঁর তরুণী বিমাতা তিস্যরক্ষিতার মনে সেই চক্ষু মাদকতা জাগায়, তিনি ভুলে যান যে কুণাল তাঁর সপত্নীপুত্র। তাঁর নিবেদনে সাড়া না দেওয়ায় ক্রুদ্ধা নাগিণী যুবরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করে। কুণাল যখন তক্ষশীলার শাসকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে সম্রাটের নামে এক জাল পত্র সেখানে পাঠিয়ে তিনি যুবরাজের চক্ষু দুটি উৎপাটিত করান।[৫]

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে ২৬১ খৃষ্টপূর্বাব্দে কলিঙ্গ আক্রমণের সময়ে যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে অশোকের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল।

* এই বৌদ্ধ বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকা সম্ভব। বৌদ্ধমতের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করবার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণের পূর্বে অশোককে এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

সেই মহাযুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী ও ততোধিক সৈন্য হতাহত হয়। যুদ্ধশেষে মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেললেও যুদ্ধের বীভৎসতা অশোককে ভাবিয়ে তোলে। তার উপর প্রাণাধিক কুণালের এই দশা! সম্রাটের অশান্ত হৃদয় যখন হাহাকার করছিল সেই সময়ে উষর মরুতে শান্তিবারি সিঞ্চন করেন স্থবির সমুদ্র। পরে মথুরাবাসী ভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধমতে দীক্ষা নিয়ে অশোক হন ধর্মাশোক।

অশোকের দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমত নূতন রূপ নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত সঙ্গতি নিয়োগ করেন। তাঁর অভিষেকের অষ্টাদশ বর্ষে মহানগরী পাটলিপুত্রে যে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয় তাতে দেশবিদেশ থেকে বহু অর্হৎ যোগ দিয়ে ধর্মগ্রন্থসমূহের সংস্কার সাধন করেন। বৌদ্ধদের জীবনযাত্রার জন্য নূতন কোডও প্রবর্তিত হয়।

তার পর থেকে বৌদ্ধধর্মের বন্যায় সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত হয়। সুগাঙ্গেয় প্রাসাদও সেই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায় নি। রাজকুমার মহেন্দ্রকে দীক্ষা দেন স্থবির মহাদেব ও স্থবির মধ্যাস্তিক। রাজকুমারী সংঘমিত্রা ভিক্ষুণী আয়ুপালির কাছে দীক্ষা নিয়ে স্বামী অগ্নিব্রহ্মের সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সিংহলরাজ প্রিয়তিস্যকে আলোক দেন মহেন্দ্র এবং সিংহল রাজবধূগণকে আলোক দেন সংঘমিত্রা।[৬] অশোকের দ্বিতীয়া কন্যা চারুমতী দীক্ষা নিয়ে নেপালে বসবাস সুরু করেন। ব্রহ্মদেশে তথাগতের বাণী বহে নিয়ে যান ভিক্ষু সোনো এবং ভিক্ষু উত্তম। এমনি সব শক্তিমান স্থবিরগণ সভ্য জগতের সর্বত্র গমন করেন। স্থবির মধ্যান্তিককে পাঠান হয় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্তে কাশ্মীর উপত্যকায়। তাঁর প্রচেষ্টায় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর প্রতিষ্ঠিত হয় এক বৌদ্ধ কেন্দ্ররূপে। নেপালের দেবপাটনা সহ আরও বহু

নগর অশোক স্থাপন করেন।

বৌদ্ধধর্মকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়ে অশোক ভারতের সর্বত্র হাজার হাজার ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। অসংখ্য স্তম্ভ ও শৈলগাত্রে যে সব অনুশাসন ক্ষোদিত হয় তার একটির বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হোল—

দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী জানাইতেছেন যে তাঁহার অভিষেকের ষড়বিংশ বর্ষে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ নিষিদ্ধ করা হইল: শুক, শারিকা, অলুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট, জতুকা, অম্বার্কপিলিকা, দন্দী, অলঠিকা, মৎস্য, বেদবেরক, গঙ্গাপুত্রক, সংযুদ্ধ স্বমৎস্য, ককটশন্যক, পন্নসস, স্বময়, ষণ্ডক, ওকাপিণ্ড, পলসর্ত শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও যে সকল চতুষ্পদ ভোগে আসে না বা খাওয়া যায় না। অজকা, এড়কা, শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবর্তী এ সমস্ত অবধ্য। উহাদের ছয় মাসের অনধিক শাবকগণও অবধ্য। বধি-কুক্কুট কাটিবে না বা তুষে দগ্ধ করিবে না। অনিষ্টার্থ বা হিংসার্থ অরণ্যসকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই ব্যাপক বৌদ্ধ জাগরণে গৌড় বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। অশোকের আদেশে এখানে যে সব বিহার ও ধর্মরাজিকা নির্মিত হয়েছিল জনজীবনের উপর সেগুলি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলা যায় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহুর প্রেরণায় গৌড়ের চার প্রান্তে যে চারটি জৈন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি সুবিধা করতে পারে নি। তাঁদের চক্ষের সম্মুখে কয়েকজন দুর্বৃত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে প্রকাশ্যস্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি চূর্ণ করে দেয়। নগর কোতয়াল তাদের সন্ধান করতে না পারায় অশোকের আদেশে নগরীর ১৮ হাজার অধিবাসীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।[৭]

গৌড়ের তাম্রলিপ্ত তখন আর্য্যাবর্তের প্রধান বন্দর। ভিক্ষু মহাআরিতার নেতৃত্বে সিংহলরাজ প্রিয়তিস্য যে প্রতিনিধিমণ্ডলী

পাটলিপুত্রের মৌর্য্য রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন সাত দিন সমুদ্র ভ্রমণের পর তাঁরা তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন ; সেখান থেকে রাজকীয় শকটে আরোহণ করে যান পাটলিপুত্রে।

মৌর্য্য বংশের বিলোপ

দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্বের পরে অশোক প্রিয়দর্শী ২৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শেষ জীবন খুব সুখের হয় নি। একে পুত্র কুণালের দৃষ্টিহীনতা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করত, তার উপর কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী পদ্মাবতী* তখন মৃতা, কনিষ্ঠা তিস্যরক্ষিতা স্বামীকে প্রাণপাত সেবা করেছিলেন। কিন্তু জীবজ কোন ঔষধ সেবন করতে অসম্মত হয়ে বৈদ্য ও শুশ্রূষাকারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রিয়দর্শী সম্রাট একদিন তথাগতের পথে মহাপ্রয়াণ করেন।

পুত্র কুণালকে অশোক অত্যন্ত ভালবাসতেন। নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রতি এক সময়ে অবিচার করায় এই স্নেহ পরে শত গুণ বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তিনি বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সম্রাট তাঁকে তক্ষশীলার ক্ষত্রপ নিযুক্ত করেছিলেন। বিমাতার চক্রান্তের ফলে সেখানে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় এবং সকল রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করে বধূরাণী কাঞ্চনমালাসহ বাকি জীবন সঙ্গীতচর্চায় অতিবাহিত করেন। অশোক তখন কুণালের তরুণ পুত্র সম্প্রতির অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে বুদ্ধসেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেন। সঙ্ঘমিত্রার পুত্র সুমন নিযুক্ত হন নবীন সম্রাটের সহকারী।

রাজর্ষি পিতামহের স্নেহের মূল্য সম্প্রতি দেন নি। তাঁর আদেশে সংসারত্যাগী সম্রাটের জন্য নির্দ্ধারিত ভাতা পর্য্যন্ত নাকি বন্ধ করে

*নামান্তর আসন্ধিমিত্রা

দেওয়া হয়েছিল। পিতামহের মহাপ্রয়াণের পর তিনি দশরথ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধমতে তাঁর আস্থা ছিল না, জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি পিতামহ পোষিত বৌদ্ধসংঘগুলির প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে থাকেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে সর্বত্র বহু জিন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জৈন ধর্মের প্রসারের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় হোতে থাকে। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও সম্প্রতির রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্য বিশেষ ক্ষীণাঙ্গ হয় নি। কেবলমাত্র কাশ্মীর তাঁর পিতৃব্য জলাউকার অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সম্রাট সঙ্গত ও শালিশুর্ক ছিলেন অযোগ্য শাসক। তাঁদের সময়ে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব সর্বত্র শিথিল হয়ে যায়। সম্রাট সোমশর্মা যদিও বা দৃঢ়হস্তে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানের চেষ্টা করেন, শতধন্বার রাজত্বকালে তার অধোগতি রোধ করা সম্ভব হয় নি। সুগাঙ্গেয় প্রাসাদে বসে তিনি বিলাসব্যসনে ডুবে থাকতেন, রাষ্ট্রতরী চলত কাণ্ডারীহীন নৌকার মত। চারিদিকে দেখা দেয় বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা, রাজসভা হয়ে পড়ে সামন্ত চক্রান্তের পীঠভূমি।

শতধন্বার মৃত্যুর পর বৃহদ্রথ যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু এ তো সিংহাসন নয়—ভীষ্মের শরশয্যা। তাঁর উপর প্রথম আঘাত আসে কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেলের কাছ থেকে। শতাব্দী-কাল পূর্বে অশোক প্রিয়দর্শী অস্ত্রবলে ওই রাজ্যটি অধিকার করেছিলেন, কিন্তু অধিবাসীদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। সেখানকার ধূমায়িত বিক্ষোভ এখন লেলিহান শিখা বিস্তার করে মৌর্য্য সাম্রাজ্যকে পুড়িয়ে ছারখার করতে উদ্যত হোল। মহাসামন্ত খারবেল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলি একে একে অধিকার করে নেন। সেখানকার মৌর্য্য শাসকগণ তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন। এইভাবে বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে খারবেল তাঁর সৈন্য চালনা করেন পাটলিপুত্রের দিকে। সাধ্য হয় নি

মৌর্য্য সেনানীদের তাঁর অগ্রগতি রোধ করেন। ক্রমাগত পিছু হঠতে হঠতে তাঁরা পাটলিপুত্রের প্রাচীরাভ্যন্তরে এসে আশ্রয় নেন।

খারবেলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য প্রান্তের সামন্ত এবং ক্ষত্রপগণও বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে হঠেন। সর্বত্র চলতে থাকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সেই সময়ে একদিন সম্রাট বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রভুকে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখাবার সময়ে হত্যা করে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সঙ্গে নির্বাপিত হয় মৌর্য্য বংশের শেষ দীপশিখা।

1 *Mahavamsa-tika, p. 121*
2 Mookherjee R. K. *Ancient India, p. 144*
3 *Divyavadan, p. 138*
4 Shah C. J. *Jainism in Northern India, p. 78*
5 *Divyavadan, p. 160*
6 *Dipavamsa, Turnouts' Trans. p. 126*
7 Smith Vincent A. *Asoka, p. 183*

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রাহ্মণাধিকার

শুঙ্গ সাম্রাজ্য

বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে পুষ্যমিত্রের শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হোলেও জনসাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। এতদিন চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের স্মৃতি বুকে নিয়ে তাদের দিন কাটছিল—রাজনৈতিক নিশ্চয়তা ছিল না। সেনাপতি পুষ্যমিত্র কঠোর হস্তে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দমন করে সমগ্র দেশের উপর এক শাক্তিশালী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। শাসক-শ্রেণীর দুর্বলতার জন্য মৌর্য্যদের যে ঐশ্বর্য্যের এতদিন অপচয় হচ্ছিল তাঁর হাতে পড়ে তা দুর্বার শক্তিতে পরিণত হয়। ভিক্ষুরাজ খারবেলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে যে সব সামন্ত স্বাতন্ত্র্য লাভের স্বপ্ন দেখছিলেন তাঁদেয় নেশা টুটে যায়।

পুষ্যমিত্রের অভ্যুত্থান ছিল পুরাপুরি সামরিক বিপ্লব। অশান্ত সৈন্যবাহিনীর সমর্থন ছিল বলেই তাদের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে সম্রাট বৃহদ্রথের নিধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। মৌর্য্য বংশ যদিও তাতে লোপ পায় নিজ মস্তকে রাজমুকুট পরিধান করবার ধৃষ্টতা পুষ্যমিত্র দেখান নি। মহাবিপ্লবের নায়ক তিনি, বিপ্লবকে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য ব্যবহার করলে জনসাধারণ যদিও বা তা সহ্য করত সৈন্যবাহিনী করত না। তারা বৃহদ্রথের অপসারণ চেয়েছিল, মৌর্য্য বংশের নয়; সেই কারণে পুষ্যমিত্র পূর্বে যেমন মৌর্য্য সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন ৩৬ বৎসর ধরে সাম্রাজ্য শাসনের পরও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তেমনি সেনাপতি পুষ্যমিত্রই থেকে যান।

রাজমুকুট পরিধান না করলেও সমগ্র দেশকে এক কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রয়োজন সেনাপতি পুষ্যমিত্র অনুভব করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন নরপতি তাঁর যজ্ঞাশ্বের পথ রোধ করবার সাহস দেখিয়েছিল তাঁদের নির্মমভাবে দমন করা হয়। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র অগ্নিমিত্রকে সম্বোধন করে তিনি লেখেন—

স্বস্তি। যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুষ্যমিত্র বৈদিশ আয়ুষ্মান পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, বিদিত হও। আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিবর্তনীয় ও নিরর্গল অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার আদেশে শত রাজপুত্র পরিবৃত হইয়া শ্রীমান বসুমিত্র অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।......সগরপুত্র অংশুমান যেমন যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া আনিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ করিব। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া বধূগণসহ যজ্ঞস্থলে আগমন কর।১

শত সামন্তের সাহায্য পাওয়ায় সেনাপতি পুষ্যমিত্রের পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হোলেও নিহত সম্রাট বৃহদ্রথের মহামন্ত্রীর শ্যালক বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন এবং কলিঙ্গপতি খারবেলকে বশীভূত করা সহজসাধ্য হয় নি। বৃহদ্রথপক্ষীয়গণ বিদর্ভে গিয়ে যজ্ঞসেনের নেতৃত্বাধীনে তাঁদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের বশীভূত করা হোলেও খারবেলের বিরুদ্ধে সেনাপতি পুষ্যমিত্র যে কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন তা বলা শক্ত।

সেনাপতি পুষ্যমিত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যমতের পরিপোষক। বৌদ্ধদের তিনি সুনজরে দেখতেন না—বৌদ্ধরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাদের আহ্বানে হোক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই হোক বাহ্লিকের বৌদ্ধ-গ্রীক নরপতি মিনিন্দর তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সঙ্ঘ-প্রীতির জন্য বৌদ্ধ কাহিনীতে মিনিন্দর অমর হয়ে রয়েছেন। ভদন্ত নাগসেনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন অবলম্বন করে মিলিন্দ-পন্‌হো রচিত হয়েছে।২

পাঞ্জাবের বৌদ্ধগণ আক্রমণকারীদিগকে প্রভূতভাবে সাহায্য দেওয়ায় তাদের পক্ষে দক্ষিণে রাজপুতানা ও পূর্বে অযোধ্যার ভিতর বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। নবার্জিত সাম্রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ এইভাবে হাতছাড়া হলেও পুষ্যমিত্র হতোদ্যম হন নি। পাটলিপুত্র ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে নূতন নূতন সৈন্য পাঠিয়ে তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সুরু করলে মিনিন্দর শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। গ্রীকবিজয়ী শুঙ্গ শক্তি সারা দেশের চক্ষে নূতন মর্য্যাদা লাভ করে।

এই গ্রীক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ভারতীয় বৌদ্ধদের উপর অতি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। দেশ অপেক্ষা তারা যে সম্প্রদায়কে বড় করে দেখেছিল সে কথা সেনাপতি পুষ্যমিত্র ভুলতে পারেন নি। মিনিন্দরের প্রস্থানের পর পাঞ্জাব ও সন্নিহিত অঞ্চলের সকল বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম তাঁর আদেশে ভস্মীভূত করা হয়। প্রতিটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর মস্তকের জন্য তিনি একশত রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। অশোক প্রিয়দর্শী নির্মিত পাটলিপুত্রের বিখ্যাত কুক্কুটারাম মহাবিহারও তাঁর আদেশে ধ্বংস করা হয়।

দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর ১৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে পুষ্যমিত্রের মৃত্যু হোলে তাঁর পত্নী বিদিশার গর্ভজাত পুত্র অগ্নিমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি যখন মধ্য ভারতের ক্ষত্রপ ছিলেন তখন তাঁর জননীর নামানুসারে সেখানকার রাজধানীর নামকরণ করা হয় বিদিশা—পরে ভিল্‌সা। তাঁর সময়ে ভিলসার গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে জনৈক গ্রীক নৃপতি নিজ রাজদূতকে পাটলিপুত্রে পুষ্যমিত্রের সভায় না পাঠিয়ে সেখানে যুবরাজ অগ্নিমিত্রের সভায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে কালিদাস লিখেছেন যে মন্ত্রী পরিষদ ও অমাত্য পরিষদের সাহায্যে অগ্নিমিত্র বেশ নিপুণতার সঙ্গে শাসনকার্য্য

চালাতেন। তাঁর ভ্রাতা বসুমিত্রের সুনিপুণ সেনাপতিত্বের ফলে সামরিক শক্তি অটুট থাকে। কৃষি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়।

অগ্নিমিত্রের মৃত্যুর পর অন্তপ, পুলীন্দর, ঘোষবসু, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূমি এই ছয়জন সম্রাট শুঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁদের মধ্যে ঘোষবসু ও ভাগবত ছিলেন যেমন ধার্মিক, দেবভূমি ছিলেন তেমনি উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যসনাসক্ত। রাজার পাপের ফল সমস্ত জাতিকে ভুগতে হয়। দেবভূমির কুশাসনে প্রজাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। বজ্রমিত্র ও ভাগবতের সময় থেকে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; এখন তা অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁছাল। সাধ্য ছিল না সম্রাট দেবভূমির তাকে সঞ্জীবিত করে তোলেন।

ইচ্ছাও ছিল না। সুরা ও নারী ব্যতীত আর কিছুই তিনি জানতেন না। শাসনকার্য্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মহামন্ত্রী বাসুদেবের উপর। কিন্তু তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে সাধারণ সহযোগিতার অবসরও তিনি পেতেন না। এই শ্লথতার মূল্য দিতে হয় নিজের জীবন দিয়ে। বাসুদেবের নির্দেশে দেবভূমির এক অভিসারিকা কন্যা গভীর রাত্রে রাণীর ছদ্মবেশ পরে তাঁকে হত্যা করে। শূন্য সিংহাসনে বসেন বাসুদেব স্বয়ং।

কাণ্ব বংশ

এইভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। যে পথ ধরে প্রথম শুঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই পথ দিয়েই তাঁর শেষ বংশধর নিষ্ক্রান্ত হোলেন। উভয়ের পন্থা এক হোলেও যোগ্যতার পার্থক্য ছিল আকাশ পাতাল। সেনাপতি পুষ্যমিত্র ছিলেন বীর—আদর্শবাদী। দেশকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি এক সামরিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিলেন; অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে

বাসুদেবের কোন আদর্শের বালাই ছিল না। তস্করের ন্যায় রাত্রির অন্ধকারে প্রভুকে হত্যা করে তিনি নিজ শিরে রাজমুকুট ধারণ করেছিলেন।

পুষ্যমিত্রের ন্যায় বাসুদেবও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর অভিষেকের ফলে দেবভূমির কুশাসন থেকে দেশ মুক্ত হোলেও কোন শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা লাভ করে নি। পুষ্যমিত্রের প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি এক নূতন রাজবংশই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিচ্ছিন্ন দেশকে নূতন নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। তাঁকে নিয়ে কাণ্ব বংশের চারজন নরপতি ৪৬ বৎসর ধরে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে যেটুকু কর্মদক্ষতা ছিল তাঁর পুত্র ভূমিমিত্র, পৌত্র নারায়ণ বা প্রপৌত্র সুশর্মার মধ্যে তাও ছিল না। তাঁরা একের পর এক সিংহাসনে আরোহন করেছেন এবং নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে গেছেন। অন্ধকার অন্ধকারই থেকে গেছে।

সেই সময়ে ভারতের দুই প্রান্তে দুইটি নূতন শক্তি উদ্ভুত হয়ে উল্কার ন্যায় পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের তরবারির ঝঞ্ঝনায় ভারতভূমি মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠছিল; নদী প্রান্তরে রক্তের লহরী বইছিল। উভয়ের প্রয়োজন ছিল মিত্রের। সেই কারণে হয় তো উভয় শক্তিই কান্বায়ন বংশকে দলভুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছিল। হয় তো করে নি। কারণ যাই হোক তাদের মধ্যে অন্ধ্রগণ ২০ খৃঃ পূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্য থেকে এসে পাটলিপুত্রের উপর চরম আঘাত হানে। এই অন্ধ্র আক্রমণ প্রতিহত করবার মত শক্তি সম্রাট সুশর্মার ছিল না। তিনি রাজধানী ছেড়ে চলে যান দূরে—বহু দূরে—শক শিবিরে। গৌড় ও মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্ধ্র সাতবাহন বংশের আধিপত্য।

সুশর্মাকে পেয়ে শক সেনানীদের উল্লাস আর ধরে না। পাটলী-পুত্রাধিপতি এসেছেন তাদের শিবিরে! এর চেয়ে সুখের কথা আর

কি হোতে পারে ? চারিদিকে আনন্দের রোল উঠল—সুশর্মাকে দেওয়া হোল ভারত সম্রাটের অভিনন্দন। যারা শত্রুভাবে এসে চারিদিকে হত্যা ও ধ্বংস ছড়াচ্ছিল ভারতের সবচেয়ে মর্য্যাদাশালী রাজবংশকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা হয়ে পড়ল মিত্র। ব্রাহ্মণ্যমতের প্রতি শকক্ষত্রপদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

১ মালবিকাগ্নিমিত্র, পঞ্চম অঙ্ক

২ মিলিন্দ পন্‌হো, অনুবাদ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণাপথের তরঙ্গ

অন্ধ্র অধিকারে গৌড়

কলিঙ্গপতি খারবেল যখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানছিলেন গোদাবরী উপত্যকায় অন্ধ্রদের মধ্যে সেই সময়ে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এখানকার সামন্তগণ ছিলেন মৌর্য্য সম্রাটের অনুগত; খারবেলের অভ্যুত্থান তাঁরা বরদাস্ত করেন নি। কিন্তু শত্রু প্রবল, তাই তাঁরা পিছু হটতে হটতে চলে আসেন একেবারে মগধে। সেখানেও সম্রাট বৃহদ্রথের কাছে আশা করবার কিছু ছিল না। সেই কারণে সেনাপতি পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথকে অপসারণ করলে অন্ধ্রবীরগণ তাঁর বিরোধীতা করেন নি। তাঁরা পুষ্যমিত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তিনিও তাঁদের পদোচিত মর্য্যাদা ও বিত্তের ব্যবস্থা করে দেন। এই আগন্তুকগণ ইতিহাসে অন্ধ্রভৃত্য নামে পরিচিত।

খারবেলের তিরোধানের পর উত্তর থেকে অন্ধ্রভৃত্যগণ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে তাঁদের স্বগোত্রীয়েরা কলিঙ্গের উপর আঘাত হানতে থাকে। তার ফলে খারবেলের রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং সে জায়গায় গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র এক অন্ধ্র রাষ্ট্র। এতদিন অন্ধ্রগণ ছিল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এখন শিমুক ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতার পরিচালনায় তারা দিকে দিকে প্রসার লাভ করতে লাগল। শিমুকের কূটবুদ্ধি ও কৃষ্ণের রণনৈপুণ্যের গুণে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি একে একে জয় করে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা মালবে গিয়ে উপনীত হোল।

একই সময়ে শকগণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে মধ্য ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিল। অন্ধ্র সামন্ত গর্দভিলার কাছ থেকে মালব অধিকার করে তারা উজ্জয়িনীতে এক শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। যুদ্ধ সেখানে শেষ হয় নি। নিহত গর্দভিলার পুত্র অন্ধ্র রাজধানীতে চলে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সুরু করলে শকগণ বারবার পরাজিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে সিন্ধু নদীর ওপারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিজয়ী অন্ধ্রগণ কাথিওয়াড়ের সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হোয়ে পশ্চিম ভারতে যে সব বিচ্ছিন্ন শক রাজ্য ছিল সেগুলি অধিকার করে। গর্দভিলার অজ্ঞাতনামা পুত্রের সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে এই বিরাট জয় সম্ভব হওয়ায় অন্ধ্র সম্রাট তাঁকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করে মালব সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দিগ্বিজয়কে স্মরণীয় করবার জন্য ৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিক্রম সংবতের প্রবর্তন করা হয়।১

অন্ধ্রদের এই বিশাল সাম্রাজ্য ইতিহাসে সাতবাহন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। পুরাণের বিবরণ অনুসারে ১৯ জন নরপতি প্রায় তিন শ' বৎসর ধরে এই সাম্রাজ্য শাসন করেন। গোদাবরী অববাহিকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠান* নগরী ছিল এর রাজধানী। শিমুকের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ সেখানকার সিংহাসনে আরোহণ করলে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে যে রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করা হয় তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক শক্তি। গৌড়-মগধের কাণ্বায়ন বংশের সঙ্গে তাঁর কোনরূপ শত্রুতা ছিল না। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পর শিমুকের পুত্র শাতকর্ণি প্রতিষ্ঠান সিংহাসনে আরোহণ করে দূর-দূরান্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকেন। সমগ্র ভারতের উপর নিজ আধিপত্য প্রসারিত করবার জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞাশ্ব আর্য্যাবর্তে উপনীত হোলে সম্রাট সুশর্মা তার গতি-রোধ করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু কাণ্ব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শাতকর্ণির অভিযান সুরু হয়। সুশর্মা তাতে পরাজিত হয়ে চলে যান শক শিবিরে

* বর্তমান নাম পৈঠান। ঔরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরী তীরে অবস্থিত।

(খৃঃ পূঃ ২০)। গৌড় ও মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্ধ্র সাতবাহন বংশের রাজত্ব।

অলিখিত কোনও কারণে শাতকর্ণির অকালমৃত্যু হোলে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে তাঁর বিধবা মহিষী নয়নিকার উপর। অঙ্গিকা বংশজাতা এই নারী ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। শিশু পুত্র দেবশ্রী ও শক্তিশ্রীর অভিভাবিকারূপে তিনি দক্ষতার সঙ্গে সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন, কিন্তু সদ্যবিজিত অঞ্চলগুলির সংহতি সাধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য শকগণ পুনরায় মালবের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। তাদের বাধা দেবার মত প্রথম শ্রেণীর কোন সাতবাহন সৈন্যাধ্যক্ষ সেখানে উপস্থিত না থাকায় তারা অক্লেশে উজ্জয়িনী অধিকার করে পশ্চিমদিকে ধাবিত হতে থাকে। আরব সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাদের অধিকারভুক্ত হয়। দক্ষিণ দিকে কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। রাজধানী প্রতিষ্ঠান থেকে নূতন নূতন সৈন্য পাঠিয়ে রাজমাতা নয়নিকা তাদের অগ্রগতি রোধ করেন। যুদ্ধ চলতে থাকে। শক-সাতবাহনের রণভেরীর আওয়াজে সমগ্র ভারতভূমি কেঁপে ওঠে। হাজার হাজার সৈন্যের রক্তকণিকায় বিন্ধ্যগিরির প্রতিটি চূড়া লালে লাল হয়ে যায়।

যৌবনে পদার্পণের পর উদয়শ্রী সুনন্দনা নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাতবাহন সম্রাটদের সেই যে মাতৃ পরিচয় সুরু হয় কোন দিন তার বিরতি হয় নি। সুনন্দনা ও পরবর্তী দুই সম্রাট চকোর ও শিবস্বাতী ছিলেন দুর্বল শাসক। তাঁদের সময়ে শকগণ সাতবাহন বাহিনীকে বার বার পরাজিত করে দক্ষিণে বেলারী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। চষ্টন সে সময়ে এই শকদের নায়ক। নিজ জয়কে স্মরণীয় করবার জন্য তিনি শকাব্দের প্রবর্তন করেন (খৃঃ ৭৮)।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ১০৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে দেখেন, সাতবাহন সাম্রাজ্যের চারিদিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাঁর শক্তিমান নেতৃত্বের ফলে অর্দ্ধ শতাব্দীর অন্ধকার দূর হয়—সাতবাহন শক্তির দ্যুতিতে সমগ্র ভারতভূমি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইনি দ্বিতীয় শাতকর্ণি। এঁর জননী গৌতমী বালশ্রী তাঁর নাসিক শিলালিপিতে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পুত্র শক, যবন ও পহ্লবদিগকে পরাজিত করে বিন্ধ্যপর্বত থেকে মলয় ও পূর্ব ঘাট থেকে পশ্চিম ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। এই উক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। শক্তিমান শক সেনাপতি নহপান্ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শাতকর্ণির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

আর্য্যাবর্তে সেই সময় কুশান সম্রাট হুবিষ্ক রাজত্ব করছিলেন। তাঁর সাহায্যে বলীয়ান হয়ে কিনা জানি না, চষ্টনের পুত্র জয়দাম ও জামাতা উষবদাত সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নূতন করে অভিযান সুরু করেন। উষবদাত কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও জয়দাম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ সংগ্রাম (খৃঃ ১৩৫) সম্মিলিত শক শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং রাজপুতানা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির আধিপত্য। এই যুদ্ধের সময়ে বা তার পরে কোন সময়ে জয়দামের মৃত্যু হোলে পরাজিত শক সেনানীরা তাঁর পুত্র রুদ্রদামকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে সাতবাহন সম্রাটের কাছে দূত পাঠান। উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তাতে রুদ্রদাম দুহিতা মঢ়রির সঙ্গে শাতকর্ণি তনয় চতুরপণের বিবাহ হয়। প্রতিদানে সাতবাহন সম্রাট নূতন বৈবাহিককে মালবের সার্বভৌম অধীশ্বর বলে স্বীকার করে নেন। তাঁর বংশধরগণ সেখানে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে।[২]

এইভাবে সীমান্ত শত্রুশূন্য হোলে সাতবাহন সম্রাটগণ প্রজাদের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁদের

রাজধানী প্রতিষ্ঠান এক বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অজন্তা-এলোরার গুহামন্দিরগুলির নির্মাণও এই সময়ে সুরু হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এগুলির কারুকার্য্যের মধ্যে বিদেশী ভাবধারার কোন ছাপ না থাকায় নেহেরু এই সভ্যতার উল্লেখ করে বলেছেন, ভারতীয় কৃষ্টি যখন উত্তরে গ্রীক ও শকদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সম্রাটগণ তাকে সকল আবিলতার হাত থেকে সযত্নে রক্ষা করেন।[৩]

বশিষ্ঠীপুত্র পুলুয়ামি (খৃঃ ১৩০-৫৪) সাতবাহন বংশের শেষ শক্তিমান নরপতি। মাধবীপুত্রের অভিষেকের পর থেকে (খৃঃ ২১০) সেই যে সাম্রাজ্যের ভাঙন সুরু হয় কোন দিন তা রোধ করা সম্ভব হয় নি। গৌড়ের উপর অন্ধ্রাধিকার তার বহু পূর্বে লোপ পেয়েছিল। যে গৌড় তারা কান্ব বংশের হাত থেকে অধিকার করেছিল রোগবীজাণুতে তার সর্বাঙ্গ তখন জীর্ণ! নিরাময়ের জন্য যতখানি প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন তার একান্ত অভাব ; শকক্ষত্রপদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত অন্ধ্র শাসকগণের পক্ষে বিজিত অঞ্চলগুলির দিকে ভাল করে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পূর্বতন সামন্তরা সাতবাহন সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে নিজ নিজ অভীষ্টানুযায়ী রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এইভাবে কিছুকাল চলবার পর কুশানগণ যখন পূর্ব ভারতের দিকে এগিয়ে আসে তখন তাদের বাধা দেবার মত কোন শক্তি এখানে ছিল না।

1 Sastri K. A. N. *History of South India, p. 90*

2 Bhandarkar D. R. *Early History of Dekkan, p. 29*

3 Nehru J. *Glimpses of World History, p. 123*

ষষ্ঠ অধ্যায়

শক-কুশান যুগ

শক-ক্ষত্রপদের পরিচয়

শকদের বাসভূমি শাকদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাভারতে বলা হয়েছে যে সেখানকার সাতটি পর্বতের মধ্যে মহাগিরি মেরু প্রধান। পামির গ্রন্থি সেই মেরু পর্বত। এখান থেকে ক্ষীর সমুদ্র—কাস্পিয়ান্ সাগর—পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ শাকদ্বীপ। আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া প্রধান নদী। ভারতের দ্বিগুণ এই শাকদ্বীপে মগ, মশক, মানস ও মন্দক নামক চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ আছে। এখানে রাজা নাই, রাজেন্দ্র নাই, দণ্ড নাই, দণ্ডধারী নাই; ধর্মপ্রাণ অধিবাসীরা স্বধর্মপ্রভাবে পরস্পরকে রক্ষা করে—

জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন দ্বিগুণঃ স নরাধিপ।
বিষ্কম্ভেন মহারাজ সাগরোঽপি বিভাগশঃ॥
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা॥
ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্মেণৈব ধর্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥১

এরূপ রাষ্ট্রহীন ধর্মাশ্রিত জনপদ আদর্শ বাসস্থান হোলেও বাস্তবে সম্ভব হয় না। সেই কারণে মনে হয় শকরা ছিল শাসন বহির্ভূত যাযাবর জাতি। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার পারস্য জয়ের পর তাদের বাসভূমির পশ্চিমাংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করলে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রীক উপনিবেশ ব্যাকট্রিয়া—বাহ্লিক। তারপর বহু রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ১৭১ খৃঃ

পূর্বাব্দে পহ্লবগণ যখন ইরাণের উত্তরাংশে পার্থিয়া বা পারদরাজ্য স্থাপন করে তখন মাতৃভূমির সঙ্গে বাহ্লিকী গ্রীকদের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিজেদের বাহুবল ও বেতনভূক শক সৈন্য হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান অবলম্বন। পার্থিয়ার সৈন্যবাহিনীতেও যথেষ্ট শক সৈন্য ছিল। সেই শক ও নিজস্ব পারদ সৈন্য নিয়ে তারা বাহ্লিকী গ্রীকদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অস্ত্র ধারণ করত। তাতে না বাহ্লিক না পার্থিয়া কারও পক্ষে অন্যকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিবদমান শক্তিদ্বয়ের শক সৈন্যাধ্যক্ষরা উভয় দেশের অভ্যন্তরভাগে কয়েকটি সামন্তরাজ্য স্থাপন করেন।

এত শক স্বদেশ ছেড়ে এই সব উপনিবেশে এসে বাস করে যে তাদের নামানুসারে পার্থিয়ার দ্রোঙ্গিয়ানা প্রদেশের নাম হয় শকস্থান—পরে শিয়েস্থান। গান্ধার, কম্বোজ প্রভৃতি ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও এইভাবে কয়েকটি শক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্য্য সম্রাটদের অধীনে যবন তুসাস্প প্রমুখ শক সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা নগণ্য ছিল না; সর্বত্র এই বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও নিজ রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করবার মত সামর্থ্য কোন শক সেনানীর ছিল না। প্রবলতর কোনও নরপতির ক্ষত্রপ পরিচয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করতেন। মাঝে মাঝে অধিরাজ বদলাত, কিন্তু ক্ষত্রপ বদলাত না।

এমনি এক অধিরাজের পরিবর্তন ঘটে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। ভারতে যখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে সেই সময়ে ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতি এসে গ্রীকদের কাছ থেকে বাহ্লিক অধিকার করে স্থানীয় শকদের উপর এরূপ উৎপীড়ন চালাতে থাকে যে দলে দলে শক বিভিন্ন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরভাগে চলে আসে। তাদের মধ্যে খহরাৎগণ বেলুচিস্তানের পথে ভারতে এসে পুণা পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চল অধিকার করে নেয়। তাদের নেতা নহপানের কন্যা দক্ষমিত্রার সঙ্গে অপর এক খহরাৎ নায়ক দিনিকের পুত্র উষবদাতের বিবাহ হয়। সাতবাহন সম্রাট গৌতমী-

পুত্র শাতকর্ণির হস্তে উভয়ে পর্যুদস্ত হওয়ায় নহপান বংশের অবসান ঘটে।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শত্রু চষ্টন ছিলেন কর্দমক শকদের নায়ক। তাঁর পিতা বা পিতামহ যশোমোতিকার নেতৃত্বে এই শকগণও পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। যাত্রাপথের উভয় পার্শ্বে যে সব ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল সেগুলি জয় করতে করতে তারা শেষ পর্য্যন্ত চষ্টনের নেতৃত্বে মালব পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে। সেই থেকে অন্ধ্রদের সঙ্গে যে মহাসমরের সূত্রপাত হয় চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামের সময়ে উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত তার বিরাম হয় নি।

তৃতীয় শক শাখা কাবুল থেকে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করে তার ভারতীয় নাম কপিসা—চীনাদের কিপিন। রাজতিরাজস মোয়সের সময়ে তক্ষশীলা ছিল তার রাজধানী। এই বংশের রাজা অজেস শাক্যমুনির এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মথুরার ক্ষত্রপ রঞ্জুবুলের অগ্রমহিষীও কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। খহরৎ ও কর্দমকগণ কিন্তু ব্রাহ্মণ্যপ্রথা অনুসরণ করত। উষবদাতের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে উৎসবের সময়ে তিনি লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়েছিলেন এবং চতুর্মাস্যায় ভিক্ষুদের অশন যোগাতেন। রুদ্রদামের গির্ণার গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ আছে, 'যিনি স্বয়ম্বর সভায় বহু রাজকন্যার হস্ত হইতে বরমাল্য লাভ করিয়াছিলেন সেই মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম গো-ব্রাহ্মণ হিতের দ্বারা সহস্রবর্ষব্যাপী ধর্মকীর্তি বৃদ্ধির জন্য এই সেতু নির্মাণ করিলেন।'

মধ্য এশিয়ায় ভূমিকম্প

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বে চীনের উত্তর সীমান্তে বিরাট আলোড়ন

চলছিল। গোবি মরুভূমির প্রান্তদেশে যে সকল তাতার সম্প্রদায় বাস করত তারা গিউ নামে এক নায়কের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে চীন সম্রাটকে বিব্রত করতে থাকে। সেই ঘৃণ্য হিউং-নুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নৈসর্গিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ ইতিপূর্বে ২১৪ খৃঃ পূর্বাব্দে বিশ্বের বিস্ময় মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সেই প্রাচীর উপেক্ষা করে তাদের শক্তিমান সান্যু গিউ দেবাবতার চীন সম্রাটকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেন।

বিজয়দৃপ্ত গিউ তখন পশ্চিমদিকে বর্তমান সিংকিয়াংএর পূর্বাঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের চিরশত্রু ইউ-চিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে দেন। সেই যুদ্ধে ইউ-চিগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হোলে নিহত ইউ-চিরাজের মাথার খুলি দিয়ে প্রস্তুত হয় গিউর পানপাত্র! যুদ্ধশেষে ন্যূনাধিক দশ লক্ষ ইউ-চি নরনারী শত্রু ব্যূহ ভেদ করে প্রায় দুই লক্ষ বলিষ্ঠ ধনুর্ধারীর রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমদিকে চলতে থাকে (খৃঃ পূঃ ১৬৫)। পথে ইলি নদীর উপত্যকায় উ-সুন্‌গণ তাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অল্প, তীরন্দাজ মাত্র দশ হাজার। সেই কারণে উ-সুনদের আক্রমণে ইউ-চিরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। উ-সুন রাজ নান-তিন-মি তাদের হস্তে নিহত হন (খৃঃ পূঃ ১৬৩)।

ইউ-চিরা চলেছে। তাদের দেশ ছিল, ঘর ছিল না। ঘর এখনও চাই না, কিন্তু এমন এক চারণভূমি চাই যেখানে সকল পশুর খাবার মিলবে, অথচ হিউং-নুরা এসে উপদ্রব করতে পারবে না। তারিম উপত্যকায় সেরূপ স্থান মিলল। জায়গাটি সকল দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু পিছনে ফেলে আসা উ-সুন রাজ্যের উপর ঘৃণ্য হিউং-নুদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; নিহত রাজা নান-তিন-মির শিশুপুত্র কুয়েন-মুয়ো তাদের রাজধানীতে পালিয়ে গিয়ে গিউর কাছে আশ্রয় নেওয়ায়

তিনি এখন প্রকৃতপক্ষ সেই বালকের নামে উ-সুন রাজ্য শাসন করছেন। শত্রুর এত নিকটে বাস করা নিরাপদ নয়। ইউ-চিরা আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ইসিক্-কুল হ্রদের ওপারে সির্‌দরিয়া ও চু নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে পৌঁছে পথশ্রান্ত ইউ-চিরা তাঁবু খাঁটাল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর কলকল্লোল, হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষা ও সংখ্যাতীত পশুর মিশ্র ধ্বনিতে জুঙ্গেরিয়ার সেই নির্জন প্রান্তরে নূতন জীবনের সঞ্চার হোল। কিন্তু স্থানটি শকদের বাসভূমির পূর্বাঞ্চল। তাদের সংখ্যা ছিল, অস্ত্রও ছিল। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের তারা বরদাস্ত করবে কেন? দলে দলে শক এসে ইউ-চিদের তাঁবুগুলি অবরোধ করল। হতভাগ্যদের পিছনে ফেরবার পথ নেই, হিউং-নু ও উ-সুনরা এসে নিশ্চিহ্ন করে দেবে! আবার শকদের প্রতিহত করতে না পারলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরবিদায় নিতে হবে!

সেই জীবণ-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শুধু ধনুর্ধারীরা নয়, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকল ইউ-চি রণক্ষেত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হয় জয়, নয় মৃত্যু। তাদের মরণ-আঘাতের সামনে দাঁড়াতে না পেরে শকরা আশ্রয়ের জন্য দেশ ছেড়ে চলে গেল গ্রীকাধিকৃত বাহ্লিকে। সেখানে তাদের সোগ্‌দিনিয়া ও কাপিসা নামে দুটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোল।

এই বিরাট যুদ্ধজয় সত্ত্বেও ইউ-চিদের অদৃষ্টে শান্তি ছিল না। তাদের শত্রু গোকুলে বাড়ছিল। নূতন বাসভূমিতে বৎসর পনেরো বাস করবার পর যখন তারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করেছে সেই সময়ে পুরাতন শত্রু হিউং-নু ও উ-সুনরা সম্মিলিতভাবে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অভিযানের নেতা তাদের হাতে নিহত উ-সুন রাজের বালক পুত্র কুয়েন-মুয়ো! হিউং-নু রাজধানীতে লালিতপালিত হয়ে এখন সে যৌবনে পদার্পণ করেছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সেই শুভ অভিপ্রায়ের কথা শুনে হিউং-নু সর্দাররা

বললেন—সাবাস্ জোয়ান! বাহাদুর! সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে তাঁরা প্রতিশ্রুত হোলেন।

বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ কুয়েন-মুয়ো যখন জুঙ্গেরিয়ায় এসে উপনীত হোলেন ইউ-চিরা তখন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল। হাজার মাইল দূর থেকে শত্রু এসে যে এভাবে অভিযান চালাতে পারে এমন অনুমান তারা করে নি। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না থাকায় কুয়েন-মুয়োর সুসম্বদ্ধ বাহিনী ও দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের সম্মুখে দাঁড়ান শক্ত হয়। যুদ্ধ অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে ইউ-চিরা আর একবার নূতন চারণভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল (খৃঃ পূঃ ১৪২)।

এবার তাদের সুদিন এসেছে। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তর ধরে চলতে চলতে আমুদরিয়া নদীর উপত্যকায় উপনীত হয়ে তারা দেখে সেখানকার অধিবাসী তা-হিয়ানগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের প্রকৃতিও তেমন উগ্র নয়। নবাগতদের তারা দেখল, কিন্তু যুদ্ধের কোন ইঙ্গিত দেখাল না। সেই কারণে ইউ-চিরা বিনা প্রতিরোধে আমুদরিয়া উপত্যকায় বসবাস করবার সুযোগ পেল।

কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

এমনি করে একের পর এক বিপর্য্যয় কাটিয়ে ইউ-চি জাতির জীবনের বিশ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছে। হিউং-নুগণ কর্তৃক স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে তারা উ-সুনদের পরাজিত, শকদের দেশছাড়া ও তা-হিয়ানদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে। এই সব সংগ্রামে তারা দুর্ভোগ সয়েছে অনেক, কিন্তু লাভও করেছে কম নয়। তাদের দেহের শক্তি ও মনের বলের তুলনা নেই। তাদের সমকক্ষ কষ্টসহিষ্ণু জাতি এখন মধ্য-এশিয়ায় আর কে আছে? এতদিন তারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে, এবার আত্মপ্রসারের কথা চিন্তা করতে

লাগল। বাহ্লিক আক্রান্ত হোল। সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর ভ্রাম্যমান যাযাবরদের সেই অভিযান প্রতিহত করার জন্য যেরূপ শক্তির প্রয়োজন সেখানকার গ্রীক শাসকদের তা ছিল না। ইউ-চিদের আঘাতে তাদের সেলুসিড্ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

বাহ্লিক জয়ের ফলে ইউ-চিরা শুধু যে এক সাম্রাজ্য লাভ করে তা নয়, হিন্দু-গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়। এতদিন তারা জানত তাঁবু, তৃণক্ষেত্র, পশুচারণ আর যুদ্ধ। এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে সরে গিয়ে তারা তাঁবু ফেলেছে, নিজেদের দল বাড়িয়েছে, আর প্রয়োজনের সময়ে যুদ্ধ করেছে। জয়ী হোলে শত্রুর দেশে গিয়ে তাঁবু ফেলেছে, পরাজিত হোলে সমগ্র জাতি চলে গেছে অন্যত্র। বহির্জগতের কোন খবরই তাদের জানা ছিল না। এখন বুঝল, ঘর বাঁধবার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আছে; সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষ যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ভ্রাম্যমান যাযাবরের তাঁবুতে তা পাওয়া যায় না। যুদ্ধজয়ের ফলে যে সব গ্রীক তরুণী তাদের অন্দরমহলে স্থান পেয়েছে তাদের হাত দিয়ে সভ্য সমাজের নানা উপকরণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল। যাযাবরদের তাঁবু ভাঙল, বাহ্লিকী নগরগুলিতে ইউ-চি সর্দারদের জন্য বড় বড় প্রাসাদ গড়ে উঠতে লাগল।

এইভাবে ইউ-চিদের জীবনে দু'তিন পুরুষ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এখন তারা আর যাযাবর নয়—উত্তরে সির্‌দরিয়া থেকে দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর। সেই বিশাল রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে, সকল প্রজা তাদের অনুগত। রাজকোষে স্রোতের ন্যায় অর্থাগম হচ্ছে, আবার কোনও দিক থেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নেই। সুতরাং নিজেদের মধ্যে কলহ করা চলে। সেই কলহের ফলে ইউ-চিরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ ইয়াগ্‌বুর নির্দেশে যে যার রাজ্য শাসন করতে লাগল (খৃঃ ৬৫)।

ইউ-চিদের পূর্ব ঐক্য এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিলিয়ে গেছে,

পঞ্চশাখা পরস্পরকে নিধনের জন্য সদা-সচেষ্ট। সেই অন্তহীন আত্ম-কলহের শেষ পরিণতি কুশান শাখার ইয়াগ্‌বু কুজল কপ্তিসস্ কর্তৃক সকল শাখার উপর আধিপত্য বিস্তার। বামিয়ান শাখা ছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু ছলেবলেকৌশলে তাদের বশীভূত করে তিনি সমস্ত ইউ-চি জাতির একছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। তারপর উত্তরে সোগ্‌দিনিয়া ও পশ্চিমে পার্থিয়ার কতকাংশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোলে তাঁর সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে হিন্দুকুশ পার হয়ে কিপিন ও কাও-ফু* রাজ্য দুইটি জয় করে। তাদের চাপে কাও-ফুর শকগণ বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে ভারতে চলে আসে। তারাই পূর্বকথিত খহরৎ ও কর্দমক শক।২

আশি বৎসর বয়সে কুজল কপ্তিসসের মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র বিম্ কপ্তিসস্ কুশান সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার আধিপত্য বিস্তারে বিমের অবদান বড় কম নয়। বহু রণাঙ্গনে তিনি যুদ্ধ করেছেন, বহু প্রদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছেন। যখন তিনি মথুরার ক্ষত্রপ সেই সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকে অন্ধ্রগণ এসে পাটলিপুত্র অধিকার করে নেয়। তাদের কাছে পরাজিত কান্ব সম্রাট সুশর্মা তাঁর লুপ্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও শকদের সঙ্গে তাদের বিরোধের সুযোগ নিয়ে বিম্ কপ্তিসস্ তাঁর অধিকার পূর্ব দিকে প্রসারিত করতে থাকেন। পুরুষপুরে—পেশোয়ারে—স্থাপিত হয় তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই নগরীকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতের পাটলিপুত্র ও গৌড় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ ও কাশগড়ের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়। তাতে কারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ, কুশানরা শুধু ভারতের ধর্ম নয় জাতীয়তাও গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় কুশান সম্রাট কণিষ্কের সময়ে দেশে যেরূপ কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল অশোকের পর তেমনটি আর কোন দিন হয় নি।

কুশান যুগে সভ্যজগৎ চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

* কাও-ফু=কাবুল

পূর্বে চীনের হ্যান্ সাম্রাজ্য, পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণে সাতবাহন সাম্রাজ্য পরিবৃত হয়ে কুশান সম্রাটগণ আর্য্যবর্ত ও মধ্য-এশিয়া শাসন করতেন। ভারতও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। দক্ষিণাপথ নিয়ন্ত্রণ করতেন সাতবাহন সম্রাটগণ; পশ্চিম ভারতে শকক্ষত্রপগণ আপনাদিগকে হিন্দুধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার রক্ষক মনে করে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করতেন; কুশানদের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি, কিন্তু গৌড় থেকে অন্ধ্ররা নিষ্ক্রান্ত হবার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা যে কুশানগণ পূরণ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থানীয় দু' একটি রাজবংশের উদ্ভব যদি হয়েও থাকে তারা ছিল কুশানদের সামন্ত।

দেবপুত্র কনিষ্ক

যাযাবরের জীবন ত্যাগ করার পর ইউ-চিরা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের সংস্পর্শে আসতে থাকলে তাদের উষর জীবন ধীরে ধীরে মাধুর্য্যময় হয়ে ওঠে। কুজল কপ্তিসস্ তাঁর মুদ্রায় নিজেকে ধ্রুমঠিদাস আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যে কোন ধর্মের দাস ছিলেন তা সঠিক-ভাবে জানা না গেলেও তাঁর উত্তরাধিকারী বিম্ কপ্তিসস্ শৈবমতে দীক্ষা নিয়ে নিজেকে মহেশ্বরের সেবক বলে প্রচার করেন। তৃতীয় কুশান সম্রাট কনিষ্ক ছিলেন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। অর্হৎ সুদর্শনের কাছে শিক্ষালাভের ফলে এই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মে এবং সকল প্রজা যাতে তথাগতের পথে চলতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তাঁর উদ্যোগে যখন রাজগৃহে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তখন ওই স্থানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দেখে আর্য্যপার্শ্বিক প্রভৃতি অর্হৎ তাঁকে কাশ্মীরে স্থান পরি-বর্তনের পরামর্শ দেন।

স্থবির বসুমিত্রের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সেই মহাসঙ্গীতিতে

বোধিসত্ত্ব নাগার্জুনের প্রচেষ্টায় প্রচলিত বৌদ্ধমত থেকে বহু ক্লেদ দূর করা হয়। সভাপতির বিভাষাসুত্র নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদের পর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের সুদীর্ঘ ভাষ্য রচনা করেন। পাঁচ শতাব্দীর প্রাচীন ধর্ম নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! পার্শ্বের নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থীরা এই সব সংস্কারের বিরোধীতা করায় অনুষ্ঠান শেষে বৌদ্ধমত মহাযান ও হীনযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সদ্ধর্মের অগ্রগতির জন্য কনিষ্ক যে শুধু নিজের অধিকাংশ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য ব্যয় করতেন তা নয় রাজপুরুষদেরও এই মহান কার্য্যে ব্রতী করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে দণ্ডিত অপরাধী ও যুদ্ধবন্দীদের বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ান হোত। চীন সাম্রাজ্য থেকে কাশগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল-গুলি জয় করবার সময়ে যে সব বন্দী কনিষ্কের হস্তগত হয় তাদের তিনি শীতের সময়ে রাখতেন সমতলক্ষেত্রে, গরম পড়লে কাশ্মীরে। বৌদ্ধ শাস্ত্র সবার পক্ষে অবশ্যপাঠ্য ছিল। সেই বন্দীদের মধ্যে চীন সম্রাটের এক পুত্র রত্নশোভিত চীনপতি বিহার নির্মাণ করেন।

কনিষ্কের ন্যায় বিদ্যানুরাগী নরপতি বড় একটা দেখা যায় না। অশ্বঘোষকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজে পাটলিপুত্রে এসেছিলেন। তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন চরক, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, পার্শ্ব, মাতর প্রভৃতি মহামনীষীগণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিক্রমা-দিত্যের নবরত্ন সভা যেরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর সভাপণ্ডিতরা তা পান নি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের সমকক্ষ পণ্ডিত আর কে আছে? আত্রেয়ের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই প্রতিভাধর প্রাচীনতর বৈদ্যগ্রন্থসমূহের সংস্কার সাধন করে চরক-সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই মহাগ্রন্থ সূত্র, নিদান, শরীর, কল্প প্রভৃতি আট ভাগে বিভক্ত। তক্ষশীলায় ছিল তাঁর চতুষ্পাঠী ও বৈদ্যশালা। নাগার্জুন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও আয়ুর্বেদজ্ঞ। তাঁর রচিত দর্শনগ্রন্থ মাধ্যমিকসূত্র বৌদ্ধজগতের চিন্তাধারায় আমূল

পরিবর্তন সাধিত করে। বিদর্ভবাসী এই স্থবিরের ধর্মব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে রাজা ভোজভদ্র প্রমুখ হাজার হাজার ব্রাহ্মণ্যপন্থী বৌদ্ধমতে দীক্ষা নেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর স্থান ছিল প্রায় চরকের সমান। এ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কক্ষপুট, কৌতুহলচিন্তামণি, যোগ-রত্নাবলী, লঘুযোগরত্নাবলী প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। মাতর ছিলেন কূটনীতিজ্ঞ। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে কনিষ্ক সদাসর্বদা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

গান্ধার শিল্পের উদ্ভব

আদিতে বৌদ্ধদের মধ্যে মূর্তিপূজা পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। বুদ্ধ অমিতাভ, ঈশ্বরের অবতার নন। তিনি নিজেই বলেছিলেন, দেহবিনাশের পর না দেবতা না মনুষ্য কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।৩ সেক্ষেত্রে তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করবার প্রয়োজন কোথায়? বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন সাঁচী ও বরহুত স্তূপ বুদ্ধকে কেন্দ্র করে নির্মিত হোলেও তাঁর বিগ্রহ সেগুলির মধ্যে স্থান পায় নি। তাঁর ও বিভিন্ন বোধিসত্ত্বের জীবনের বিচিত্র কাহিনী স্তূপগুলির ফটক ও রেলিংয়ে ক্ষোদিত আছে, কিন্তু তিনি দৃশ্যাতীত! এগুলির আদর্শে নির্মিত যবদ্বীপের বোড়োবুদুর মন্দির, ব্রহ্মদেশের পাগান প্যাগোডা, নেপালের কাটমাণ্ডু স্তূপ প্রভৃতিতে কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। হীনযানপন্থীদের এই সব স্তম্ভ ও স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের স্থাপত্যশৈলির কোন তুলনা নেই। তাদের প্রার্থনাকক্ষে প্রবেশ করলে শুধু যে তার বিশালত্ব দেখে মনে বিস্ময় জাগে তা নয় এক অদৃশ্য শক্তি চিত্তকে আকর্ষণ করতে থাকে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলে মনে হয় যেন দেওয়ালে খোদিত যক্ষ ও দেবদেবীগণ অশরীরী মূর্তি ধরে ভক্তদের চারিদিকে অবস্থান করছেন।৪

বৌদ্ধমতকে অবলম্বন করে এই যে অভিনব স্থাপত্যের উদ্ভব

হয়েছিল আজও তা সকল দেশের শিল্পীদের মনে বিস্ময় জাগায়। নির্মাণের সময়ে ভাস্কররা স্থপতিদের সঙ্গে সংযোগ রেখে বোধিসত্ত্ব ও দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা চৈত্য ও বিহারগুলির শোভা বাড়াত আর ভক্তরা সেগুলির সম্মুখে অর্ঘ্য নিবেদন করত। চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দানের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাচীনপন্থীরা মূর্তিপূজার বিরোধীতা করে, কিন্তু নবীনগণ নিজেদের আরাধ্য দেবতাকে মূর্তিতে রূপায়িত করবার জন্য বদ্ধপরিকর! এরূপ এক মৌলিক প্রশ্নে রফা করা চলে না, আবার এক পক্ষের মত সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়াও অনুচিত। কাজেই বসুমিত্র ও নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে নবীনরা প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে।

কনিষ্ক নবীনদের সমর্থন করায় কুশান সাম্রাজ্যের সর্বত্র বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ভাস্কররা প্রস্তুত ছিল। এতদিন তারা সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দু ও উত্তরাঞ্চলে গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করছিল। স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে মথুরা, কাশগড় প্রভৃতি স্থান থেকে বহু ভাস্কর কেন্দ্রীয় রাজধানী পুরুষপুরে এসে হাজির হোল। পার্থিয়া থেকেও এল। তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মূর্তি নির্মাণের যে নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হোল তা না হিন্দু, না গ্রীক, না পার্থিয়—প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নূতন রূপ। গান্ধারে* উদ্ভব হওয়ায় এই শিল্প পরে গান্ধার শিল্প নামে প্রখ্যাত হয়।

বৌদ্ধদের আত্মবিসর্জন

কনিষ্ক ছিলেন দেবপুত্র। তথাগতের অমৃত বাণী শুধু বৌদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এই নীতি দেবপুত্র সম্রাট সমর্থন করতে পারেন

*গান্ধার—এখনকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও দক্ষিণ-আফগানীস্থানের সম্মিলনে গঠিত ভূভাগ। তক্ষশীলা, পেশোয়ার ও কান্দাহার এর কয়েকটি পরিচিত নগরী।

নি। সংস্কৃত তখনও শিক্ষিত সমাজের ভাষা—মার্জিত ভাষা। অশ্বঘোষ যখন তাঁর বুদ্ধচরিত সুললিত সংস্কৃত ছন্দে রচনা করেছেন তখন অন্যান্য গ্রন্থই বা এই ভাষায় প্রকাশিত হবে না কেন? সেই কারণে চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ পালি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফল কিন্তু শুভ হয় নি। এতদিন বৌদ্ধগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্রব এড়িয়ে পালি ভাষায় সকল কাজকর্ম চালাচ্ছিল। সংস্কৃত গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণরা তাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পায়। এই ভাষার অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণদের সমান পারদর্শী কে? আবার তাদের শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন না করলে সংস্কৃত শেখা যায়ই বা কেমন করে? ভাষা শিক্ষার সঙ্গে তরুণ শ্রমণরা শুধু যে ব্রাহ্মণগণকে গুরুত্বে বরণ করল তা নয়, তাদের শাস্ত্রসমূহের সঙ্গেও পরিচিত হতে লাগল। মূর্তিপূজা এখন আর নিষিদ্ধ নয়, তাই বৈদিক দেবদেবীগণ ভিন্ন রূপ ধরে বৌদ্ধ সমাজে অনুপ্রবেশ করতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং বুদ্ধ হয়ে বসলেন শিবের অবতার! শিবের যেমন দুর্গা, তাঁরও তেমনি প্রজ্ঞাপারমিতা সৃষ্টি হোল। অবশ্য ইনি শক্তিস্বরূপা নন, লক্ষ্মীরূপিণী। এইভাবে বৌদ্ধগণ ধীরে ধীরে বৈদিক সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৌদ্ধমতের পতনের কারণ বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভুলে যান যে খৃষ্টান রাজাদের বিপুল আর্থিক সাহায্য খৃষ্টান চার্চের পতন ঘটায় নি। তাদের বিশপ, আর্কবিশপ প্রভৃতিরা আজও রাষ্ট্রের কাছ থেকে যেরূপ অর্থানুকূল্য পেয়ে থাকেন বৌদ্ধ শ্রমণরা কোন দিন তা পান নি। অশোক ব্যতীত বোধ হয় কোন মৌর্য্য সম্রাট বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। এই মত যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা ভারত ছেয়েছিল তার কারণ এর নিজস্ব প্রাণশক্তি ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। যে বিদুরের খুদকুঁড়া তারা স্বেচ্ছায় দিত

তাই দিয়ে সঙ্ঘগুলির ব্যয় নির্বাহ হোত। রাইস ডেভিড্ হিসাব করে দেখেছেন, অশোক থেকে কনিষ্ক পর্য্যন্ত এই তিন শতাব্দী কাল সময়ে তিন-চতুর্থাংশ দানপত্রের গ্রহীতা বৌদ্ধ, এক-চতুর্থাংশের গ্রহীতা জৈন। কনিষ্কের পর থেকে বৌদ্ধ গ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে পঞ্চম শতাব্দীতে শূন্যে দাঁড়ায়। তিন-চতুর্থাংশ দানপত্রের গ্রহীতা তখন ব্রাহ্মণ![৬] অনুপাতের এই হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়, সংস্কৃত গ্রহণের পর থেকে দেশের ধর্মজীবনের নেতৃত্ব বৌদ্ধদের হাত থেকে চলে যায় ব্রাহ্মণদের হাতে।

এই অধোগতির জন্য দায়ী চতুর্থ মহাসঙ্গীতির সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ মত এক হিসাবে ব্রাহ্মণ্যপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সেই ব্রাহ্মণগণকে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ দিয়ে ভারতীয় বৌদ্ধরা নিজেদের বিলুপ্তির পথ উন্মুক্ত করে। চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ব্রাহ্মণ না থাকায় মহাযানপন্থীদের প্রভাব সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়। আজও চীনের সকল অধিবাসীর আহার-বিহারকে পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে এই মত।[৭] কিন্তু নদীর ওকুল যখন গড়ছিল একুলে চলছিল ভাঙন! ভারতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবার সুযোগ পেয়ে ব্রাহ্মণগণ সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে!

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে,
সমুদ্রে হোল হারা

কনিষ্কের তিরোধানের পর থেকে কুশানদের সূর্য্য সেই যে পশ্চিম গগনে হেলতে থাকে কোন দিন তার মোড় ফেরান সম্ভব হয় নি। বসিষ্ক বিনা বাধায় পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অজ্ঞাত কোনও কারণে চার বৎসর পরে তাঁকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুবিষ্কের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হোলেও কুশানদের আগেকার সেই প্রসারপ্রবণতা বা কনিষ্কের সময়কার ঔজ্জ্বল্যের কণামাত্রও তখন

অবশিষ্ট ছিল না।

পৃথিবী সে সময়ে নূতন রূপ পরিগ্রহ করছিল। পূর্ব প্রান্তে কনিষ্কের কাছে পরাজয়ের পর চীনারা কুশান সীমান্ত ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর তিরোধানের পর প্রতিভাবান সৈনাধ্যক্ষ প্যান-চাওয়ের নেতৃত্বে তারা কুশান সাম্রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ অতিক্রম করে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে উপনীত হয় (খৃঃ ১০২)। সেখান থেকে রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হবার ইচ্ছা তাদের ছিল, কিন্তু পীত-উষ্ণীষ বিদ্রোহ ও অবিচ্ছিন্ন গৃহবিবাদের ফলে চীনের সর্বত্র অরাজকতা চলতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ২২০ খৃষ্টাব্দে ওই দেশ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়।৮

কুশানদের পশ্চিম প্রান্তে পার্থিয়ার আগেকার সে সুদিন আর নেই। সেখানকার সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে অহরহ অগ্রাহ্য করছিলেন এবং বিভিন্ন খণ্ডজাতি চারিদিকে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছিল। এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে পারসিক বীর প্রথম আর্দেশির ২২৬ খৃষ্টাব্দে শাসন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে প্রতিবেশী রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে থাকেন।

একই বিবর্তন চলছিল কুশান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে। যে শক ও সাতবাহন শক্তির আত্মদ্বন্দ্বের ফলে কুশানগণ প্রায় বিনা যুদ্ধে আর্য্যাবর্ত অধিকার করেছিল তারা উভয়ে এখন রণক্লান্ত। অন্যান্য সীমান্তও নিরাপদ। এই নিরাপত্তা সম্রাট হুবিষ্ক এবং তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কনিষ্ক ও বাসুদেবকে বিলাস সমুদ্রে গা ভাসাবার সুযোগ দিল। তাঁদের রাজধানী পুরুষপুর সমসাময়িক রোমান নগরগুলির ন্যায় সৌখীন নরনারীর বিলাসভূমিতে পরিণত হোল। তেমনি সুরম্য মন্দির ও হর্মরাজি, তেমনি সুপরিকল্পিত স্নানাগার, তেমনি মূল্যবান বিলাস উপকরণে পুরুষপুর ও অন্যান্য কুশান নগরী ভরে উঠল। রোমানদের পম্পাই যেমন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের তলায় ডুবে গিয়ে নিজের

অস্তিত্ব বহু শতাব্দী ধরে অটুট রেখেছিল কোন কুশান নগরী যদি তেমনি অবিকৃত থাকত তা হোলে সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে একই দৃশ্য আজ দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। তার পর হয় তো লর্ড লিটনের ন্যায় শক্তিশালী কোন সাহিত্যিক সেই নগরীকে কেন্দ্র করে 'পম্পাইয়ের সেই শেষ দিনগুলি'র অনুরূপ এক অপূর্ব উপন্যাস সৃষ্টি করতেন!

সেদিনের সেই যাযাবরের তাঁবু, আর আজকের এই বিলাস নগরী পুরুষপুর! দুই শতাব্দীর মধ্যে কুশানরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তখন তারা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক ভ্রাম্যমান বর্বর জাতি। সমান বর্বর হিউং-নু ও উ-সুনদের চাপে যখন তারা স্বদেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে সেই সময় ঘোড়া, ইয়াক, ভেড়া ও ছাগল ছাড়া অন্য কোন বৈভব তাদের ছিল না। পর দিবসের আহার্য্যচিন্তা সবাইকে অহরহ বিমর্ষ করে তুলত! এখন তাদের ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা নেই। মধ্য-এশিয়ার সির্‌দরিয়া থেকে আর্য্যাবর্তের ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের তারা অধীশ্বর। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সকল ধনসম্পদ তাদের। আলাদীনের প্রদীপ ঘষলেই এক মহাকায় দৈত্য তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রূপার থালায় চব্যচোষ্য ও সোনার গেলাসে সুস্বাদু পানীয় দিয়ে যায়। এই বিপুল বৈভবের মাঝখানে বসে যুদ্ধের কথা চিন্তা করা যায় না!

ঐশ্বর্য্য কুশানদের কাল হয়ে দেখা দিল। পূর্বের ন্যায় মরণপণ করে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আর নেই; ঘরে বাইরে যে সব নূতন শক্তি মাথা তুলছিল তারা সেগুলি দেখেও দেখল না। তাদের এই শ্লথতার জন্য পশ্চিম সীমান্তের ওপারে নবগঠিত শাসন সাম্রাজ্যের পরোক্ষ সাহায্য পেয়ে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন সামন্ত রাজ্য একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। সেই বিদ্রোহের ঢেউ আর্য্যাবর্তকেও স্পর্শ করল। এই সব বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হবার মত উদ্যম সম্রাট বাসুদেব বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের ছিল না। সুযোগ পেলেই সামন্তগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে

অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। এমনি টলটলায়মান অবস্থার মধ্যে সঙ্কুচিত কুশান সাম্রাজ্য তৃতীয় শতকের শেষভাগ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছেয়ে থাকে।

পরে মধ্য-এশিয়ার ন্যায় আর্য্যাবর্ত হাতছাড়া হোলেও কুশান বংশ লোপ পায় নি। সম্রাট বাসুদেবের মৃত্যুর পর এই বংশীয় কিদার গান্ধারে এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কুশানদের দীপশিখা সহস্র বৎসর ধরে জ্বালিয়ে রাখেন। কহ্লন কিদারকে গান্ধারের হিন্দু রাজা বলে বর্ণনা করেছেন; আল-বেরুণীর মতে তিনি কনিষ্কের বংশধর।[৯] দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাবুল উপত্যকা ও পশ্চিম পাঞ্জাব এই কিদার-কুশান বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু দুর্য্যোগ তাদের উপর দিয়ে বহে গেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা জয়ী হয়ে ভারতের প্রবেশদ্বারে দুর্ভেদ্য রক্ষাব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতীয় কৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক ছিল এই কিদার-কুশান বংশ। যাযাবর ইউ-চি বহুকাল পূর্বে বিলীন হয়ে ভারতের মহামানবের মাঝে মিশে গিয়েছিল; ভারতও তাদের আপন জন বলে গ্রহণ করেছিল—

রণধারা বাহি-জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর॥

১ মহাভারতম্, ভীষ্মপর্ব, ৯, ৫৫, ৬৯
2 McGovern W. M. *Early Empires of Central Asia, p. 40, 70, 126*
(*Sources : Shi-Gi 123, Han-She 61, Han-Shu 96 a-b*)
3 Rhys David T. W. *Diologue of the Buddha, p. 56*
4 Brown Percy *Indian Architecture, Vol. I, p. 19*
5 Zimmer H. *Art of Indian Asia, Vol. 2, p. 8*
6 Rhys David T. W. *Budhist India, p. 145*
7 Lin Yutan *My Country and My People p. 156*
8 Wells H. G. *History of the World, p. 153*
9 Sachau E. C. *Alberuni's India, Vol. 11, p. 13*

সপ্তম অধ্যায়

শকাব্দ ও বিভিন্ন অব্দ

উদ্ভাবন রহস্য

কুশানদের পূর্বপুরুষ ইউ-চি জাতির সময়-নির্দেশ চীনা ঐতিহাসিকগণ করে গেলেও সেই যে ৬৫ খৃঃপূর্বাব্দে তারা পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হয় তার পর থেকে তাঁদের লেখনীতে ছেদ পড়ে। এর ফলে কুশানদের সময় তালিকায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করবার কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত সার্থক হয় নি। চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অন্যতম দিকপাল নাগার্জুন ৫৬ খৃঃপূর্বাব্দে রাজা ভোজভদ্রকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বলে অনেকের ধারণা এর কাছাকাছি কোন সময়ে কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনুরূপ আর এক যুক্তি দেখিয়ে ভাণ্ডারকর তাঁর অভিষেক কাল নির্দ্ধারিত করেছেন ২৭৫ খৃষ্টাব্দে।[১] মতদ্বৈধ এখানে শেষ নয়! বিভিন্ন সূত্রের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পণ্ডিত খৃঃ পূঃ ৮০, ৫৭, ৫; খৃঃ অঃ ৭৮, ১২০ ও ২৭৭ কনিষ্কের অভিষেককাল বলে স্থির করেছেন।[২]

যাঁর অভিষেকের সময় সম্বন্ধে এত মতান্তর, তিনি যে এক সংবৎ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। খ্যাতনামা জার্মান ভারতবিদ হেরম্যান ওল্ডেনবার্গ এই মতবাদ উদ্ভাবন করলে সর্বত্র বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁকে সমর্থন করলেও ওল্ডেনবার্গ তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধে গোড়ায় ভুল করেছেন এই যে কনিষ্ক ছিলেন কুশান—শক নয়।[৩] উভয় জাতির মধ্যে তরবারি ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক কোন দিন ছিল না। সে ক্ষেত্রে কুশান সম্রাটের প্রবর্তিত অব্দ তাঁর জাতির চিরশত্রু শকদের নামে উৎসর্গ করা

হয়েছে এরূপ যুক্তি কিছুতেই মানা যায় না। অথচ বহু গ্রন্থে এই মত লিপিবদ্ধ দেখা যায়!

জনসাধারণ এই মতবাদ কখনও স্বীকার করে নি। পুরুষ পরম্পরায় তারা শুনে এসেছে যে শালিবাহন নামে কোনও এক রাজার সময় থেকে শক সংবৎ চলে আসছে। কানিংহাম জনশ্রুতিটি সমর্থন করলেও শালিবাহন যে কে ছিলেন তা বলতে পারেন নি। শকরাজগণের দীর্ঘ তালিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এই নামীয় কোন রাজার সন্ধান আমি পাই নি। অথচ আবু রিহানের বিবরণ উদ্ধৃত করে কানিংহাম বলেছেন যে শালিবাহন ছিলেন জনৈক শক নরপতি।[৪]

শক সংবতের পটভূমিকায় রয়েছে বিক্রমাব্দ। বিক্রমাব্দ যদি হয় ক্রিয়া, শকাব্দ তার প্রতিক্রিয়া। পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ৫৭ খৃঃ পূর্বাব্দে সাতবাহন সম্রাটের জনৈক সেনাপতি শকদের হাত থেকে মালব উদ্ধার করলে তাঁকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করে বিক্রমাব্দ নামে এক নূতন অব্দের প্রবর্তন করা হয়। সে দিনের সেই পরাজয় শকদের ম্রিয়মান করলেও হতোদ্যম করে নি। দীর্ঘ কাল ধরে উভয় শক্তির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলবার ১৩৫ বৎসর পরে, ৭৮ খৃষ্টাব্দে, মহাক্ষত্রপ চষ্টনের নেতৃত্বে শকগণ পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। কানিংহাম বলেন চষ্টনের সেই বিরাট জয়ের স্মৃতি হিসাবে শক সংবৎ তখন থেকে চলে আসছে।[৫] শালিবাহন চষ্টনের বিকল্প নাম হতে পারে, আবার তাঁর যে সেনাপতি সাতবাহন শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন তাঁর নামও হতে পারে।

শকাব্দ প্রবর্তনের পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে যুধিষ্ঠিরাব্দ, বুদ্ধাব্দ, জৈনাব্দ প্রভৃতি দিয়ে কাজ চালান হোত। জ্যোতির্বিদগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ ধরে কাল গণনা করতেন। তাঁদের হিসাবানুসারে কলিযুগের ৩১৭৯ সনে শকাব্দ প্রবর্তিত হয়। আর্য্যভট্টের সময় পর্য্যন্ত সকল জ্যোতির্বিদ এই কল্যাব্দের নিরিখ ধরে সময় গণনা করলেও

এর পদ্ধতিটি সাধারণ লোকের বোধগম্য হোত না। সময়কে এ ভাবে জন-সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য রাখা অযৌক্তিক মনে করে বরাহমিহির শকাব্দ স্বীকার করে নেন। তাঁর সমর্থন পেয়ে অব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আবুল ফজল ও কহ্লনের হিসাব

আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বিভিন্ন হিন্দু অব্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ চতুর্থ, অর্থাৎ বর্তমান যুগের, প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির ছিলেন বিশ্বের রাজা। তাঁর অভিষেকের সময়ে যে অব্দটি প্রবর্তিত হয়েছিল এখন মহামান্য বাদশাহের রাজত্বের ৪০তম বৎসরে* তার ৪৬৯৬ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রবর্তনের দীর্ঘকাল পরে বিক্রমাদিত্যের সময়ে হিন্দুদের যে দ্বিতীয় অব্দটির প্রচলন হয় এখন তার ১৬৫২ সাল। বিক্রমাদিত্যের ১৩৫ বৎসর পরে রাজা শালিবাহন আর একটি নূতন অব্দের প্রবর্তন করেন; হিন্দুরা তাকে শকাব্দ বলে ও যথেষ্ট সম্মান দেখায়। এখন ১৫১৭ শকাব্দ।[৬]

কহ্লনের হিসাবানুসারে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গতে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে গোনার্দ কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরাব্দের সুরু হয় সেই সময় থেকে। তার ২৩৯১ বৎসর পরে বিক্রম সংবৎ এবং তারও ১৩৫ বৎসর পরে রাজা শালিবাহন শক সংবৎ প্রবর্তিত করেন।[৭] কহ্লনের মতে—

কলি যুগের সুরু থেকে যুধিষ্ঠিরাব্দ—	৬৫৩	বৎসর
যুধিষ্ঠিরাব্দ থেকে শালিবাহন—	২৫২৬	,,
শালিবাহন থেকে কহ্লন—	১০৭০	,,
কহ্লন থেকে বর্ত্তমান বৎসর—	৮৯৩	,,

*১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে

বঙ্গাব্দ

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় গৌড়েও পূর্বে শকাব্দ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেন বংশের পতনের পর তুর্কী বিজেতারা এই অব্দ লোপ করে নিজেদের ইস্‌লামী অব্দের প্রবর্তন করে। কোরেশদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজরৎ মহম্মদ ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান সেই দিন থেকে এই অব্দের সুরু হয়। গৌড়গণ হিজিরাব্দ মেনে নিলেও এর চান্দ্রমাস অনুধাবন করতে পারত না। তার ফলে রাজকার্য্যে হিজিরাব্দ ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে শকাব্দ চলতে থাকে। এরূপ দ্বৈত ব্যবস্থায় যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হোলেও সুলতানরা হিজিরাব্দ ছাড়বেন না, প্রজারাও শকাব্দ ভুলবে না!

এই জটিলতা নিরসনের জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্ তাঁর উজির পুরন্দর খাঁ এবং মুকুন্দ দাস, মালাধর বসু প্রভৃতি সভাসদদের পরামর্শক্রমে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন। এই অব্দও পয়গম্বরের হিজিরার দিন থেকে সুরু হোলেও ইসলামী চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস ধরে বৎসর গণনা করায় সনের তারতম্য ঘটে। সৌর বৎসর হয় ৩৬৫ দিনে, পক্ষান্তরে চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিনে। সূক্ষ্মভাবে হিসাব করলে উভয় বৎসরের পার্থক্য ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রথম প্রবর্তনের সময়ে বঙ্গাব্দ হিজিরাব্দ অপেক্ষা প্রায় ৯ বৎসর অগ্রবর্তী ছিল। এখন আরও বেশী।

বুদ্ধাব্দ

ভারত সরকার সম্প্রতি শক সংবৎকে দেশের জাতীয় অব্দরূপে গ্রহণ করেছেন। সকল সরকারী চিঠিপত্রে এই অব্দের উল্লেখ থাকে; প্রত্যহ প্রত্যূষে রেডিও প্রোগ্রামে শকাব্দের সন তারিখ শ্রোতাদিগকে জানান হয়। কিন্তু বুদ্ধাবির্ভাবের সময় থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে বলে বুদ্ধাব্দকে স্বীকৃতি দিলে আর কিছু না হোক

ঐতিহাসিকগণকে রাম জন্মাবার পূর্বে রামায়ণ রচনা করতে হোত না! প্রাচীন ইতিহাসের সময় তালিকা নির্দ্ধারণে বহু অসুবিধা পরিহার করা যেত! তথাগত ধরাধামে অবতীর্ণ হন ৫৪৪ খৃঃ পূর্বাব্দে এবং বুদ্ধত্ব লাভ করেন ৫১৪ খৃঃ পূর্বাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। তাঁর জন্ম দিন থেকে বুদ্ধাব্দের সুরু। থাইল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে এই অব্দ ধরে সময় গণনা করা হয়।

1 Bhandarkar D. R. *History of Dekkan, p. 261*
2 McGovern W. M. *Early Empires of Central Asia, p. 485*
3 Oldenburg H. *Indian Antiquary, 1881, p. 213-27*
4 Cunningham A. *Book of Indian Eras, p. 39*
5 Cunningham A. *Numismatic Chronicle, 1892, p. 44*
6 Abul Fazle Alemi *Ain-i-Akbari, Gladwins' trans., p. 223*
7 Wilson H. H. *Hindu History of Kashmir, p. 97*

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত যুগ

সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা

মহীরুহের প্রধান কাণ্ডটি নিয়ে কিদার পুরুষপুর ছেড়ে গেলে তার শাখাপ্রশাখা আপনা থেকে শুকিয়ে যেতে লাগল। বাহ্লিক গেছে, গান্ধার গেল—আর্য্যাবর্তের উপর কুশানাধিপত্য কতদিন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে? পুরুষপুরে অবস্থান করা প্রায় অসম্ভব দেখে সম্রাট তৃতীয় কনিষ্ক তাঁর রাজধানী মথুরায় সরিয়ে এনে মহাকুশান বংশের দীপ-শিখা সেখানে জ্বালিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু তাতে দুর্বলতা আরও বেশী করে উদ্ঘাটিত হোল। যৌধেয় নামে এক ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় পূর্ব-পাঞ্জাব ও রাজপুতানার কতকাংশে এক স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করে কুশান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করে। যুধিষ্ঠিরের নামে কেন যে এরা নিজেদের অভিহিত করত তা বলা যায় না। তাদের অনুকরণে অন্য এক সম্প্রদায় অর্জুনেয় নাম নিয়ে ভরতপুর ও আলোয়ার অধিকার করে বসে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের শক্তির অপ্রতুলতা উপলব্ধি করে যৌধেয়দের দলে যোগ দেয়।

মথুরায় রাজধানী সরিয়ে এনে তৃতীয় কনিষ্ক একেবারে বিপ্লবের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এ মথুরা সে মথুরা নয়। পূর্বে কুশান সম্রাটরা এখানে এলে যেরূপ আনুগত্য ও আপ্যায়ন পেতেন তিনি তা পেলেন না। নাগ নামক এক সম্প্রদায় তাঁর হাত থেকে অবলীলাক্রমে নগরটি অধিকার করে তাঁকে পুনরায় গৃহহারা করে দেয়।

নাগদের এক শাখা ভরশিব নাম নিয়ে কুশান সাম্রাজ্যের বাইরে

শক অধিকারের মধ্যে প্রভূতভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চষ্টনবংশীয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের অবস্থা তখন উত্তরের কুশান ও দক্ষিণের সাতবাহন সাম্রাজ্যের ন্যায় তত শোচনীয় না হোলেও ভরশিবদের অভ্যুত্থান তিনি রোধ করতে পারেন নি।

কুশান ও শক রাজগণের এই অধঃপতনের সময়ে বকটকগণ দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্যের মধ্যে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি পূর্বে ছিলেন সাতবাহন সম্রাটদের সামন্ত। তাঁর পুত্র প্রবরসেন ২৮৪ খৃষ্টাব্দে সে আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাধীন নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দীবর্দ্ধন নগরীতে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। প্রবরসেনের পুত্র রুদ্রসেন ও পৌত্র পৃথ্বিসেনের সময়ে বকটক অধিকার উত্তরে বুন্দেলখণ্ড থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১] পঞ্চম বকটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয়। স্বল্পকাল রাজত্বের পর রুদ্রসেনের অকালমৃত্যু হোলে রাণী প্রভাবতী দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে শিশুপুত্রের নামে বকটক রাজ্য শাসন করেন।

বকটকগণের অভ্যুদয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগন যে ভাবে কুয়াশামুক্ত হয়েছিল মথুরার নাগবংশ আর্য্যাবর্তে তাই করবে বলে সকলে অনুমান করতে থাকে। কুশানদের নিষ্ক্রমণের পর যে সব সামন্ত নরপতি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিলেন তাঁরা নাগরাজ ভবনাগের হাত থেকে আত্মরক্ষার আশা রাখেন নি। কিন্তু বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে হাসছিলেন! আর্য্যাবর্ত্তের এই বিশৃঙ্খলার সময়ে নেপালের লিচ্ছবিগণ এসে অবলীলাক্রমে পাটলিপুত্র অধিকার করে নেয়। বহু দিন পরে ওই নগরী আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর ভেসে ওঠে!

গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়

সে সময়ে মগধের এক অঞ্চলে রাজত্ব করতেন শ্রীগুপ্ত। অন্যান্য রাজবংশের ন্যায় কুশানদের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের

পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু নিজ শক্তিতে সে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে তিনি মিত্রের অন্বেষণ করতে থাকেন। লিচ্ছবিদের আগমনে ঘটোৎকচ আশার আলোক দেখতে পান এবং তাদের প্রধান্য স্বীকার করে লিচ্ছবি দুহিতা কুমারদেবীর সঙ্গে নিজ পুত্র চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দেন। রাজনীতির দাবা খেলায় ঘটোৎকচ ভবনাগের গজের চাল ঘোড়া দিয়ে মাৎ করেন!

সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সারা ভারতে লিচ্ছবিদের কোন তুলনা ছিল না। এই বংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ঘটোৎকচের প্রতিপত্তি সম্যকরূপে বেড়ে যায়। তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত ৩১৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণের পর এক নগণ্য সামন্ত থেকে লিচ্ছবিদের মিত্রের পর্য্যায়ে উন্নীত হন। মহানগরী পাটলিপুত্র তাঁর বিবাহের যৌতুক হয়ে দাঁড়ায়! রাজকীয় মুদ্রার এক দিকে তিনি নিজের ও মহাদেবী কুমারদেবীর যুগ্ম প্রতিকৃতি ও অন্য দিকে 'লিচ্ছব্যয়ঃ' কথাটি উৎকীর্ণ করেন।

মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় এই চন্দ্রগুপ্ত কোন চাণক্যের মন্ত্রণা লাভ করে ধন্য না হোলেও অধিকাংশ আর্য্য ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কুশানদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে এই তেজস্বী সম্প্রদায়ের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল বহু দিন পরে চন্দ্রগুপ্তের ভিতর দিয়ে তা বহিঃপ্রকাশের পথ পায়। তাদের বলে বলীয়ান চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যুৎবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হয় লোপ পায়, নতুবা বশ্যতা স্বীকার করে। স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে ২৮ গুপ্তাব্দে—৩৪৭ খৃষ্টাব্দে—তিনি পরলোক গমন করলে কুমারদেবীর গর্ভজাত পুত্র বিজয়রাজ বা কাচ সমুদ্রগুপ্ত নাম নিয়ে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করবার জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হোলে তাঁর প্রচণ্ড আঘাতে কোশলরাজ মহেন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নাগ, অর্জুনায়ন ও যৌধেয়দের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত এই ভাবে সিন্ধুনদী স্পর্শ করলে সমগ্র দেশকে নিজ পতাকাতলে আনবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

তাঁর আদেশে মহামন্ত্রী বীরসেন যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। যে প্রশস্ত উদ্যানে যজ্ঞশালা নির্মিত হোল তার এক দিকে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে পুরোহিতগণ মন্ত্র পাঠ করবেন; অন্য দিকে যজ্ঞাশ্বের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের চারপাশে বেল, খদির, পলাশ প্রভৃতি কাষ্ঠের একুশটি যূপ নির্মাণ করে তাতে তিন শত গরু, ছাগল ও মেষ বধ করা হবে। এখানে শাস্ত্রসম্মত নিরানব্বইটি যজ্ঞ শেষ হোলে অশ্বকে পাঠান হবে ভারত পরিক্রমায়। তার সার্থক প্রত্যাবর্তনের পর অনুষ্ঠিত হবে শেষ যজ্ঞ!

সব ঘোড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নয়। যে ঘোড়ার গায়ের রং মেঘের মত কালো, মুখ হরিদ্রাভ, উদর শ্বেতাভ ও কর্ণ রক্তিমাভ; যার পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ, চক্ষু সূর্য্যের মত তেজস্কর এবং যার উভয় পার্শ্বে সহজাত অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন আছে; যার বেগ ঝঞ্ঝার মত এবং যার দেহ থেকে সদা সুগন্ধ বহির্গত হয় কেবলমাত্র সেই বীর্য্যবান ঘোড়া এই বীর যজ্ঞের বলি হোতে পারে। এরূপ সর্বসুলক্ষণযুক্ত একটি অশ্ব সংগৃহীত হোলে ৬১ গুপ্তাব্দের* চৈত্র পূর্ণিমার দিন সেই মহাযজ্ঞ সুরু হয়। দিনের পর দিন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে পুরোহিতগণ নিরানব্বইটি যজ্ঞ সম্পন্ন করবার পর যজ্ঞাশ্বের কপালে বেঁধে দেওয়া হোল জয়পত্র। এখন থেকে সেই অশ্বের দায়িত্ব সৈন্যবাহিনীর। তাদের প্রতিনিধিরূপে যুবরাজ দেবশ্রী মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রতিজ্ঞা করলেন যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা অশ্বকে রক্ষা করবেন।

* ৬১ গুপ্তাব্দ=৩৮০ খৃষ্টাব্দ

অশ্বমেধ যজ্ঞ কোন কাপুরুষের ধর্মানুষ্ঠান নয়। পূর্ববিজ্ঞপ্তি না পাঠিয়ে এ যজ্ঞের ঘোড়া পররাজ্যে প্রবেশ করে না। এই শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে সমুদ্রগুপ্ত সকল রাজ্যের রাজধানীতে দূত পাঠিয়ে জানালেন—পাটলিপুত্রাধিপতি সবার কল্যাণ কামনা করেন, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি সবার সহযোগিতাপ্রার্থী। তাঁর যজ্ঞাশ্বকে যাঁরা অভ্যর্থনা জানাবেন তাঁদের তিনি স্বজনজ্ঞানে উৎসবে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আহ্বান পাঠাবেন, আবার তাঁদের বিপদের দিনে গুপ্ত বাহিনী গিয়ে পাশে দাঁড়াবে। এই বিনীত আবেদন সত্ত্বেও যদি কেউ যজ্ঞাশ্বের গতিরোধ করেন তা হোলে তাঁকে যুবরাজ দেবশ্রীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

যাত্রার পূর্বে মণিমুক্তাখচিত চীনাংশুকে দেহ আবৃত করে যজ্ঞাশ্বকে নিয়ে আসা হোল প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। সম্রাজ্ঞী দত্তাদেবী পুষ্পচন্দন দিয়ে সেই অশ্বকে বরণ করবার পর বধূরাণী ধ্রুবাদেবী ও অন্যান্য রাজ-বধূগণ তাকে প্রদক্ষিণ করে যাত্রাপথের উপর পূতবারি সিঞ্চন করলেন। পাটলিপুত্রের ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল, নগরপ্রাকারে তূরীধ্বনি করে অশ্বের জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করা হোল। সমস্ত নগরীর আজ উৎসবের বেশ—দলে দলে নরনারী পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে অশ্ব ও তার রক্ষীগণকে অভিনন্দন জানাল!

নিরর্গল অশ্ব চলেছে। মাঠঘাট পার হয়ে, নদীপ্রান্তর পাশে রেখে যোজনের পর যোজন পথ অতিক্রম করে অশ্ব চলেছে। পিছনে চলেছে হাজার হাজার সৈনিক। কেউ তাদের বাধা দেয় না, প্রতি-রোধের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। পিষ্ঠপুররাজ মহেন্দ্র, মহাকান্তররাজ ব্যাঘ্র, কট্টুরের স্বামীদত্ত, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, কুস্তলের ধনঞ্জয়, বেঙ্গির হস্তীবর্মা, পলকের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কেরলের মণ্ট—সকল নৃপতি যজ্ঞাশ্বকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গুপ্ত সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তাঁদের কারও সাধ্য ছিল না যে গুপ্ত

বাহিনীর গতিরোধ করেন। সে কাজ পারতো মধ্য-ভারতের বকটকরাজ। কিন্তু বৈবাহিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কে? দেবশ্রীর কনিষ্ঠা পত্নী কুবেরনাগ যে বকটকরাজ পৃথ্বিসেনের দুহিতা! আবার তাঁর নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয়েছিল পরবর্তী বকটকরাজ রুদ্রসেনের (৩৮৫-৯০) সঙ্গে। সেই তরুণ রাজার অকালমৃত্যু হোলে রাণী প্রভাবতী দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে (৩৯০-৪১০) পুত্র দ্বিতীয় প্রবরসেনের নামে বকটক রাজ্য শাসন করেন। পিতৃকুল সম্বন্ধে তাঁর এত গর্ব ছিল যে রিজেন্সীর সময়ে রাজকীয় দলিলপত্রে তিনি প্রভাবতী গুপ্ত বলে নিজের নাম সই করতেন।২

এই ভাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করবার পর যজ্ঞাশ্ব ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে গিয়ে উপনীত হোলে মহাক্ষত্রপ চষ্টনের বংশধর মালবপতি রুদ্রসিংহের অধীনে সকল শক একত্রিত হয়ে তার গতিরোধ করে। গুপ্ত ও শকে মহাযুদ্ধ সুরু হয়! সে সংবাদ পাটলিপুত্রে পৌঁছালে অভিযাত্রী বাহিনীর সাহায্যের জন্য সমুদ্রগুপ্ত নূতন নূতন সৈন্য রণক্ষেত্রে পাঠাতে লাগলেন। শকরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। ভারতের যেখানে যত শক ছিল সবাই এসে রুদ্রসিংহের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। বীর বিক্রমে লড়া সত্ত্বেও তাঁর পতন হোলে সিংহসেন শকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনিও পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। সেই সঙ্গে চার শতাব্দীর শক শাসনের অবসান ঘটে।

গুপ্ত বাহিনীর হাতে শক শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হবার সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে চারিদিকে আনন্দের রোল ওঠে। এই বিরাট জয়ের জন্য দেবশ্রী শতাব্দীর সম্মান পেতে পারেন! সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করে মালবের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করলেন। শক রাজধানী উজ্জয়িনীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক রাজধানী স্থাপন হোল।

শকদের পতনের পর দেবশ্রীর যজ্ঞাশ্ব রাজপুতানার মরুভূমি অতিক্রম করে সিন্ধুনদীর তীরে উপনীত হয়। তার ওপারে দেবপুত্র কুশান সম্রাটের রাজ্য। তিনি তখন নখরদন্তহীন সিংহ, গুপ্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা ভাবতেও পারতেন না। তারও ওপারে শাহান-শাহ্ কিদার-কুশানরাজের কাছ থেকেও গুপ্তবাহিনী কোন বাধা পেল না। মুরুণ্ডগণও বাধা দিল না। এইভাবে বামিয়ান গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে যুবরাজ দেবশ্রী ফিরে এলেন পাটলিপুত্রে। মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হোল!

বিচ্ছিন্ন কুশান রাজ্যগুলির উপর গুপ্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হোতে দেখে পারস্যের শাসন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্পুর বিচলিত হয়ে পড়েন।[৩] তাঁর দুরভিসন্ধির কথা সমুদ্রগুপ্ত ভালভাবেই বুঝেছিলেন। প্রথমে বাহ্লিক ও পরে গান্ধারের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে তার পর শাসনশক্তি যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটাবে না এমন কথা কে বলতে পারে? সমুদ্রগুপ্তের নির্দেশে যুবরাজ দেবশ্রী এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মধ্য-এশিয়ার দিকে চলে গেলেন। শাসন শক্তির সঙ্গে কোন সংঘর্ষ অবশ্য হয় নি, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্ত তাতে সুদৃঢ় হয়। এই দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করে মেহেরৌলি স্তম্ভে লেখা আছে—

অসিতে যাঁহার যশ ঘোষিত হইয়াছে, বঙ্গে যিনি সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে দলিত করিয়াছিলেন, যাঁহার দ্বারা সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া বাহ্লিক বিজিত হইয়াছিল, যাঁহার শৌর্যবায়ুতে দক্ষিণসমুদ্র আজও সুগন্ধিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার বীর্য্য দাবাগ্নির ন্যায় সকল অরিকে ভস্মীভূত করিয়াছে, যিনি শ্রান্ত হৃদয়ে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার খ্যাতি আজও পৃথিবীতে রহিয়াছে সেই কীর্তিভুজ বিষ্ণুভক্ত রাজা চন্দ্রের এই স্তম্ভ বিষ্ণুপাদ গিরির উপর স্থাপিত হইল।

দুই শতাব্দীর সমৃদ্ধি

দীর্ঘ ৫১ বৎসর রাজত্বের পর সমুদ্রগুপ্ত ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে যুবরাজ দেবশ্রী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নাম নিয়ে সিংহাসনে



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—প্রাচীন প্রতিকৃতি

আরোহণ করেন। পিতার জীবদ্দশায় শকদের দূরীভূত করে তিনি যে বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেছিলেন সেই নামে আজও সবার কাছে পরিচিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর পিতামহের সময় থেকে সুরু করে এই বংশের সময়-তালিকা এখানে দেওয়া হোল—

চন্দ্রগুপ্ত	মহাদেবী	কুমারদেবী	গুপ্তাব্দ	১—২৮	খৃষ্টাব্দ	৩১৯—৩৪৭
সমুদ্রগুপ্ত	,,	দত্তাদেবী	,,	২৯—৮০	,,	৩৪৮—৩৯৯
চন্দ্রগুপ্ত ২	,,	ধ্রুবাদেবী	,,	৮০—৯৪	,,	৩৯৯—৪১৩
কুমারগুপ্ত	,,	অনন্তদেবী	,,	৯৫—১৩১	,,	৪১৪—৪৫০
স্কন্দগুপ্ত	—	অজ্ঞাত	,,	১৩১—১৪৮	,,	৪৫০—৪৬৭
পুরগুপ্ত	,,	চন্দ্রাদেবী	,,	১৪৮—১৭১	,,	৪৬৮—৪৯০
নরসিংহগুপ্ত	,,	মীরাদেবী	,,	১৭২—২০১	,,	৪৯০—৫২০
কুমারগুপ্ত ২	—	অজ্ঞাত	,,	২০২—২১৪	,,	৫২১—৫৩৩

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হোলেও যেরূপ গৌরবোজ্জ্বল হয়েছিল ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। তাঁর সার্থক অশ্বমেধ পরিক্রমায় শুধু যে সমগ্র দেশের উপর এক সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয় গুপ্ত প্রভাব উত্তরে মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা আর নেই, গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্ভব নয়। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করায় দেশ ধনধান্যে ভরে ওঠে, দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবন ফলেফুলে বিকশিত হোতে থাকে।

গুপ্ত সম্রাটগণ শুধু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না, নিজেরাও ছিলেন বিদ্বান। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিকার নিজ প্রভুকে কবি-রাজ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ যে কবে প্রথম রচিত হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। শত শত বৎসর ধরে মূল গ্রন্থগুলি একই আকারে চলে আসবার পর গুপ্ত যুগে তাদের সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ওই মহাগ্রন্থগুলির মধ্যে যে সব কাহিনী সন্নিবিষ্ট ছিল সেগুলিকে সহজবোধ্য করে বৌদ্ধদের জাতক কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী সৃষ্টি করা হয়।

বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব, ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ প্রভৃতি নাটক ও কাব্যগ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়। এই সব প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের অল্প কয়েকখানি রচনা আমাদের হস্তগত হোলেও আরও যে বহু পুস্তক তাঁরা লিখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগুলির সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। অজ্ঞাতনামা আরও বহু সাহিত্যিকের নাম ও রচনাবলী চিরতরে লোপ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগ গৌরবোজ্জ্বল। কোন কোন গবেষকের মতে অঙ্কশাস্ত্রে শূন্য সংখ্যা এই সময়ে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও দশমিক পদ্ধতি গুপ্ত যুগে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, গর্গ প্রভৃতি শক্তিমান জ্যোতিষীগণ এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট পুরগুপ্তের রাজত্বকালে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্র নগরে আর্য্যভট্টের জন্ম হয়। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী গোল এবং প্রতিনিয়ত নিজ কক্ষের চারিদিকে ঘোরে। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই তিনি বিভিন্ন সময়ে দিনরাত্রির পরিমাপও নিখুঁতভাবে নির্দ্ধারিত করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণের কারণও আর্য্যভট্টের আবিষ্কার।

বরাহমিহির ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের শিরোমণি। জন্মস্থান অবন্তী। পূর্বতন পাঁচখানি সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে তিনি পঞ্চসিদ্ধান্ত রচনা করেন। আরও কয়েকখানি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। আয়ু-র্বিজ্ঞানেও এই যুগ কম গৌরবোজ্জ্বল নয়। ধন্বন্তরির নেতৃত্বে একদল গবেষক আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিভাগে নূতন নূতন তথ্য উদ্ভাবন করেন। রোগ নিরাময়ের জন্য যে সকল ধাতব ও জৈব ঔষধ এখন ব্যবহৃত হয় তার অনেকগুলি এই গুপ্ত যুগের আবিষ্কার। ধাতুবিজ্ঞানের যে কতখানি উন্নতি হয়েছিল তার প্রমাণ মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভ। বোধ হয় সম্রাট

কুমারগুপ্তের সময়ে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটী নির্মিত হয়, কিন্তু আজও তাতে মরিচা পড়ে নি।

গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের সময়ে বৌদ্ধমত বৈদিক প্রথার মধ্যে বিলীন হয়ে যে নূতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে বহু নূতন দেবদেবীর সাক্ষাৎ মেলে। ভাস্কররা নিখুঁতভাবে মূর্তিগুলি গড়ছিল এবং স্থপতিরা মন্দির-গুলিকে বৌদ্ধদের অনুকরণে শ্রীমণ্ডিত করছিল। এই ভাবে এক নূতন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। নাট্যশালা এই স্থাপত্যকে আরও বেশী সুষমাময় করে তোলে। পাটলিপুত্রের রাজ-প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হওয়ায় সেগুলির জন্য সুরম্য রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করতে গিয়ে স্থপতিরা গৃহ নির্মাণের নূতন নূতন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন।[৪] এই স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন তিগোড়ার বিষ্ণু মন্দির, এরানের নরসিংহ মন্দির, নাচনার পার্বতী মন্দির, ভামারার শিব মন্দির, দেওগড়ের বিষ্ণু মন্দির প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে পার্সী ব্রাউন বলেন: গুপ্তদের ন্যায় কৃষ্টিসম্পন্ন রাজবংশ উত্তরে আমুদরিয়া থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় নব নব আদর্শ উদ্ভাবিত হয়ে বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা ও সৃজনীশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এরই ফলে ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে স্থাপত্য, এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।[৫]

গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোলেও বৌদ্ধমতকে শুধু যে সমর্থন করতেন তা নয় রীতিমত উৎসাহ দিতেন। সে সময়ে পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি থেকে রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি থেকে সুবর্ণদ্বীপ, কম্বোজ ও ক্যান্টনে যে সব অর্ণবপোত চলাচল করত সে গুলিতে শুধু যে পণ্যসম্ভারের লেনদেন হোত তা নয়, বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর প্রবাহও যথেষ্ট আসত। কূটনৈতিক আদান প্রদানও বড় কম হোত না! সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু করে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে অন্ততঃ ১০টি

কূটনৈতিক মিশন চীনে গিয়েছিল। এ ছাড়া ৩৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ভারতীয় মিশন রোমেও গিয়েছিল।৬ যে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভারতে আসত তাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ও ই-সিন প্রমুখ অন্ততঃ ৬০ জন চীনা পরিব্রাজক এদেশ সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী লিখে গেছেন।৭

এই সব পরিক্রমা একতরফা হয় নি। ভারত থেকেও দলে দলে নরনারী সাগরপারে যেত। কুমারগুপ্তের সময়ে কাশ্মীররাজ সংঘানন্দের পুত্র গুণবর্মণ বৌদ্ধভিক্ষুর ব্রত নিয়ে যবদ্বীপে গমন করেন। ওই দ্বীপে তখন ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতাপ; রাজপরিবার ব্রাহ্মণ্যপন্থী। গুণবর্মণ সমগ্র দ্বীপকে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করে ১৩১ খৃষ্টাব্দে যান নানকিং।৮ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তরুণ ভিক্ষু কুমারজীব কাশ্মীরের এক বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। পাঠ সমাপনের পর তিনি যখন মধ্য-এশিয়ার কুচি নগরে গিয়ে তাঁর পিতা কুমারায়নের সঙ্গে বাস করছিলেন সেই সময়ে ঐ নগরটী জনৈক চীনরাজের সেনাপতি লু-কোয়াংএর অধিকারে চলে যায়। কুমারজীবের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের কথা শুনে লু-কোয়াং তাঁকে স্বরাজ্যে নিয়ে গিয়ে কুয়ো-মি বা শিক্ষা অধিকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।৯

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন চীনের জনৈক শাসক প্রজাদের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চেয়ে পাটলিপুত্রে দূত পাঠান। তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিলোপ হয়েছে, নূতন এক গুপ্ত বংশ পূর্ব দিকে সরে এসে গৌড় শাসন করছে। চীনরাজের অনুরোধ রক্ষা করে গৌড়াধিপ পাটলিপুত্রবাসী স্থবির পরমার্থকে ৫৪৮ খৃষ্টাব্দে চীনে পাঠান। সেখানে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তথাগতের বাণী নিয়ে এরূপ আরও যে সব সন্ন্যাসী গুপ্ত যুগে দেশ-

বিদেশে গমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বোধিধর্ম। তাঁর কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

1 Sastri K. A. N. *History of South India, p. 95*
2 Altekar A. S. & Majumder R. C. *Vakataka-Gupta Age p. 88*
3 Huart C. *Ancient Persia and Iranian Culture, p. 128*
4 Rambach P. & Golish V. *The Golden Age of Indian Art, p. 10*
5 Brown Percy *Indian Architecture, Vol. I, p. 58*
6 Zimmer H. *Art of Indian Asia, Vol. I, p. 355*
7 Goodrich L. C. *Short History of the Chinese People, p. 105-8*
8 Coedes G. *Les Etate hindouises d' Indonesie, p. 95*
9 Thomas P. *Cultural Empire of India, p. 291*

নবম অধ্যায়

মহাস্থবির বোধিধর্ম

রাজা উ-তি ও গৌড়ীয় সন্ন্যাসী

চীনা বৌদ্ধদের যে শাখা চ্যান্ নামে পরিচিত তার প্রতিষ্ঠাতা মহাস্থবির বোধিধর্ম সমগ্র প্রাচ্য জগতে বুদ্ধের ২৮তম উত্তরাধিকারী বলে পূজা পেয়ে থাকেন। চীনারা বলে, গুপ্তযুগের শেষ দিকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অধোগতি লক্ষ্য করে বোধিধর্ম বুঝে নেন যে প্রজ্ঞাপারমিতার দ্যুতি সেখানে স্তিমিত হয়েছে; এখন থেকে তিনি চীনে রশ্মি বিকিরণ করবেন। সেই কারণে ৫২৬ খৃষ্টাব্দে এই গৌড়ীয় সন্ন্যাসী তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে অর্ণবপোতে উঠে চীন যাত্রা করেন। পরে যান জাপানে। ওই দেশের ইকরুগ মন্দিরে তাঁর কাষায় ও ভিক্ষাপাত্র বহুকাল রক্ষিত ছিল। ভারত থেকে যাত্রার সময়ে সমসাময়িক গৌড়ীয় অক্ষরে লিখিত প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র ও উষ্ণীষবিজয়ধারিণী নামক যে দুইখানি গ্রন্থ তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন সেগুলিও জাপানের হোরিউজি মঠে আবিষ্কৃত হয়েছে।[১]

বোধিধর্মের জাহাজ যখন ক্যাণ্টন বন্দরে নোঙর করে সেই সময়ে স্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা কয়েকটি শুভ লক্ষণ দেখেছিলেন। তাঁর আগমন-বার্তা দক্ষিণ চীনের রাজধানী নানকিংএ পৌঁছাতে বেশী সময় লাগে নি। সেখানকার রাজা উ-তি ছিলেন পরম বৌদ্ধ। জীবহত্যার তিনি এতই বিরোধী ছিলেন যে পাছে তাঁর প্রজারা জীবজগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে সেই ভয়ে সূচীশিল্পে জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেন। কাঁচি দিয়ে সেই চিত্র কেটে মানুষ যে আসল

প্রাণীহত্যায় অভ্যস্ত হবে না এমন কথা কে বলতে পারে? এইরূপ এক পরম অহিংস নরপতি যখন শুনলেন যে তাঁর রাজ্যে মহাজ্ঞানী বোধিধর্ম পদার্পণ করেছেন তখন তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। তাঁকে ক্যাণ্টন থেকে নানকিংএ নিজ রাজসভায় আহ্বান করে মহারাজ উ-তি জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান কোথায়।

—হে পূজ্যপাদ মহাত্মন! আজীবন আমি সদ্ধর্ম পালন করেছি। আমার রাজ্য মধ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ, আমি নিজে সূত্রসমূহ নিয়মিত পাঠ করি এবং প্রজাদের হিতার্থে ত্রিপিটকের সংস্কার সাধন করিয়েছি। এখন বলুন, এই সব সৎকর্মের জন্য কোন্ ফল লাভের আমি অধিকারী?

—কিছুই না।

বিস্মিত নৃপতি কিছুক্ষণ মৌন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—পবিত্র মতবাদগুলির মধ্যে পবিত্রতম কোনটি?

—শূন্য—মহাশূন্য।

শূন্য! মহারাজ উ-তি আবার মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

—যদি সবই শূন্য, তা হোলে আপনি কে?

—জানি না, কিছুই জানি না।

দীপ্তকণ্ঠে এই কথা উচ্চারণ করতে করতে বোধিধর্ম চলে গেলেন রাজসভা থেকে। নৃপতি উ-তি সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চ্যান্ দর্শনের সূত্রপাত

লোইয়াং শহরের সাও-লিন্ মন্দির। বোধিধর্মের জীবনের নয় বৎসর সময় এই মন্দিরে ধ্যানস্থ থেকে অতিবাহিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসত তাঁকে দেখতে, অনেকে দীক্ষাও নিতে চাইত। কিন্তু গুরুগিরি করবার আকাঙ্খা তাঁর ছিল না। দর্শনার্থীদের পরিহার

করবার জন্য তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর সেই মহাধ্যান ভাঙবার জন্য কনফিউসীয় যুবক সান্-কোয়াং তাঁর সম্মুখে সাত দিন সাত রাত্রি বরফের উপর বসে রইল। কিন্তু তাতেও যখন তাঁর দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন যুবক তরবারি দিয়ে নিজের বাম হাত কেটে তাঁর সম্মুখে রাখল। এবার বোধিধর্মের মুখ খুলল।

—কি চাও তুমি ?

—মহাত্মন! আমি আজীবন আত্মার শান্তি চেয়েছি, কিন্তু পাই নি। আমার উপর কৃপা করুন, আমাকে শান্তি দিন।

—তোমার আত্মাকে আনো। এনে আমার সামনে রাখো।

—হায়! বলল সান্-কোয়াং, আমার আত্মা কোথায় ? তাকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—যদি তাই হয় তা হোলে সে আত্মা শান্ত হয়েছে।

বোধিধর্ম এই কথা বলতে না বলতে সান্-কোয়াংএর সর্বাঙ্গ এক মহাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মহাস্থবির তাকে দীক্ষা দিলেন। তিনি চ্যানপন্থী বৌদ্ধদের দ্বিতীয় মহাগুরু হুই-কো।

চ্যানপন্থীদের মতে মহাস্থবির বোধিধর্ম ভারতের সর্বশেষ ধ্যানী বৌদ্ধ এবং চীনের সর্বপ্রথম ; তিনি ভারতের উপকূল ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমতের এই শাখা চিরতরে ভারতভূমি ছেড়ে চীনে চলে গেছে। আধুনিক চীনের চ্যানপন্থী বৌদ্ধদের প্রবীন নেতা অর্হৎ ইউং-সি বোধিধর্ম সম্বন্ধে বলেন ঃ যদিও বুদ্ধাশ্রয়ী দেশের সংখ্যা অনেক, কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার জ্যোতিতে কেবলমাত্র চীন ভাস্বর ; কারণ কেবলমাত্র চীনাদের ন্যায় মনীষা ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাতি বৌদ্ধধর্মের চ্যান মত গ্রহণ করতে পারে। এই মত নিয়ে বোধিধর্ম যখন চীনে আসেন তার পূর্বে কনফিউচি ও লাও-সে এই মহামত গ্রহণের জন্য জমি তৈরী করে রেখেছিলেন। চ্যানপন্থী বৌদ্ধগণ সদাসর্বদা নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে

মহাজ্যোতির অন্বেষণ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানে বুদ্ধকে দেখতে পায়।২

মরণজয়ী জেন

চ্যান্ মত জাপানে জেন্ নামে পরিচিত। এই মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ ওই দেশের সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়। জ্ঞানেবিজ্ঞানে জাপান যে আজ পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠতম দেশে পরিণত হয়েছে তার মূলে রয়েছে এই জেন মতবাদ। এ সম্বন্ধে দার্শনিক মাসুনাগা বলেন: চীনের চ্যান ও জাপানের জেন শব্দ দুটি সংস্কৃত ধ্যান শব্দের রূপান্তর। বৌদ্ধগণ এই ধ্যানপদ্ধতি গ্রহণ করলেও এর উদ্ভব হয় বুদ্ধাবির্ভাবের বহু পূর্বে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর বিশদ বর্ণনা আছে। এই পদ্ধতিতে ধ্যানের দ্বারা মন শান্ত ও সমাহিত হয়ে সর্বপ্রকার শৃঙ্খলাহীন চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হয়।

মাসুনাগার মতে জেনের উৎপত্তি ভারতের আধ্যাত্মিকতায়, বিকাশ চীনের প্রায়োগিকতায় এবং পূর্ণতা জাপানের সৌন্দর্য্যজ্ঞানে। সেই কারণে জেন মতবাদ জাপ জীবনকে সকল দিক দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। জাপানের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চারুশিল্প, উদ্যান রচনা, পুষ্প-বিন্যাস, নোহ্ গীতি, রোঙ্গা কাব্য, ওয়াকা ছন্দ, হাইকি, কোতো, সাকুহাচি—এক কথায় সমগ্র জাতীয় জীবন জেন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জাপ দ্বীপপুঞ্জের জাতীয়তার উৎস এই জেনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। 'কামাকুরা যুগের শেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের কৃষ্টি যখন বিপন্ন সেই সময়ে জেন পুরোহিতগণ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। জেন বলে: তোমার মনই বুদ্ধ। এই আত্মানুভূতি সকল জাপানীকে বিপদের দিনে স্থির থাকতে শক্তি যোগায়।৩

জাপান যে কখনও কোন বিদেশী শক্তির দ্বারা বিজিত হয় নি তারও পশ্চাতে রয়েছে এই জেন মতবাদ। বৌদ্ধমতের এই শাখার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুজুকি বলেন: বুসিদো বা ক্ষাত্রধর্মের উপর জেনের প্রভাব

অসীম। এই মতবাদ গ্রহণ করবার পর জাপানের ক্ষত্রিয় সামুরাইগণ মরণজয়ী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। রণবিদ্যা শেখবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়মিতরূপে জেনপদ্ধতি অধ্যয়ন করতে হোত। তার ফলে তারা উচ্চাঙ্গের নৈতিক জ্ঞান, অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা এবং মরণকে তুচ্ছ করবার প্রেরণা লাভ করে। সামুরাইগণকে জেন এক দিকে হাসিমুখে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জনের প্রেরণা দেয়, আবার অন্য দিকে পরাজিত শত্রুকে আত্মীয়বৎ সম্মান দেখাতে উদ্বুদ্ধ করে। জেনবিশ্বাসী সামুরাইরা ধর্মযুদ্ধের সময়ে বিনা দ্বিধায় প্রাণ দেয়, আবার যুদ্ধজয়ের পর শত্রুর সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে!

এই অভিনব ধর্মমতের স্রষ্টা গৌড়ীয় সন্ন্যাসী মহাস্থবির বোধিধর্ম। চীন ও জাপানে তাঁর আসন স্বয়ং তথাগতের নীচে। অথচ যে গৌড় থেকে তিনি প্রাচ্যদেশে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর নাম পর্য্যন্ত কেউ জানে না!

1 Margoliouth D. S. *Anecdota Oxoniensia, Aryan Series, part III*

2 Yung Hsi, *Budhism and Chan School of China, p. 10*

3 Masunaga R. *Soto Approach to Zen, p. 34, 42*

4 Suzuki D. T. *Zen and Japanese Budhism, p. 132*

দশম অধ্যায়

হূণাক্রমণ

হূণদের পরিচয়

মেঘদূতের কাব্য ঝঙ্কারে ভারতের আকাশ বাতাস যখন মুখরিত হচ্ছিল মধ্য-এশিয়ার বহ্নিমুখ থেকে সেই সময়ে আর একবার অগ্ন্যুৎপাত স্নুরু হয়। হূন্‌জা উপত্যকা নামে পরিচিত কাশ্মীরের উত্তরে যে জনপদটি এখন পাকিস্তানভুক্ত হয়ে রয়েছে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেখানে উদ্দাম প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। জনপদটি পর্বতময়। এখান থেকে পশ্চিমে চলে গেছে হিন্দুকুশ ও দক্ষিণ-পূর্বে হিমালয়। কারাকোরামের সুউচ্চ শৃঙ্গ রাকাপোশি (২৫,৫০০ ফুট) এখানে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে বিশ হাজার ফুটের অধিক উচ্চ যত শৃঙ্গ আছে ইউরোপের সমগ্র আল্পস পর্বতমালায় দশ হাজার ফুট উচ্চ শৃঙ্গ তত নেই।১ এখানকার একমাত্র নদী হূন্‌জার দুধারে স্বল্পপরিসর ভূমিতে কিছু চাষাবাদ হয়; আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। সর্বত্র পাহাড় আর পাহাড়! পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব পাহাড় থেকে দলে দলে অশ্বারোহী ভারত ও পারস্যের সমভূমির উপর অবতরণ করে বিভীষিকা সৃষ্টি করে।

হূন্‌জার সীমান্ত চিরদিন অনির্দিষ্ট। এখনকার হূনজা-মীর* যে রাজ্যটি শাসন করেন গুপ্ত যুগের হূন্‌জা তার চেয়ে আয়তনে অনেক বড় ছিল। উত্তরকালে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে তার একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিল্‌গিট ও অপর অংশ লাদাক ও তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়। চীনাদের

*বর্তমান মীরের নাম মহম্মদ জামাল খাঁ। তিনি আগা খাঁ-পন্থী ইসমাইলী মুসলমান।

সিংকিয়াংও বেশ কিছুটা অংশ গ্রাস করে নিয়েছে।২

হূনজার অধিবাসীদের এখন বলা হয় হূনজুকুট—অতীতে বলা হোত হূণ। এদের স্বগোত্রীয় আর এক শ্রেণীর হূণ পঞ্চম শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ তোলপাড় করে। তাদের গায়ের রং হরিদ্রাভ ছিল বলে ঐতিহাসিকদের কাছে তারা পীত হূণ নামে পরিচিত। উভয় শ্রেণীর হূণই চীনাবর্ণিত হিউং-নুদের বংশধর। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনের মহাপ্রাচীরের উত্তরে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করে হিউং-নুরা যে ইউ-চিদের দেশছাড়া করেছিল সে কথা পূর্বে বলেছি।* স্বয়ং চীন সম্রাট বাৎসরিক কর হিসাবে স্বর্ণ, রেশম ও নির্দিষ্ট সংখ্যক চীনা তরুণী প্রদান করে তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন।

এই ভাবে দুই শত বৎসর চলবার পর গৃহবিবাদের ফলে হিউং-নু সাম্রাজ্য ৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হোলে চীনাগণ তাদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয়। পরাজিত হিউং-নুদের এক অংশ বিজয়ীদের অনুগত প্রজা হয়ে স্বস্থানে বসবাস করতে থাকে এবং অন্য অংশ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এই শরণার্থীদের একটি শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে হূন্‌জা ও আমুদরিয়া নদীর অববাহিকায় বসবাস সুরু করে এবং অন্য শাখা যুদ্ধ করতে করতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের ড্যানিয়ুব উপত্যকাটি নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান বলে গ্রহণ করে। তাদের নাম থেকে উপত্যকাটির নাম হয় হূণ-গারি—পরে হাঙ্গেরি।

এই পীত হূণদের রাজা রুয়াসের মৃত্যু হোলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এ্যাটিলা ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে হূণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতৃব্যের মধ্যে যদি বা কিছু কোমলতা ছিল তিনি সকল হৃদয়বৃত্তি ড্যানিয়ুবের জলে ভাসিয়ে দিয়ে চারিদিকে হত্যা ও বিভীষিকা ছড়াতে থাকেন। তাঁর সৈন্যদের পদ ভরে মেদিনী কেঁপে ওঠে। উত্তর ইউরোপের ফ্রাঙ্ক, গথ, ভ্যাণ্ডাল

*ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৭৭

প্রভৃতি যে সব বর্বর জাতি এতদিন রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন অভিযান চালাচ্ছিল এশিয়ার এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদের দেখে তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আশ্রয়ের সন্ধানে তারা অন্ধকার বিবরে লুকিয়ে পড়ে। হূণদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, পরাজিত সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস তাদের সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মানজনক সর্তে সন্ধি করেন (খৃঃ ৪৫৩)।[৩]

একই সময়ে শ্বেত হূণগণ তাদের নূতন বাসভূমি থেকে এগিয়ে আসে ভারত ও পারস্যের দিকে। তাদের সমগ্র যাত্রাপথ ছিল বুদ্ধের জ্যোতিতে ভাস্বর। বাহ্লিক থেকে বৌদ্ধ শ্রমণ ও শক ব্রাহ্মণগণ তাদের রাজধানী গোর্গোয় অহরহ যাতায়াত করায় তারা এক উন্নত কৃষ্টির সংস্পর্শে আসে। তাতে রণদুর্মদ হূণদের প্রকৃতি ও অবয়ব ধীরে ধীরে কমনীয় হয়; পূর্বাপেক্ষা মৃদু আবহাওয়ায় বাস করবার ফলে গায়ের রংও যথেষ্ট বদলে যায়। ইতিহাসে এই হূণগণ শ্বেত হূণ নামে পরিচিত।

শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্য মত শ্বেত হূণদের জীবনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে থাকে। হূণরাজ লখন উদয়াদিত্য বহু শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী রাজা তোরমান ছিলেন সূর্য্যোপাসক। প্রতি দিন প্রত্যূষে জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ঃ মহাদ্যুতিং মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি দিনের কাজ সুরু করতেন। তাঁর পুত্র মিহিরকুল ছিলেন শৈব। দিল্লীর অদূরে তিনি মেহেরৌলি নামক নগর স্থাপন করে তার কেন্দ্রস্থলে মিহিরেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করেন।[৪] শ্বেত হূণদের নেতৃত্ব গ্রহণের পর তিনি রুদ্রমূর্তিতে আর্য্যাবর্তের সমভূমির উপর অবতীর্ণ হয়ে হত্যা ও ধ্বংস ছড়াতে থাকেন। কহ্লন বলেন, নরমাংসলোভী গৃধ্র, শিবা ও বায়সগণ তাঁর সঙ্গে পথ চলত; শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে তাঁর বাধত না; এই বেতাল নরপতি প্রমোদকুঞ্জেও শব পরিবৃত হয়ে বসে থাকতেন।[৫] পীত হূণগণও ইউরোপের ইতিহাসে

রক্তপিপাসু বর্বর বলে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। সেখানে তারা শকদের ঔরসে ডাইনীর গর্ভজাত সন্তান! গিবনের বিবরণ অনুসারে তারা শুধু বাল্কান উপদ্বীপে সত্তরটি নগর জনশূন্য করেছিল।

প্রথম হূণ যুদ্ধ

পারস্যের শাসন সম্রাটের কাছ থেকে গান্ধার অধিকার করে শ্বেত হূণদের দলপতি লখন উদয়াদিত্য তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন শাকলে।* এবার গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোতে হবে। অন্যান্য সীমান্ত থেকে হূণ সৈন্যগণ স্রোতের ন্যায় পূর্ব দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; তাদেব নূতন রাজধানী এক বিশাল সামরিক শিবিরে পরিণত হোল। স্কন্দগুপ্ত সে সময়ে গুপ্ত সম্রাট। লখনের দুঃসাহস সহ্য করবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সুরু হোল উভয় শক্তির মধ্যে লোমহর্ষক সংগ্রাম। দীর্ঘস্থায়ী সেই মহাযুদ্ধের বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকলেও হূণদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাগণ যে প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য প্রাণপাত করে লড়েছিল এমন কথা অনুমান করা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গুপ্ত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তারা ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত ছেড়ে চলে যায়।

এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওডিসাস পীত হূণদের নায়ক এ্যাটিলার কাছে পরাজিত হয়ে যে সর্তে সন্ধি করেছিলেন তা আত্মসমর্পণের নামান্তর। শাসন সম্রাট দ্বিতীয় যজদেগার্ড পূর্বকথিত শ্বেত হূণদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে স্কন্দগুপ্ত তাদের সামরিক বল এমনভাবে ভেঙে দেন যে বহু দিন ধরে এ দেশের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

অন্য সীমান্তেও নূতন অভিযান সুরু করা হূণদের পক্ষে অসম্ভব হয়। সেই কারণে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে কাবুল উপত্যকায় অপসারিত করে লখন পারস্যের শাসন বংশের অন্তর্দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ

* বর্তমান নাম শিয়ালকোট

করেন। ধীরে ধীরে পারস্য তাঁর অনুগত রাজ্যে পরিণত হয় এবং তিনি পুনরায় ভারতাক্রমণের আয়োজন করতে থাকেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় দায়িত্ব পড়ে তাঁর পুত্র তোরমানের উপর।

দ্বিতীয় হূণ যুদ্ধ

স্কন্দগুপ্ত তখন পরলোকে। তাঁর কোন সন্তান না থাকায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বিশাল সাম্রাজ্য ও দুর্জয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হোলেও অগ্রজের শৌর্য্য পুরগুপ্তের মধ্যে ছিল না। তার উপর রাজকোষ শূন্য! প্রথম হূণ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্কন্দগুপ্তকে নিকৃষ্ট মানের মুদ্রা চালাতে হয়েছিল।৬ সেই মুদ্রার সংস্কার করতে পুরগুপ্ত যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েন; সৈন্যবাহিনীর বেতন ও রসদ জোগান শক্ত হয়। এই কারণে তোরমান অতি সহজে গান্ধার পুনরাধিকার করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। জনপদের পর জনপদ জয় করতে করতে তাঁর অভিযাত্রী বাহিনী যখন মালবের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয় সেখানকার গুপ্তসামন্ত সুরশ্মিচন্দ্রবর্মা তাদের প্রবলভাবে বাধা দেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তোরমান তখন আরও অগ্রসর হয়ে বারাণসীর উপকণ্ঠে পৌছালে প্রধান গুপ্তবাহিনী এসে তাঁর সম্মুখীন হয়। সেই যুদ্ধে তোরমানের সৈন্যবাহিনী অটুট থাকলেও তিনি নিজে হন নিহত।

অজ্ঞাত কোন কারণে সম্রাট পুরগুপ্তেরও একই সময়ে (খৃঃ ৪৯০) মৃত্যু হয় এবং তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নরসিংহগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্ত বংশের এই অসহায়তা তোরমানের পুত্র মিহিরকুলকে যথেষ্ট উৎসাহ যোগায়। পারস্য, গান্ধার ও মধ্য-ভারতের সকল সম্পদ এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই বিপুল শক্তি নিয়ে

তিনি অগ্রসর হোতে থাকেন পাটলিপুত্রের দিকে। নরসিংহগুপ্ত বয়সে তরুণ হোলেও গুপ্তবংশের বহ্নি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল। সামন্ত ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নূতন রাজধানীতে আহ্বান করে তিনি সৈন্য সন্নিবেশের আদেশ দিলেন। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সারা দেশ নরসিংহগুপ্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলে উঠল, তাদের সম্রাট বালক নন—বালাদিত্য। সেই নামেই তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন।

সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাবার জন্য সম্রাট বালাদিত্য সৈন্যবাহিনী পুনর্বিন্যাসের আদেশ দিলেন। তাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হোলেন বলভীর সামন্ত ভটার্ক। অপচয় করবার মত সময় আর নেই। মিহিরকুল দ্রুতগতিতে পাটলিপুত্রের দিকে এগিয়ে আসছেন। ওই নগরী তাঁর হস্তগত হোলে তাঁকে আর্য্যাবর্তের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করা হবে। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করতেই হবে। ভটার্ক পূর্ব দিকে চম্পায় অথবা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করে পাটলিপুত্রকে এক অজেয় সামরিক শিবিরে পরিণত করলেন। তারপর সুরু হোল পাল্টা আক্রমণ। সেই যুদ্ধের তীব্রতা সহ্য করা হূণদের পক্ষে অসম্ভব হয়; মিহিরকুল প্রাণপণে লড়েও ভটার্কের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সইতে অক্ষম হন। তাঁর ব্যূহ ভেঙে যায়; তিনি হন ভটার্কের হাতে বন্দী। সেই অবস্থায় তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনা হোল পাটলিপুত্রে।

ভ্রষ্টা রাজমাতা

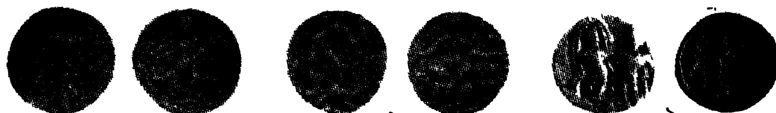
হূণ যুদ্ধের উপর এখানেই শেষ যবনিকা পড়ত। কিন্তু অন্তরায় হোলেন সম্রাট বালাদিত্যের বিধবা জননী। মিহিরকুল ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে রাজমাতার কানে এসে পৌঁছালে তিনি বন্দীকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারাগার থেকে মিহিরকুলকে আনা হয় রাজপ্রাসাদে—তাঁর সম্মুখে।



১ ২ ৩



৪ ৫ ৬



৭ ৮ ৯



১০ ১১ ১২



১৩ ১৪ ১৫



১৬ ১৭ ১৮ ১৯

২০

২১

গুপ্তযুগের মুদ্রা

এত রূপ!—এ শুধু দেবতায় সম্ভব। এই রূপবান তেজস্বী যুবককে অন্ধকার কারাগারে আটকে রাখা কিছুতেই উচিত নয়। রাজমাতা ডুবলেন! তিনি ভুলে গেলেন যে বন্দী তাঁর বালক পুত্রের ক্রূরতম বৈরী।

প্রাসাদের সেই গোপন কাহিনী রাজদরবারে পৌঁছালে সম্ভাব্য দুর্বিপাক পরিহার করবার জন্য মন্ত্রী ও সভাসদগণ বন্দী হূণরাজকে শুধু রাজধানী থেকে নয়, সাম্রাজ্য থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁকে নিয়ে কারারক্ষীরা চলে গেল উত্তরে—একেবারে কাশ্মীর সীমান্তে। রাজ্যহারা সঙ্গীহারা মিহিরকুলের যাবার মত কোন স্থান ছিল না। শাকল সিংহাসনে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর অধিষ্ঠিত; সূচাগ্রপরিমাণ ভূমিও তিনি অগ্রজকে দিতে রাজী হোলেন না। উপায়ান্তরবিহীন মিহিরকুল তখন কাশ্মীরে গিয়ে রাজা হিরণ্যকুলের পুত্র বসুকুলের কাছে আশ্রয় চাইলেন। পরের কয়েক বৎসর তাঁর গতিবিধি রহস্যাবৃত। অনেকে মনে করেন, তিনি আশ্রয়দাতাকে অপসারিত করে কাশ্মীরের অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন। কহ্লন বলেন, এই সময়ে তিনি ওই রাজ্যে কয়েকটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেন। বৌদ্ধরা অবশ্য যথেষ্ট নিগৃহীত হয়।

তৃতীয় হূণ যুদ্ধ

কাশ্মীর মিহিরকুলকে নূতন করে জীবন সুরু করবার সুযোগ দেয়। এখানকার সম্পদ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হূণগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি ৫২৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবলীলাক্রমে গান্ধার পুনরধিকার করে তাঁর সৈন্যবাহিনী যখন আর্য্যাবর্তের সমভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল কেউ তাদের বাধা দিল না। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিকার! তাঁদের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ হয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মালবের নূতন সামন্ত যশোধর্মণকে নায়ক নির্বাচিত করে হূণদের বিরুদ্ধে এক যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন। মালবপতি সম্মিলিত বাহিনীর

নেতৃত্ব করবেন, কিন্তু যুদ্ধ চলবে সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের নামে।

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাশাধর্মণ এগিয়ে যেতে লাগলেন হূণ শিবিরের দিকে। কোরুর প্রান্তরে উভয় পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি হোয়ে দাঁড়ালে মিহিরকুল বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যশোধর্মণের প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখে স্থির থাকতে পারলেন না। প্রাণপাত যুদ্ধ করেও তাঁর সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; সেই সঙ্গে ভারত থেকে হূণাতঙ্ক চিরতরে দূর হয়!

মিহিরকুলের শেষ পরিণতি জানা যায় না। কিন্তু পরাজিত হূণ সৈন্যগণ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে রাজপুতানার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা ছিল ব্রাহ্মণ্যপন্থী ক্ষত্রিয়। সেই কারণে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে তাদের অসুবিধা হয় নি। অবশ্য আর্য্য-ক্ষত্রিয়গণ কোন দিন তাদের আপন জন বলে গ্রহণ করে নি। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি হোয়ে গেল!

রোমান সাম্রাজ্য যা পারে নি যশোধর্মণ তাই করেছিলেন। সেই কারণে সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত তাঁকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করেন। অথচ তাঁর নিজের তখন নখরদন্তহীন সিংহের দশা! নামেই তিনি ভারতসম্রাট—মগধ ও গৌড়ের বাইরে তাঁর আদেশনামা অচল। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় দুর্বল হস্তে যৌথ পরিবারের ঐক্য রক্ষা করছিলেন। প্রাচীন মহীরুহের ছায়ায় বসে ভারতবাসী পরম শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। সেই মহীরুহের মূলোৎপাটন করলেন যশোধর্মণ। গুপ্ত বংশকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার পরিবর্তে তিনি নিজেকে তাদের শূন্য আসনে বসালেন। সবার অলক্ষ্যে সেই মহান

বংশ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে গেল! সুবন্ধুর বাসবদত্তা তখন রচিত হচ্ছে; বরাহমিহির তখনও জীবিত। কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁরা কেউ রোধ করতে পারেন নি!

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।

1 Lord Curzon *Leaves from a Viceroy's Note-Book and Other Papers*
2 Shor P. & G. *Nat. Geog. Mag. of Amer., Oct, '53, p. 492*
3 Gibbon E. *Decline and Fall of Roman Empire, Vol II, p. 18, 23, 25, 264*
৪ দুর্গাদাস লাহিড়া, পৃথিবীর ইতিহাস, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৬২
৫ রাজতরঙ্গিনী, প্রথম তরঙ্গ, শ্লোক, ২৮৮-৩০৯
6 Cunningham A. *Coins of Mediaeval India, p. 15*

একাদশ অধ্যায়

খণ্ডিত ভারত

আর্য্যাবর্তের তিন রাজ্য

কোরুর যুদ্ধে মিহিরকুলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে হূণ শক্তি যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয় অন্য দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর তেমনি পড়ে শেষ যবনিকা। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের আয়ু বহু পূর্বে শেষ হয়ে এসেছিল —অক্সিজেন প্রয়োগ করে সামন্তগণ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মাত্র। তৃতীয় হূণ যুদ্ধের শেষে দেখা গেল যে নিজের জোরে বেঁচে থাকবার মত প্রাণশক্তি তার নেই। পূর্বতন হূণ যুদ্ধে মিহিরকুলকে পরাজিত করবার গৌরব সম্রাট বালাদিত্য অপেক্ষা তাঁর সেনাপতি ভটার্কের বেশী ছিল বলে সেই সৈনিক মূল্য বড় কম আদায় করেন নি। তাঁকে সৌরাষ্ট্রের স্বাধীন অধিশ্বর বলে স্বীকার করতে হয় এবং তিনি সেখানে বল্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঘকে এভাবে রক্ত দিয়ে বশ করা যায় না। ভটার্কের স্বাতন্ত্র্য লাভে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য সামন্তরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এইভাবে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ, কনৌজে মৌখরি বংশ এবং সম্মিলিত মগধ ও গৌড়ে এক নূতন গুপ্ত বংশের অভ্যুদয় হয়। পশ্চিমে সিন্ধু নদী থেকে পূর্বে ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কুক্ষিগত করে এই তিন রাজবংশ প্রায়-স্বাধীনভাবে আর্য্যাবর্ত শাসন করতে থাকে।

পুষ্পভূতি প্রতিষ্ঠিত শ্রীকণ্ঠ রাজ্য এখনকার পাঞ্জাব ও আগ্রা অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। রাজধানী স্থাপিত হয় কুরুক্ষেত্রের নিকট থানেশ্বরে। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে রাজবংশ পুষ্পভূতি বা পুষ্যভূতি

আর্য্যাবর্তের তিন রাজ্য ও মালব

বংশ বলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সর্বসমেত যে সাতজন রাজা এখানকার সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁদের নাম—

পুষ্পভূতি	মহিষী	অজ্ঞাত
নরবর্দ্ধন	,,	,,
রাজ্যবর্দ্ধন ১	,,	অপ্সরোদেবী
আদিত্যবর্দ্ধন	,,	মহাসেনা
প্রভাকরবর্দ্ধন	,,	যশোমতী
রাজ্যবর্দ্ধন ২	,,	অবিবাহিত
হর্ষবর্দ্ধন	,,	অজ্ঞাত

থানেশ্বরের পূর্বে মৌখরিদের রাজ্য কান্যকুব্জ—কনৌজ। রূপকথার পাঁচ কন্যার পৃষ্ঠে স্থাপিত এর রাজধানী কনৌজ সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্টিকেন্দ্র। রাজবংশের নাম কেন যে মৌখরি হোল তা বলা যায় না, তবে এঁদের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে কুশান শক্তির বিলোপের সময়ে। তখন তাঁরা বোধ হয় কুশানদের সামন্ত; চন্দ্রগুপ্তের কাছে নতি স্বীকার করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হন। এখন সেই সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ায় তাঁদের সুযোগ এসেছে। পর পর তিনটি হূণযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার ফলে সামরিক বল বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট, অথচ অধিরাজ বংশের সে দিন আর নেই। তাই তাঁরা পূর্ব আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে নিজ রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। এই বংশের আটজন রাজার নাম—

হরিবর্ম্মা	মহিষী	জয়স্বামিনী
আদিত্যবর্ম্মা	,,	হর্ষগুপ্তা
ঈশ্বরবর্ম্মা	,,	উপগুপ্তা
ঈশানবর্ম্মা	,,	লক্ষ্মীবতী
শর্ববর্ম্মা	,,	অজ্ঞাত
সুস্থিরবর্ম্মা	,,	,,
অবন্তীবর্ম্মা	,,	,,
গ্রহবর্ম্মা	,,	রাজ্যশ্রী

কনৌজের পূর্বে পাটলিপুত্র। সন্নিহিত অঞ্চলগুলিসহ এই নগরী পূর্বে গুপ্ত সম্রাটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শাসিত হোত। বস্তুতঃ দীপ নির্বাণের পূর্বে এই স্বল্পপরিসর অঞ্চলের বাইরে তাঁদের প্রভাব কোথাও অনুভূত হোত না। দ্বিতীয় হূণ যুদ্ধের সময়ে সেনাপতি ভটার্ক পূর্ব দিকে চম্পা বা গৌড়ে রাজধানী অপসারিত করায় নগর দুইটি সেই থেকে বৈশিষ্ট লাভ করে। তার কিছু কাল পরে গুপ্তসম্রাট বংশের পতন হোলে তাঁরা অথবা তাঁদের এক শাখা পূর্বাঞ্চলে সরে গিয়ে সঙ্কুচিত মগধ-গৌড়ের উপর রাজত্ব করতেন থাকেন। ইতিহাসে এঁরা নূতন-গুপ্ত বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের সাতজন রাজা ও সমকালীন কনৌজ ও থানেশ্বর রাজগণের নাম—

গৌড়	কনৌজ	থানেশ্বর
কৃষ্ণগুপ্ত	হরিবর্ম্মা	পুষ্পভূতি
হর্ষ গুপ্ত	আদিত্যবর্ম্মা	নরবর্দ্ধন
		রাজ্যবর্দ্ধন ১
জীবিতগুপ্ত	ঈশ্বরবর্ম্মা	আদিত্যবর্দ্ধন
কুমারগুপ্ত	ঈশানবর্ম্মা	,,
দামোদরগুপ্ত	শর্বনর্ম্মা	প্রভাকরবর্দ্ধন
	সুস্থিরবর্ম্মা	,,
মহাসেনগুপ্ত	অবন্তীবর্ম্মা	রাজ্যবর্দ্ধন ২
মাধবগুপ্ত	গ্রহবর্ম্মা	হর্ষ বর্দ্ধন

গোড়ার দিকে রাজবংশ তিনটি হূণ-বিজয়ী যশোধর্মণের নেতৃত্ব মেনে চলত। তা সত্ত্বেও যশোধর্মণ নিজ অধিকার পূর্ব দিকে লৌহিত্য* নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন, অথচ এই তিন বংশের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নি। যাদের বলে বলীয়ান হয়ে হূণশক্তি ধ্বংস করেছেন তাদের বিরাগ-ভাজন হবার মত কোন কাজ করা উচিত নয়! এই শক্তিমান রাজাদের অধিকারের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি নিজের সামন্ত ও ক্ষত্রপ নিয়োগ

*লৌহিত্য — ব্রহ্মপুত্র

করেন। পুণ্ড্রে নিযুক্ত হয়েছিলেন ধর্মাদিত্য; বঙ্গকে ত্রিধা বিভক্ত করে স্থানুদত্ত, সমাচারদেব ও গোপচন্দ্রের অধীনে তিনটি সামন্ত রাজ্য গঠন করা হয়।

আকাশ মেঘমুক্ত রাখবার জন্য যশোধর্মণ থানেশ্বররাজ আদিত্য-বর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধনের সঙ্গে নিজ কন্যা যশোমতীর বিবাহ দেন। তার ফলে মালব ও শ্রীকণ্ঠ রাজ্যের সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। আদিত্য-বর্দ্ধন আবার বিবাহ করেছিলেন গৌড়েশ্বর মহাসেনগুপ্তের ভগ্নী মহা-সেনাকে। সেই সূত্র ধরে গৌড় রাজপরিবারের সঙ্গেও যশোধর্মণের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। তিনটি প্রধান রাজবংশ এইভাবে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় যশোধর্মণের বিরুদ্ধে কোথাও কোন বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে নি। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পর কনৌজ-গৌড়ের ধূমায়িত বহ্নি লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাঁর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। দুই সীমান্ত থেকে তারা মালব আক্রমণ করলে যশোধর্মনের পুত্র শিলাদিত্য রাজ্য ছেড়ে পিতৃশত্রু মিহিরকুলের পুত্র প্রবরসেনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর শিশুপুত্র প্রভাকরবর্দ্ধনের গৃহে পিতৃষ্বসা যশোমতীর কাছে লালিত পালিত হোতে থাকে।

এইভাবে আর্য্যাবর্তের দুই শক্তির সম্মিলিত অভিযানের ফলে যশোধর্মণ বংশের পতন হোলে বিজয়ী নরপতিগণ গুপ্ত সম্রাট বংশের এক উত্তরাধিকারীকে মালবের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়!

গৌড়-কনৌজ সংঘর্ষ

যশোধর্মণের রণকৌশলে মিহিরকুলের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হোলেও হূণ শক্তি লোপ পায় নি। কাশ্মীর ও তক্ষশীলা তাদের অধিকারে থাকে; সেখান থেকে তারা মাঝে মাঝে এসে থানেশ্বর রাজ্যে উপদ্রব করত।

হূণদের ভয়ে পুষ্যভূতি রাজগণ অন্য সীমান্তে দৃষ্টি ফেরাতে পারতেন না, অতর্কিত আক্রমণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হোত। এই সীমান্ত-সঙ্কট কনৌজের মৌখরি রাজগণের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা নেই, আবার পূর্ব দিকে তাঁরা মগধ-গৌড়ের গুপ্তরাজগণের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। দুই প্রবল প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা না থাকায় মৌখরিরাজ ঈশ্বরবর্মা দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করে ধারা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে নেন। তাঁর পুত্র ঈশানবর্মা আরও অগ্রসর হয়ে সুলিকদের কাছ থেকে কলিঙ্গের একাংশ জয় করেন। মৌখরিরাজ্য এক সাম্রাজ্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ঈশ্বরবর্মা ছিলেন গৌড় রাজকুমারী হর্ষদেবীর গর্ভজাত আদিত্যবর্মার পুত্র। পিতার দিক থেকে মৌখরি ও মাতার দিক থেকে গুপ্তবংশের রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হোত; কনৌজ ও গৌড়ের মাঝে তিনি ছিলেন প্রধান যোগসূত্র। তাঁর তিরোধানের পর সেই সূত্র ছিন্ন হয়, পরবর্তী মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা পূর্বাঞ্চলগুলির উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকেন। তার ফলে তন্দ্রাভিভূত পূর্ব সীমান্ত প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে! মগধের অধিকার নিয়ে উভয় শক্তির মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকে, পাটলিপুত্র বারবার হাত বদলায়। ভীতসন্ত্রস্ত নগরবাসীরা নিরাপত্তার জন্য গ্রামাঞ্চলে চলে যাওয়ায় সেই মহানগরী জনশূন্য হয়ে পড়ে।

শেষ পর্য্যন্ত গৌড়দের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য ঈশানবর্মা এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে পাটলিপুত্রের পতন হয় এবং তারপর মৌখরি বাহিনী চম্পা অধিকার করে, গৌড় নগরী পাশে রেখে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেই নিদারুণ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও কুমারগুপ্ত আত্মসমর্পণ করেন নি। প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য তাঁর সৈন্যগণ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে চলে আসে। ঈশানবর্মা তাঁর হড়াহা লিপিতে দাবী

করেছেন যে তিনি গৌড় সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে সমুদ্রাশ্রয়ী হোতে বাধ্য করেছিলেন।[১]

মৌখরিরাজের এই দাবীর মধ্যে অতিশয়োক্তি একটুও নেই। তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রবল চাপে গুপ্ত সৈন্যগণ পিছু হটতে হটতে সমুদ্রতীরে গিয়ে উপনীত হোলেও বিধ্বস্ত হয় নি। তাদের এক অংশ সুসজ্জিত জলনিধিদুর্গে আরোহণ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে এবং অন্য অংশ অভাবনীয় এক ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকে।

গুপ্ত-মৌখরির এই অন্তর্দ্বন্দ্বে মালব এতদিন নির্লিপ্ত ছিল। কিন্তু ঈশানবর্মার বর্তমান দিগ্বিজয় মালবরাজকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তোলে। বিজিত রাজ্যের সম্পদ দিয়ে তিনি যদি অন্যত্র অভিযান সুরু করেন কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তাঁকে এখনই সংযত করা চাই! মগধ ও গৌড়ের উপর তাঁর অধিকার সম্প্রসারিত হবার পূর্বে তাঁকে পঙ্গু করতে হবে। মালবরাজের এই সিদ্ধান্তের ফলে কুমারগুপ্ত সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক দেখতে পেলেন। মালব সৈন্যগণ কনৌজ আক্রমণ করলে তিনি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এক স্তরে কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত শুধু যে মগধের উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন তা নয়, কামরূপের এক অংশও জয় করেন। কিন্তু সেই জয়ের সংহতি সাধন করবার পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েক বৎসর নিস্তব্ধ থাকবার পর কনৌজ-গৌড়ের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব আবার সুরু হয়। তখন অবশ্য নায়ক বদলেছে, কারণ গৌড়ের একাংশে এক নূতন শক্তির অভ্যুদয় হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেই শক্তি ও মালবের যুক্ত আক্রমণে মৌখরি বংশ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে।

1 Fleet J. F. *Inscriptions of Gupta Kings p. 200-28*

দ্বাদশ অধ্যায়

গৌড়ের দ্বিতীয় উপনিবেশ—চম্পা

যে গৌড়বাহিনীকে ঈশানবর্মা সমুদ্রাশ্রয়ী করেছিলেন তারা পূর্ব সাগরের জলে ডুবে আত্মবিসর্জন করে নি ; নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে অকুল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। স্থলযুদ্ধে মৌখরিগণ তাদের চেয়ে শক্তিশালী হোলেও জলযুদ্ধে ছিল একেবারে অসহায়। কনৌজ স্থলবেষ্টিত রাজ্য, কিন্তু গৌড়ের দক্ষিণে দীর্ঘ সমুদ্রতট থাকায় গুপ্তরাজগণকে একটি নৌবহর সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হোত। তার উপর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করত তাম্রলিপ্ত বন্দর। এই বন্দর থেকে বহু বাণিজ্যতরী প্রাচ্য দেশসমূহে যাতায়াত করত। অনুরূপ কয়েকখানি বাণিজ্যতরী ও নিজেদের জলনিধিদুর্গে আরোহণ করে মৌখরি বিতাড়িত গৌড় সৈন্যগণ নিষ্ক্রমণের পথ প্রস্তুত করে।

মালয় ও সুবর্ণদ্বীপে তখন দক্ষিণ ভারতীয় নরপতিগণ রাজত্ব করতেন। উভয় দেশের সঙ্গে জাহাজের নাবিকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পণ্যসম্ভার বোঝাই অর্ণবপোত নিয়ে তাঁরা প্রতিনিয়ত ওই অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। কিন্তু শরণার্থীগণ বোধ হয় সেখানে আশানুরূপ সাহায্য পায় নি। তাই তাদের জাহাজ আবার ভাসতে ভাসতে চীন সমুদ্রের তীরে গিয়ে নোঙর করে। সেখানে এক দক্ষিণ ভারতীয় উপনিবেশ পূর্বেই ছিল। ময় নামক যাযাবর জাতি তখন সেখানকার প্রধান অধিবাসী।

চীনাদের বিবরণ অনুসারে ভারতীয় ব্রাহ্মণ কৌদিন্য এক সময়ে বাণিজ্য জাহাজে চড়ে ইন্দোচীনের এই অংশে এসে উপনীত হন।

রাজকন্যা নাগীনি-সোমা তাঁর অনুরাগিণী হয়ে পড়লে ব্রাহ্মণ তাঁকে বিবাহ করে রাজ্যটি আত্মসাৎ করেন। এইভাবে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ইন্দোচীন ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন রাজ্য ফাউনান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা কৌদিন্য গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের পহ্লব রাজ্য থেকে; উত্তরকালে তাঁর পথ অনুসরণ করে ভারতের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল থেকেও ঔপনিবেশিকরা সেখানে যায়। সংস্কৃত ও স্থানীয় চাম ভাষায় লিখিত যে সকল শিলালিপি ওই সব দেশে পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারত, গুপ্তোত্তর যুগে পূর্ব ভারত এবং তার পরে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বহু নরনারী সেখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ভারতের ইতিহাসে এই সব উপনিবেশের বিবরণ না থাকলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে আছে। যে সব প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে তার কয়েকখানিতে কিরাত জাতির উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের পুরাণগুলিতেও তো পূর্বদেশবাসীদের সাধারণ সংজ্ঞা কিরাত। সেই কারণে কিরাত দেশ বর্তমান ভারতের পূর্ব প্রান্ত বলে মনে না করে ইন্দোচীন পর্য্যন্ত প্রসারিত করা সমীচীন। টমাস বলেন, এই অঞ্চলের প্রাচীন খেঁর জাতির সঙ্গে আসামের খাসিয়াদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির যথেষ্ট মিল আছে।[১] এ কথা যদি সত্য হয় তা হোলে খাসিয়াদের ন্যায় খেঁরদেরও কিরাত জাতির অন্তর্ভুক্ত হোতে দোষ কোথায়?

মৌখরি বাহিনী বিতাড়িত গৌড় সৈন্যগণ যখন সমুদ্রাশ্রয়ী হয় তার কিছু দিন পূর্বে ফাউনানের পতন হয়েছে। নূতন এক কৌদিন্য বংশ তখন সেখানে রাজত্ব করছিল। তারাও আত্মকলহের ফলে অমরাবতী (কোয়াং-নাম), বিজয় (বিং-ডিন্) ও পাণ্ডুরাং (পান-রাং) এই তিন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কৌদিন্য জয়বর্মণের নেতৃত্ব স্বীকার করে রাজ্য তিনটি বিচ্ছেদের মধ্যেও কিছুটা ঐক্য বজায়

রেখেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যে গৃহযুদ্ধ সুরু হয় তার ফলে তাঁর পুত্র রুদ্রবর্মণের অভিষেক বিলম্বিত হয়ে যায়। তার পরও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে মেকং নদীর অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী রাজ্য চেন্-লা।

চেন্-লাই চম্পা। এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠার সময়ে ভারত থেকে বহু নূতন ঔপনিবেশিক ইন্দোচীনে আগমন করে। সেই নবাগতগণ যে মৌখরি বিতাড়িত গৌড় সৈন্য এমন কথা অনুমান করলে বোধ হয় ভুল হবে না। ফাউনানের তটভূমিতে অবতরণ করে তারা শাসককুলের গৃহযুদ্ধে যোগ দেয় এবং পরে পুরস্কারস্বরূপ নিজস্ব একটি রাজ্য লাভ করে। রাইস ডেভিড বলেন, পিতৃভূমির প্রধান নগর চম্পার নামানুসারে ঔপনিবেশিকগণ তাদের রাজধানীর নামকরণ করে চম্পা।[২] ইংলণ্ডের ইয়র্ক যেমন আটলান্টিক পারে নিউ ইয়র্ক হয়েছে গৌড়ের চম্পাও তেমনি সাগরপারে মহাচম্পা নাম ধারণ করে। আবার নিউ ইয়র্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ যেমন নিউ ইয়র্ক ষ্টেট চম্পা শাসিত জনপদটিও তেমনি চম্পা নামে অভিহিত হোত। রাজ্যটি সৃষ্টির কিছুদিন পরে হিউয়েন-সাং তাঁর ঐতিহাসিক পরিক্রমার সময়ে সেখানে গিয়েছিলেন। গৌড়ের চম্পায় তবু তিনি কয়েকটি জীর্ণ সঙ্ঘারাম এবং শ' দুই ধর্মভ্রাতা দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, কিন্তু সাগরপারের চম্পায় শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। যে ঔপনিবেশিকগণ চম্পা রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা ছিল ব্রাহ্মণ্যপন্থী, আবার তাদের পূর্বসূরী ফাউনানের রাজ বংশ ছিল শৈব মতাবলম্বী। সেই কারণে সাগরপারের চম্পায় সে সময়ে বৌদ্ধদের স্থান ছিল না।

সংস্কৃত ছিল ওই রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা এবং শৈবমত রাজধর্ম। বিভিন্ন রাজা নিজ নামানুসারে শ্রীজয়হরিবর্মালিঙ্গেশ্বর, শ্রীইন্দ্রবর্মালিঙ্গেশ্বর প্রভৃতি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাউনানরাজ ভদ্রবর্মা মাই-সন নগরে যে ভদ্রেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করেন কালক্রমে তা



গৌড় ও সাগরপারের চম্পা

সমগ্র চম্পা রাজ্যের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। কাষ্ঠনির্মিত মূল মন্দিরটি ধ্বংস হোলেও তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এখানকার যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ভিয়েৎনামের তূঁরে মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে সেগুলির সৌন্দর্য্য অনবদ্য। শিব, উমা, স্কন্দ ও গণেশের মূর্তি দেখে বোঝা যায় যে রাজবংশ ও অধিবাসীরা ছিল শৈব।[৩]

এত দিন ইন্দোচীনে ছিল দ্রাবিড় শিল্প, স্থাপত্য ও লিপির প্রাধান্য। চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলা ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিপি প্রবর্তিত হয়। এর একটি প্রদেশের নামও সেই সময় হয়ে যায় অঙ্গম। নামটি গৌড়ের অন্যতম প্রদেশ অঙ্গের অপভ্রংশ। গৌড়ে যেমন অঙ্গ ও চম্পা এক সূত্রে গঠিত, এখানেও তাই।

পূর্বে যে কৌদিন্য জয়বর্মণের কথা বলেছি তিনি ছিলেন এক শক্তিমান ও সদাশয় নরপতি। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্য রাজবংশে যে ভাঙন ধরেছিল তা আর বেশী দূর গড়াতে পারে নি। বহু সদগুণের জন্য চীনের স্যুং সম্রাট তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে 'দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নায়ক—ফাউনানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে ফাউনানের বণিকগণ চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সঙ্গে নিয়মিতরূপে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত। এই বণিকদের একখানি অর্ণবপোত ক্যান্টন থেকে ফেরবার সময়ে ফাউনান উপকূলে ডুবে যায়। সেই জাহাজের অন্যতম যাত্রী ছিলেন স্থবির নাগসেন। তিনি রক্ষা পান।

রাজা জয়বর্মণের প্রধানা মহিষী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র গুণবর্মণ ছিলেন পরম শৈব। গুণবর্মণকে সিংহাসনচ্যুত করে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রুদ্রবর্মণ ৫১৪ খৃষ্টাব্দে ফাউনানের অধীশ্বর হয়ে বসেন। তিনিও পিতার ন্যায় চীনের স্যুং সাম্রাজ্যের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে কয়েকবার সেখানে দূত পাঠান। ৫৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁর মৃত্যু হোলে চারিদিকে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভববর্মণ ও চিত্রসেন নামক দুই

ভ্রাতার নেতৃত্বে রাজ্যময় যে আন্দোলন চলতে থাকে তা শেষ পর্য্যন্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সেই সময়ে অতি আকস্মিকভাবে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রোমান সাম্রাজ্য' ফাউনান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে যায়। ঊর্মিমালার উপর ভেসে ওঠে নূতন রাজ্য চেন-লা—চম্পা।[৪]

ভারতে ঠিক সেই সময় মৌখরি রাজ ঈশানবর্মা রণক্লান্ত গৌড় সৈন্যদিগকে সমুদ্রাশ্রয়ী করেন। সেই হতভাগ্যদের শেষ পরিণতি যে কি হোল তা কেউ অনুধাবন করে নি। যে সব অর্ণবপোত সে সময়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় দেশে যেত তারই কয়েকখানিতে আরোহণ করে গৌড় বীরগণ চীন সমুদ্রের তীরে ফাউনানে গিয়ে অবতরণ করে। তাদের বিবরণ অবশ্য কেউ লিখে রাখে নি। আমাদেরই সময়ে বহু ভারতীয় যে দক্ষিণ অ্যামেরিকার গায়েনায় গিয়ে এক উপনিবেশ স্থাপন করেছে তার সংবাদ কয় জন রাখে ?

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই গৌড়ীয় শরণার্থীদের আগমনের পরই চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্বেকার শিব মন্দিরের স্থলে চম্পায় এই সময় থেকে বিষ্ণু মন্দির স্থাপনা সুরু হয়। রাজা বিক্রান্তবর্মা (৬৫৩-৭৩) ছিলেন বৈষ্ণব। এ সময় থেকে ধর্মের ন্যায় সাহিত্য ও কৃষ্টিতেও যে পূর্বভারতীয় প্রভাব সুরু হয় খ্যাতনামা ফরাসী ঐতিহাসিক সিদেসের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছেন, অষ্টম শতাব্দীতে চম্পার বর্ণমালায় বাঙ্গালী প্রভাবের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট।[৫]

1 Thomas P. *Cultural Empire of India, p. 229*
2 Rhys David T. W. *Budhist India, p. 18*
3 Nag K. *Discovery of Asia. p. 377*
4 Hall D. G. E. *History of South-east Asia, p. 28, 31, 37*
5 Coedes G. *Les Etate hindouises d' Indonesie, p. 59*



চম্পার একটি হিন্দু মন্দিরের দ্বারপাল

ফটো : বলিন্‌জেন ফাউণ্ডেশন, নিউ ইয়র্ক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

গৌড়াধিপ শশাঙ্ক

গুপ্ত বাহিনীকে পরাজিত করেও ঈশানবর্মাকে যখন শূন্য হাতে স্বরাজ্যে ফিরতে হোল তখন তাঁর বুঝতে বাকী রইল না যে মালবের সঙ্গে হিসাব মেটাবার জন্য কনৌজকে এখন থেকে তৈরী হোতে হবে। গুপ্তরাজগণ তাঁর আত্মীয়, তাদের সঙ্গে কলহ আর বেশী দূর চালালে পরিণামে লাভবান হবে মালব। হিতৈষীদের মুখ দিয়ে সন্ধির কথাবার্তা সুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ঈশানবর্মার পুত্র শর্ববর্মার সঙ্গে এক গুপ্ত দুহিতার বিবাহ হওয়ায় উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করে। এই নূতন সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দামোদরগুপ্ত শেষ বয়সে পুত্র মহাসেনগুপ্তের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে মৌখরি অধিকারের মধ্যে প্রয়াগে গিয়ে বাস করেন। সেই তীর্থাবাসে তাঁর মৃত্যু হোলে গৌড়ের একাংশ মহাসামন্ত শশাঙ্কের অধিকারে চলে যায়।

প্রথম জীবনে শশাঙ্ক ছিলেন রোহ্‌টাস গড়ের সামন্ত। কিন্তু তাঁর অধিরাজ যে কে ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাঁর অধিকার গৌড় ও কনৌজের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায় উভয় রাজ্যের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ যথেষ্ট ছিল। দামোদরগুপ্ত যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন তিনি বিশেষ অসুবিধা করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ব দিকে প্রসারলাভ করতে লাগলেন। শকক্ষত্রপদের অনুকরণে সার্বভৌম নরপতির ন্যায় আচরণ করেও নিজ অধিরাজের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখাতে থাকায় কনৌজ ও গৌড়ের

অধীশ্বরগণ তাঁকে সহ্য করছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর শক্তি এত বেড়ে যায় যে শুধু মহাসেনগুপ্ত নয় মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মাও রজ্জু আর বেশী আল্গা দিতে রাজী হোলেন না। নিরুপায় শশাঙ্ক তখন মালবে দূত পাঠিয়ে সেখানকার অধীশ্বর দেবগুপ্তের শরণাপন্ন হন।

মালব সে সময়ে থানেশ্বর-কনৌজের যুগ্ম আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্দ্ধন মালবের সিংহাসনচ্যুত অধিপতি শিলাদিত্যের ভগ্নিপতি, আবার মগধ-গৌড়ের গুপ্ত বংশের দৌহিত্র। কনৌজের মৌখরিদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব সম্পর্ক কিছু মধুর ছিল না। সেই কারণে দেবগুপ্ত এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু প্রভাকরবর্দ্ধন যখন মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর তরুণ পুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিলেন দেবগুপ্ত তখন প্রমাদ গণেন। থানেশ্বর-কনৌজ-গৌড়ের মধ্যে এখন আর কোন ব্যবধান নেই। পশ্চিমে শতদ্রু থেকে পূর্বে করতোয়া ও ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের উপর প্রভাকরবর্দ্ধনের অপ্রতিহত প্রভাব। থানেশ্বর তাঁর নিজ রাজ্য, কনৌজ জামাতা রাজ্য এবং গৌড় মাতুল রাজ্য। শেষোক্ত দুই রাজ্যের তরুণ অধীশ্বরদ্বয়ের আবার তিনি অভিভাবক।

এই ভাবে নিজেকে সমগ্র আর্য্যাবর্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে প্রভাকরবর্দ্ধন হূণদের দমন করতে অগ্রসর হোলেন। হূণ শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেও পররাজ্যে অভিযান চালাবার শক্তি তখনও রাখত। তাদের পঙ্গু করবার জন্য অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে উত্তর সীমান্তে পাঠিয়ে প্রভাকরবর্দ্ধন নিজে রাজধানীতে অবস্থান করতে লাগলেন। এর অর্থ কি? দেবগুপ্ত সংশয়াকুল হয়ে উঠলেন। উত্তর সীমান্ত শত্রুশূন্য হোলে প্রভাকরবর্দ্ধনের বিশাল সৈন্যবাহিনী যে মালবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এমন কথা কে বলতে পারে? তিনি যদি বা নিরস্ত হন তাঁর মহিষী যশোমতী পিতা যশোধর্মণের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা বিস্মৃত হতে পারেন না।

মালবের দক্ষিণে চালুক্য সাম্রাজ্য, আবার উত্তরে এই সম্ভাব্য বিপদ। দেবগুপ্তের শঙ্কিত হবার কারণ ছিল। কোন এক পক্ষে যোগ দিলে আত্মরক্ষা করা শক্ত হোত না। কিন্তু তাতে প্রবলের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া হয়। তা হোতে পারে না। মালবের অধীশ্বর তিনি; তাঁর সমান মর্য্যাদা কার? দেবগুপ্ত দাবার ছক নিয়ে বসলেন—আহারনিদ্রা ত্যাগ করে তাতে ঘুঁটি চালাতে লাগলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের গজের চাল তাঁকে ঘোড়া দিয়ে মাৎ করতে হবে!

সকল দিকে বিবেচনা করে দেবগুপ্ত দেখলেন শশাঙ্ককে তাঁর চাই। তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে সেই মহাসামন্ত ইতিপূর্বে মহাসেনগুপ্তকে কোণঠাসা করে সমগ্র রাঢ় অধিকার করে নিয়েছেন। রোহ্‌টাস্ থেকে ভাগীরথী পর্য্যন্ত ভূভাগের তিনি অধীশ্বর। পরে কোন সময়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কোঙ্গদ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলেও আধিপত্য প্রসারিত করেছেন। কর্ণসুবর্ণে* স্থাপিত হয়েছে তাঁর রাজধানী। তাঁকে শক্তি যোগালে দেবগুপ্ত লাভবান হবেন।

শশাঙ্কের অভ্যুত্থানের ফলে উত্তর ভারত দুইটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। থানেশ্বর-কনৌজ সংহতি সিন্ধু নদী থেকে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত ভূভাগ নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তার পূর্ব দিকে মহাসেনগুপ্ত ও পরে তাঁর পুত্র মাধবগুপ্ত এক সঙ্কুচিত জনপদের উপর রাজত্ব করছিলেন। শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হোলেও তাঁদের অধিকার একেবারে লোপ পায় নি। এর দক্ষিণে বিদিশা থেকে ভাগীরথী পর্য্যন্ত ভূভাগে দেবগুপ্ত-শশাঙ্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোতে লাগলেন। উজ্জয়িনী ও কর্ণসুবর্ণে সমরায়োজন চলতে লাগল।

প্রথম শর নিক্ষেপ করলেন দেবগুপ্ত। হূণদের সঙ্গে থানেশ্বর

*কর্ণসুবর্ণ—হিউয়েন-সাঙের বিবরণ অনুসারে অবস্থান তাম্রলিপ্তের ৭০০ লি—১১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কানিংহামের মতে সেই স্থান সেরাইকেলায় সুবর্ণরেখা তীরে। মতান্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটী কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করছে।

বাহিনীর সংগ্রাম তিনি লক্ষ্য করছিলেন। সেই সময়ে ৬০৫ খৃষ্টাব্দে এক দিন দূতমুখে খবর এল যে প্রভাকরবর্দ্ধন ইহলোক ত্যাগ করেছেন এবং রাণী যশোমতী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছেন। এতখানি সুযোগ দেবগুপ্ত আশা করেন নি! থানেশ্বর বাহিনী রাজ্যের বাহিরে যুদ্ধরত, তাদের রাজধানী অরক্ষিত। এ সময়ে মালবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলে বাধা দেবার কেউ থাকবে না। দেবগুপ্ত সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন।

পথে মৌখরিরাজ্য কনৌজ। সেখানে তরুণ রাজা গ্রহবর্মা স্বপ্নলোকে বাস করছেন। রাণী রাজ্যশ্রী অনিন্দ্যসুন্দরী—প্রতিভাশালিনী। পিতা তাঁকে সর্ব বিত্থায় সুশিক্ষিতা করে তুলেছেন। নৃত্যগীতে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। এরূপ অসামান্যা বধূ নিয়ে গ্রহবর্মা এখন যে রাজ্যে বাস করছেন রণদামামার আওয়াজ সেখানে পৌঁছায় না। শশাঙ্ক যে ভাবে রাঢ় জয় করেছিলেন তার চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে দেবগুপ্ত কনৌজ অধিকার করলেন। মিত্রকে বোধ হয় এই পরিকল্পনার কথা পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন, কিন্তু গৌড়বাহিনী কনৌজে পৌঁছাবার পূর্বে মৌখরিদের পরাজয় হয়। গ্রহবর্মা নিহত এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন।

হূণদের শক্তি সম্বন্ধে দেবগুপ্ত ভুল ধারণা করেছিলেন। এ হূণ সে হূণ নয়। পুষ্যভূতি বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ হোলেও তাঁর ব্যূহ তারা কিছুতেই ভাঙতে পারল না, শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে রণে ভঙ্গ দিল। ঠিক সেই সময়ে থানেশ্বর থেকে দূত গিয়ে সংবাদ দিল যে বৈত্য সুসেনের সকল চিকিৎসা উপেক্ষা করে প্রভাকরবর্দ্ধন লোকান্তর গমন করেছেন। সতী যশোমতীও সহমৃতা। পিতামাতার শোকে মুহ্যমান রাজ্যবর্দ্ধন তখন রাজধানীতে ফিরে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হোলেন। কিন্তু অবসর কোথায়? কংসের কারাগারে দেবকী বন্দিনী! তার উপর মালব সৈন্যগণ থানেশ্বরের দিকে এগিয়ে

আসছে। সংসার ত্যাগের সময় এ নয়! কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনের হাতে রাজধানীর ভার অর্পণ করে রাজ্যবর্দ্ধন দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে পূর্ব সীমান্তের দিকে এগিয়ে চললেন। তখনও তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; হূণ যুদ্ধের ক্ষত ভাল করে শুকায় নি। তা সত্ত্বেও দেহ থেকে উরস্ত্র উন্মোচন করা সম্ভব হোল না!

দেবগুপ্তের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী হোলেও রাজ্যবর্দ্ধনের সহকারী ভণ্ডী ও অশ্বারোহী বাহিনীর অধ্যক্ষ কুন্তলের মত প্রতিভাবান সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর ছিল না। তাই প্রাণপাত করে লড়া সত্ত্বেও থানেশ্বর বাহিনীকে পরাভূত করা সম্ভব হোল না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজে পরাজিত ও নিহত হোলে মালব রাজ্যবর্দ্ধনের অধিকারে চলে যায়; পুষ্যভূতি রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত নর্মদা নদী স্পর্শ করে। এবার ভগ্নীর উদ্ধারের পালা! বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকরমিত্রের কাছে সন্ধান পেয়ে রাজ্যবর্দ্ধন বিন্ধ্যারণ্যের মধ্যে গিয়ে রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মিলিত হন। হতভাগিনী তখন জহরের আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন!

যে বিপদের আশঙ্কা দেবগুপ্ত করতেন এখন তা শশাঙ্কের মাথার উপর এসে পড়েছে। তাঁর পূর্ব সীমান্তও নিরাপদ নয়। কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্মা রাজ্যবর্দ্ধনের সুহৃদ; এখন নূতন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানিয়েছেন। এরূপ শত্রুপরিবৃত হয়ে ধর্মযুদ্ধ সম্ভব নয়। রাজ্যবর্দ্ধনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করে গৌড়াধীপ তাঁর কাছে দূত পাঠান এবং তরুণ থানেশ্বররাজ সে প্রস্তাবে সম্মত হোলে তাঁকে শিবিরে আহ্বান করে হত্যা করেন। হর্ষচরিতের এই কাহিনীতে ম্রিয়মান হয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক এর প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে কাহিনী জীবন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে কোন প্রতিবাদই তাকে মিথ্যায় পরিণত করতে পারবে না!

জ্যেষ্ঠের নিধন সংবাদ থানেশ্বরে পৌছালে হর্ষবর্দ্ধন সভাসদগণের সমক্ষে গৌড়রাজকে সমুচিত শাস্তি দানের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন।

সমরমন্ত্রী অবন্তীর উপর নির্দেশ দেওয়া হোল সামন্তগণকে সসৈন্যে কনৌজে আহ্বান করবার জন্য। প্রধান সেনাপতি সিংহানন্দ সকল রাজকীয় বাহিনীকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হোতে বললেন। গজ-বাহিনীর অধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত তাঁর গজসৈন্য নিয়ে অভিযাত্রী বাহিনীর পুরোভাগে থাকবার আদেশ পেলেন। এই সমর-প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূর্ব দিক থেকে ভাস্করবর্মা ৩ হাজার রণপোত ও ২০ হাজার গজসৈন্য নিয়ে গৌড়ের দিকে আসতে লাগলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যা অজ্ঞাত। রাজমহলের নিকটবর্তী কয়ঙ্গল নামক স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হোল।

রাজ্যশ্রী উদ্ধারের পর বাণভট্ট তাঁর কাহিনীর উপসংহার করেছেন বলে পরবর্তী ঘটনাস্রোত অজ্ঞাত থেকে গেছে। এমন কি হর্ষচরিতে গৌড়াধিপের কথা বার বার লেখা হোলেও তাঁর নাম রয়েছে অনুল্লিখিত। তবে তিনি যে শশাঙ্ক তা প্রায় একই সময়ে লেখা হিউয়েন-সাংএর ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায়। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষে গৌড় জয় করা সম্ভব হয় নি। শশাঙ্ক গৌড়ের প্রথম সার্বভৌম অধীশ্বর।

শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। হিউয়েন-সাং বলেন তাঁর ন্যায় পাপিষ্ঠের হাত থেকে সদ্ধর্ম বাঁচাবার জন্য স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি গয়ার বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করেন এবং পার্শ্ববর্তী মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করে মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপনের নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অবশ্য এরূপ গর্হিত কাজ করেন নি, পবিত্র মূর্তিটির সম্মুখে দেওয়াল তুলে তার উপর মহেশ্বরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছিলেন। তার ফলে কর্মচারীটি নিষ্কৃতি পান, কিন্তু শশাঙ্ক পান নি। তাঁর সর্বাঙ্গে দুরারোগ্য ক্ষত দেখা দেয় এবং তাতেই মৃত্যু হয়!

গৌড়ে হিউয়েন-সাং

সম্রাট মিং-তির আমন্ত্রণে স্থবির কাশ্যপ মাতঙ্গ ৬১ খৃষ্টাব্দে চীনে যাবার পর থেকে অসংখ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তথাগতের বাণী নিয়ে ওই দেশে গমন করেন। তাঁদের মধ্যে কুমারজীবের কথা পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি। তাঁর শিষ্য ফা-হিয়েন তীর্থ পর্য্যটনে এসে গুপ্তযুগীয় ভারত সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ কাহিনী লিখে গেছেন। এমনি যে সব চীনা তীর্থযাত্রী তাঁদের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে হিউয়েন-সাংএর স্থান সর্বাগ্রগণ্য। বস্তুতঃ মার্কো পোলো, ইবন্ বতুতা, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি যে সব পরিব্রাজকের বিবরণ ইতিহাস রচনার উপকরণ জুগিয়েছে নানা কারণে হিউয়েন-সাংএর স্থান তাঁদের সবার উপরে। তিনি শুধু পরিব্রাজক নন—মহাপরিব্রাজক।

শশাঙ্কের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে এই মহাপরিব্রাজক গৌড়ে আসেন। বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত হিউয়েন-সাং; এখানে এসে তিনি যে কতখানি পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর আগমনে গৌড়ভূমি পবিত্র হয়। এসেছিলেন তীর্থ ভ্রমণে, রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই কারণে তাঁর সি-ইউ-কি* থেকে সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছু জানা না গেলেও সমাজ ও ধর্ম জীবনের চিত্র অতি স্পষ্ট।

মগধে দীর্ঘ দিন অবস্থানের পর হিরণ্য পর্বতের† পথ ধরে হিউয়েন-সাং এই রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর বিবরণে দেখা যায়, চেন্-পো বা চম্পা হিরণ্য পর্বতের ৩০০ লি‡ পূর্বে অবস্থিত; পরিধি ৪০০০ লি। জমি সমতল ও উর্বর; নিয়মিত চাষাবাদ হয়। অধিবাসীরা সরল ও সাধু। কয়েক দশক সংঘারাম আছে; অধিকাংশই ধ্বংসোন্মুখ। পুরোহিতের

* সি-ইউ-কি—পাশ্চাত্য জগত সম্বন্ধে বৌদ্ধ কাহিনী

† হিরণ্য পর্বত—মুঙ্গের

‡ ৬ লি=১ মাইল

সংখ্যা দুই শত। সবাই হীনযানপন্থী। প্রায় কুড়িটি দেবমন্দিরে সকল সম্প্রদায়ের নরনারী পূজা দেয়।

রাজধানীর পরিধি ৪০ লি। উত্তরে গঙ্গা প্রবাহিত। ইষ্টক নির্মিত যে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা নগরটি বেষ্টিত তার ভিৎ উচ্চ বাঁধের উপর এরূপভাবে নির্মিত যে শত্রুর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করা যায়।

পুরাকালে কল্পারম্ভের সময়ে সৃষ্টি যখন প্রথম সুরু হয় সেই সময়ে মানুষ গুহা ও মরুভূমিতে বাস করত। বাসগৃহের নির্মাণ প্রণালী কারও জানা ছিল না। কিছুকাল পরে শাপভ্রষ্টা এক দেবকন্যা তাদের মধ্যে দেখা দিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের সময় এক আধিভৌতিক শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েন। তার ফলে তাঁর যে চার পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা সমগ্র জম্বুদ্বীপ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। দ্বীপের সর্ব প্রাচীন নগরী এই চম্পা একটি রাজ্যের রাজধানী।

নগরীর ১৪০।১৫০ লি পূর্ব দিকে গঙ্গার দক্ষিণে এক নির্জন পাহাড়ের উপর একটি দেবমন্দির আছে। সেখানে দেবতা ও যক্ষগণ বহু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন। পাথর কেটে অনেক বাড়ী নির্মাণ ও অবিশ্রান্ত স্রোতধারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড়টিতে জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা বাস করে। যারা সেখানে যায় ফিরতে চায় না। দক্ষিণদিকের অরণ্যে বহু হস্তী ও হিংস্র জন্তু বাস করে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ৪০০০ লি। বসতি ঘন। মাঝে মাঝে কুঞ্জবন ঘেরা নৌ-দপ্তর দেখা যায়। ভূমি সমতল ও আঁশযুক্ত। শস্য প্রচুর জন্মায়। তরমুজের ন্যায় বৃহৎ ও উপাদেয় পনস-ফল যথেষ্ট। পাকবার পর ফলগুলির রং হয় হরিদ্রাভ লাল। ছাড়ালে প্রতিটি ফল থেকে বহু দশক মুরগী-ডিম আকৃতির সুগন্ধযুক্ত ফল পাওয়া যায়। পনস কখনও ডালে আবার কখনও বা মূলে জন্মায়; ঠিক যেন আমাদের ফুং-লিং!

এখানকার কুড়িটি সংঘারামে ৩০০০ হীনযান ও মহাযানপন্থী ভ্রাতা বাস করেন। প্রায় এক শত দেবমন্দিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

বহু লোক পুজাপাঠ করে। নিগ্র্ন্থী জৈনেরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাবহুল।*

পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে নানা স্থান ঘুরে মহাপরিব্রাজক এলেন তাম্রলিপ্তে। তান্-মো-লি-তির পরিধি ১৪০০।১৫০০ লি। সমুদ্র এর সীমা। ভূমি নীচু ও উর্বরা। নিয়মিত চাষ হয় এবং ফুল ও ফল প্রচুর জন্মায়। আবহাওয়া গরম। অধিবাসীদের প্রকৃতি ক্ষিপ্র ; তারা কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। বিশ্বাসী (বৌদ্ধ) ও অবিশ্বাসী দুইই আছে। ২০টি সংঘারামে প্রায় ১০০০ পুরোহিত বাস করেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ।

এই দেশের বেলাভূমিতে জল ও মাটি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সমুদ্রজল থেকে অতি মূল্যবান রত্ন আরোহণ করে অধিবাসীরা খুবই ঐশ্বর্য্যশালী হয়। রাজধানীর পরিধি ১০ লি। সন্নিহিত স্থানে অশোকরাজ নির্মিত একটি স্তূপ আছে। চার অতীত-বুদ্ধ যে এখানে উপবেশন ও ভ্রমণ করতেন তার চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

এবার কর্ণসুবর্ণ। তাম্রলিপ্ত থেকে ৭০০ লি উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে মহান পরিব্রাজক কিয়ে-লো-ন-সু-ফ-ল-ন পৌঁছালেন। এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ১৫০০ লি ; রাজধানীর পরিধি ২০ লি। লোকবসতি ঘন। গৃহস্থেরা খুবই ধনী ও আরামপ্রিয়। জমি নীচু ও আঁশযুক্ত। নানা জাতীয় ফুল প্রচুর জন্মায়। আবহাওয়া মনোরম। অধিবাসীরা সৎ; অমায়িক ও অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী।

এখানকার ২৭টি সংঘারামে প্রায় ২০০০ ভিক্ষু বাস করেন। তাঁরা হীনযান ও সম্মতিয়া মতাবলম্বী। দেবমন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ। আরও তিনটি সংঘারাম আছে, কিন্তু তারা দেবদত্তের অনুশাসন মেনে উ-লোক (ক্ষীর) ব্যবহার করে না।

রাজধানীর পার্শ্বে রক্তবীথি সংঘারাম। পূর্বে এই দেশের লোকেরা বুদ্ধবিশ্বাসী ছিল না। দাক্ষিণাত্যের এক অবিশ্বাসী সাধু তাদের ভুল

* শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহুর প্রভাব তখনও বিলুপ্ত হয় নি। অধ্যায় ৩, পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য।

পথে চালাবার চেষ্টা করে। তার আচরণে উত্যক্ত হয়ে দেশের রাজা এমন লোকের অন্বেষণ করতে থাকেন যে তাকে তর্কে পরাভূত করতে পারবে। একজন শ্রমণ সেই সাধুকে পরাজিত করায় রাজার নির্দেশে এই সংঘারাম নির্মাণ করা হয়। এর অদূরে অশোকরাজ এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন! তথাগত যখন ইহলোকে ছিলেন তখন তিনি এখানে এক সপ্তাহ ধর্মপ্রচার করেন।

এই সংঘারামের পাশে এক বিহার আছে। সেই স্থানটি চার অতীত বুদ্ধের আগমনে পবিত্র হয়েছিল। পবিত্রতার বহু নিদর্শন এখনও দেখা যায়। বুদ্ধ যে সব স্থানে তাঁর মহাবাণী প্রচার করেছিলেন অশোকরাজ সেখানে আরও কয়েকটি স্তূপ নির্মাণ করেছেন।

এখান থেকে প্রায় ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে পরিব্রাজক গেলেন উ-চা (উড়িষ্যা)।

বাণভট্ট, হর্ষচরিতম্, সম্পাদনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস
Beal S. *Travels of Hiouen-Thsang*, p- 379-409

গৌড় ও তার চার প্রদেশ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তিব্বতী ও চীনা আক্রমণ

তিব্বতী অধিকারে গৌড়

হর্ষবর্দ্ধন-ভাস্করবর্মার সম্মিলিত বাহিনী এসে যখন গৌড় অধিকার করে সেই সময়টি ছিল বৌদ্ধ ইতিহাসের সুবর্ণময় যুগ। হর্ষের সমসাময়িক চীন সম্রাট তাই-সুং ও তিব্বতরাজ স্রোন্-ৎসন্-গম্পো নিজ নিজ দেশের শ্রেষ্ঠতম শাসক। কম্বোজ ও যবদ্বীপেও সে সময়ে শক্তিমান বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের সবার রাজ্য এত বিশাল ছিল যে প্রত্যেকটিকে সাম্রাজ্য বলা সঙ্গত। স্রোন্-ৎসন্-গম্পো যখন ৬২০ খৃষ্টাব্দে তিব্বত সিংহাসনে অরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স তের বৎসর—হর্ষবর্দ্ধনের ষোল। হর্ষের অভিষেককালে আর্য্যাবর্তে যে দুর্যোগ চলছিল তাঁর সময়ে তিব্বতেও তাই। বালক স্যান্‌পোকে দূরীভূত করবার জন্য শত্রুগণ যে ভাবে গোপনে অস্ত্র শানাচ্ছিল তাতে কেউ আশা করে নি যে তিনি বেশী দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু হর্ষের যেমন ভণ্ডী, তাঁরও তেমনি গর্-দন্-সান্। সেই প্রতিভাবান্ সেনানায়কের সাহায্যে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করে স্রোন্-ৎসন্-গম্পো বিচ্ছিন্ন তিব্বতকে এক ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দেন। তাঁর সময়ে ওই দেশের সীমানা উত্তরে কোকোনর হ্রদ, দক্ষিণে 'ব্রাহ্মণদের দেশ', পশ্চিমে পারস্য ও কাশ্মীর সীমান্ত এবং পূর্বে চীনের সেচুয়ান ও ইউয়ান প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

ভারতে হর্ষবর্দ্ধন যখন সন্নিহিত রাজ্যগুলি জয় করছিলেন স্রোন্-ৎসন্-গম্পো সেই সময়ে দুই লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে চীনের সেচুয়ান

প্রদেশ অধিকার করেন। তার পূর্বে পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি পিকিংএর উত্তরে রে-রো-ৎসে-না নামক স্থানে ১০৮ বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে মঞ্জুশ্রীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইবার স্রোন-ৎসেনের বাহুবলের পরিচয় পেয়ে সম্রাট তাই-সুং নিজ দুহিতা উয়েন্-চেঙের সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তাঁর প্রথমা মহিষী ভৃকুটিদেবী ছিলেন নেপালরাজ অংশুবর্মার* কন্যা।

ভারতে যেমন অশোক দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা চীনে তেমনি এই তাই-সুং দুহিতা উয়েন-চেং। উভয় রাজকন্যা সমান বিদূষী, উভয়ে সমান নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ। সম্রাট তাই-সুং তিব্বতরাজের সঙ্গে উয়েন-চেংএর বিবাহ প্রস্তাব সমর্থন করায় এক শুভ দিনে সেই রাজকুমারী তিব্বতাভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে কয়েক শত পরিচারিকা—সবাই ভিক্ষুণী। তিনি নিজেও ভিক্ষুণী। সুবর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি এবং রাশিকৃত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তিনি চলেছেন তিব্বতের পথে। চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও সঙ্গে আছে। প্রভাতে সবাই শয্যাত্যাগ করে পুষ্পচন্দন দিয়ে শাক্যমুনির মূর্তি পূজা করেন; তার পর যাত্রা সুরু হয়। সূত্র পাঠ করতে করতে ভিক্ষুণী রাজকন্যা পথ চলেন, আর সহচরীরা তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

গিরি, নদী, উপত্যকা পার হয়ে তিব্বতের নূতন রাণী আসছেন স্বামীর ঘরে। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য পথিপার্শ্বে অসংখ্য তোরণ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। কোন দেহরক্ষী সঙ্গে নেন নি। হোন তিনি চীন সম্রাটের কন্যা, তথাগতের পাদপদ্মে যে নারী জীবন-মন সঁপে দিয়েছে তার দেহরক্ষীর প্রয়োজন কিসে?

*মতান্তরে জ্যোতির্বর্মা

অমিতাভ সকল বিপদ আপদ থেকে তাঁদের রক্ষা করবেন। তিনিই পথের কাণ্ডারী!

এমনি করে দীর্ঘ পথ পার হয়ে তিব্বতের নূতন রাণী এলেন রাজধানী ইয়ার্-লুঙে। তাঁর সম্মানে সমস্ত নগরী পত্রপুষ্পে সাজান হয়েছে। তাঁকে বরণ করবার জন্য সামন্ত ও সভাসদরা মণিমুক্তার ডালি নিয়ে নগর দ্বারে উপস্থিত। কিন্তু কি করবেন তিনি এই সব পার্থিব বৈভব নিয়ে? এর মধ্যে বুদ্ধ নেই, তাই তাঁর প্রয়োজনও নেই। রাণী উয়েন-চেং বললেন—

নাহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং
ন পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখ তপ্তানাং
প্রাণিনাম্ অতিনাশনম্।

আশাভঙ্গ সামন্তগণ বাড়ী ফিরে গেলেন। রাণী কিন্তু রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন না। যেখানে বুদ্ধ নেই সেখানে তিনি থাকতে পারেন না। রাজাদেশে তখন মার্-পো-রি'র লাল পাহাড়ের উপর নূতন প্রাসাদ তৈরী হোতে লাগল। সেখানে থাকবেন বুদ্ধ, তিনি তিব্বতকে শাসন করবেন। রাজারাণী হবেন তাঁর সেবক। সেই প্রাসাদই পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজপ্রাসাদ—পোতালা। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রাসাদের নির্মাণ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হোলে স্রোন্-ৎসন্-গম্পো ও তাঁর দুই মহিষী বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। প্রাসাদটি হয় তাঁদের কর্ম ও ধর্মক্ষেত্র। এখান থেকে প্রচারিত হয় স্রোন্-ৎসন্-গম্পোর ষোড়শ উপদেশ সম্বলিত অনুশাসন; আবার এখানে রচিত হয় ভবিষ্যৎ তিব্বতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংবিধান।

চীনেও সেই সময়ে নূতন জীবনের বন্যা বইছিল। সম্রাট তাই-সুং ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। এই মতকে ট্যাং সাম্রাজ্যের রাজধর্ম বলে ঘোষণা করে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলিকে নানাভাবে সাহায্য দেন। তাঁর

কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বজ্রমতি, অমোঘবজ্র, সুয়ান্-ল্যাং, তুং-সুন্ প্রভৃতি অর্হৎগণ সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বন্যা বহাচ্ছিলেন। পোতালা থেকে দলে দলে বিদ্যার্থী ছুটল চীনে; তাঁদের কাছে নূতন আলোক নিয়ে দেশে ফিরল।

স্রোন্-ৎসন্-গম্পো নিজে সংস্কৃত, চীনা ও নেওয়ারী ভাষায় সুপণ্ডিত হোলেও তিব্বতের নিজস্ব কোন লিখিত ভাষা ছিল না। এই অভাব দূর করবার জন্য তিনি অনুর পুত্র থ্ন্-মি-সম্ভোটকে ১৬ জন সঙ্গীসহ ভারতে পাঠান। তাঁরা নালন্দা, কনৌজ, কাঞ্চী, তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থান ঘুরে সংস্কৃত বর্ণমালার ভিত্তিতে তিব্বতের জন্য উ-চন্ বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। এই বর্ণমালায় ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি ত্রিশটি ব্যঞ্জন ও চারটি স্বরবর্ণ আছে। ব্যাকরণ না হোলে ভাষাকে বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। তিব্বতী ভাষার প্রথম ব্যাকরণও সম্ভোটের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফলে উদ্ভাবিত হয়। সেই নূতন বর্ণমালা ও ব্যাকরণের ভিত্তিতে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ও চীনা ভাষা থেকে তিব্বতীতে অনূদিত হয়। ভারতের কুশর ও শঙ্কর, নেপালের শিলমঞ্জু এবং চীনের হোসাং-মহাৎসে এই বিরাট অনুবাদকার্য্যে স্যান্‌পোকে সাহায্য করেন। তিনি নিজেও একাধিক গ্রন্থের অনুবাদ এবং কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রজাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক সাম্যেরও প্রয়োজন। তথাগতের চক্ষে তাঁর সমস্ত সন্তান সমান; তাদের মধ্যে ভেদাভেদ বাঞ্ছনীয় নয়। যে দেশে রাজা শ্রমণ, রাণীরা ভিক্ষুণী সে দেশে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজনই বা কোথায়? রাজাদেশে সকল প্রজার সর্ব প্রকার ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য ধনসম্পদের তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দেওয়া হোল। এইভাবে স্রোন্-ৎসন্-গম্পো ও তাঁর দুই রাণীর প্রেরণায় তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বন্যা বইতে লাগল। জনসাধারণের চক্ষে রাজা অবলোকিতেশ্বরের অবতার চেন-রে-সিন্ এবং

দুই রাণী তারাদেবী বলে পূজা পেতে লাগলেন।

তিব্বতীগণ তাদের মহান শাসক ও তাঁর দুই মহিষীর কাছ থেকে এই যে নূতন জীবনের সন্ধান পেল তা প্রকাশের জন্য যখন বহির্মুখের অন্বেষণ করছিল সেই সময়ে ভারতে হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস্করবর্মা এক বৎসরের ব্যবধানে লোকান্তর গমন করেন। আর্য্যাবর্ত অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। দেবভূমির উপর আক্রমণ থেকে যিনি তাদের নিরস্ত করতে পারতেন সেই স্রোন্-ৎসন্-গম্পো তার পূর্বে সংসার ছেড়ে নির্জনবাসে দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজকর্ম ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল বলে তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র গুন্রি-গুন্-সেনকে সিংহাসনে বসিয়ে দুই রাণীর সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেনাপতি গর্-দন্-সান্ও অবসর নেন। সৈন্যবাহিনীকে সংযত করবার মত কোন নায়ক না থাকায় তারা পূর্ব ভারতের উপর নেমে এসে প্রায় বিনা প্রতিরোধে বঙ্গোপ-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত পৌঁছে নাগচন্দনের স্বয়ম্ভূ মূর্তি নিয়ে দেশে ফেরে। গৌড়ে তিব্বতী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটবার পর বালক রাজা গুন্রি-গুন্-সেন্ হঠাৎ পরলোক গমন করায় স্রোন্-ৎসন্-গম্পো বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসাশ্রম ছেড়ে পুনরায় রাজদণ্ড হাতে নেন। সেই সঙ্গে সমস্ত তিব্বত এক বিশাল ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সেই মহান নৃপতির আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল; ৬৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি অমিতাভের মধ্যে বিলীন হয়ে যান। দুই মহিষীও অল্প দিনের ব্যবধানে তুষিতলোকে গমন করেন।

চীনাগণ এবার সুযোগ পায়। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তারা লাসার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছায়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেনাপতি গর্-দন্-সানের কাছে পরাস্ত হয়ে দেশে ফেরে। পলায়নপর সৈন্যদের অনুসরণ করে তিব্বতীরা চীন আক্রমণ করলে তাদের বহু সৈন্য ক্ষয় হয়; বৃদ্ধ সেনাপতি গর্ হন নিহত। তখন চীনারা আবার ফিরে এসে অক্লেশে লাসা অধিকার করে নেয়। সেই সংবাদ ভারতে পৌঁছালে

দখলকারী তিব্বতী বাহিনী মাতৃভূমি রক্ষার জন্য স্বদেশে ফিরে যায়। গৌড়ের উপর তাদের স্বল্পস্থায়ী অধিকারের অবসান ঘটে।

চীনাদের ভারত আক্রমণ

একই বিবর্তন অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা দেয়। হর্ষবর্দ্ধনের আবির্ভাবের পূর্বে আর্য্যাবর্তের উপর যে ত্রৈরাজ্যের আধিপত্য চলছিল তিনি তার অবসান ঘটালে উত্তর ভারত এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শান্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু প্রতিষেধক দিয়ে রোগ দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, নিরাময় করা হয় নি। হর্ষের মৃত্যুর পর আগেকার সেই দ্বন্দ্ব নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা তাঁর বৌদ্ধ প্রীতি সুনজরে দেখে নি; একবার তাঁর নিজস্ব বিহারে অগ্নি সংযোগ এবং প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যার চেষ্টাও করেছিল। অথচ উচ্চতম বহু রাজকার্য্যে তিনি ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করেছিলেন! সেই রাজপুরুষদের অনেকে অতি সঙ্গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে থাকে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তারা সুযোগ পায়, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কানভূতি অরুণাশ্বকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করে। অর্জুন নাম নিয়ে তিনি কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে সেনাপতি পুষ্যমিত্র ঠিক এমনিভাবে মৌর্য্য বংশের অবসান ঘটিয়ে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেছিলেন। পুষ্যমিত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ, অর্জুনও তাই। পুষ্যমিত্রের শাস্তি বিধানের জন্য বাহ্লিকের গ্রীক-বৌদ্ধ নরপতি মিনিন্দর যেমন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, অর্জুনের শাস্তি বিধানের জন্য চীনা-বৌদ্ধগণ তেমনি হিমালয় পার হয়ে উত্তর ভারতে এসে হাজির হয়।

হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন চীন সম্রাট তাই-সুংএর বন্ধু। এক ব্রাহ্মণকে দূত নিয়োগ করে তিনি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীন রাজধানী সিয়ান-ফুতে পাঠিয়ে-

ছিলেন। আবার তাই-সুংএর দূত উয়াং হিউয়েন-সি হর্ষের রাজধানী কনৌজে বাস করতেন। কানভূতি অরুণাশ্বের ধৃষ্টতা সেই রাজদূতকে বিস্ময়বিমূঢ় করে। এক দিন যখন তাঁর কাছে সংবাদ এল যে চীনা সৈন্যগণ তিব্বত অধিকার করেছে, কালবিলম্ব না করে তিনি চলে গেলেন লাসায়। তাঁর মুখ থেকে সেখানকার চীনা সৈন্যাধ্যক্ষরা শুনলেন, এক বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন আত্মসাৎ করে চীনা দূতাবাসের কর্মচারীদের হত্যা করেছে এবং নিরীহ বৌদ্ধ প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তাঁদের চক্ষু থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। সেই ঘৃণ্য ব্রাহ্মণের শাস্তি বিধানের জন্য তাঁরা নেপালের ভিতর দিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিলেন। কিছু তিব্বতী ও নেপালী বৌদ্ধও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল।

এই চীনা অভিযানের সংবাদ কনৌজে অর্জুনের কাছে যথা সময়ে পৌঁছালে অভিযাত্রী বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য তিনি সসৈন্যে উত্তর সীমান্তের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। হিমালয়ের পাদদেশে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে চীনা সৈনিকরা মিথিলার ৫৮০ খানি গ্রাম অধিকার করে, অর্জুন হন তাদের হাতে বন্দী। তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয় চীন রাজধানীতে। সম্রাট তাই-সুং-এর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে তাঁর কুশপুত্তলিকা স্থান পায়!

এই সাফল্য সত্ত্বেও চীনাদের পক্ষে ভারতের অভ্যন্তরভাগে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ ঠিক সেই সময়ে সম্রাট তাই-সুং পরলোক গমন করেন এবং তাঁর বিধবা মহিষী দুর্বল পুত্র কাউ-সুংএর নামে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে থাকেন। সেই সুযোগে তিব্বতীরা দখলকার চীনা বাহিনীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় মিথিলার চীনা সৈন্যগণ তাদের মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের শেষ পরিণতি জানা যায় না, তবে উয়াং হিউয়েন-সি দেশে ফিরে গিয়ে কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের

মন্ত্রীত্ব করবার পর ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তীর্থ পর্য্যটনের জন্য পুনরায় ভারতে আসেন। তখন কেউ তাঁকে উত্যক্ত করে নি। অর্জুনের অপসারণে সবাই খুসী হয়েছিল!

Li Tieh-Tsung *Historical Status of Tibet, p. 6, 8-10*
Shen Tsung-Lien & Liu Shen-Chi *Tibet and Tibetans, p. 22.25*
Aoki Bunkyo *Early Tibetan Chronicles, p. 16-18*
Bell C. *Tibet, Past and Present, p. 23*
Smith A. Vincent, *Early History of India, p. 366*

পঞ্চদশ অধ্যায়

গৌড়-বাহো

অর্জুন নিষ্ক্রান্ত হোলেও কনৌজের সিংহাসন শূন্য থাকে নি। তাঁর স্থানগ্রহণকারীর পরিচয় কোথাও লেখা নেই, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সেই নরপতির এক বংশধর যশোবর্মা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। কে এই যশোবর্মা? অনেকে মনে করেন তিনি প্রাচীন মৌখরি বংশের সন্তান। এই অনুমান সত্য হোক আর মিথ্যা হোক যশোবর্মার রাজত্বকালে গৌড়-কনৌজের পুরাতন সংঘর্ষ আবার নূতন করে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর সভাকবি বাক্‌পতিরাজ গৌড়-বাহো নামক ১২০৯ শ্লোক সম্বলিত কাব্যগ্রন্থে এই সংঘর্ষের আংশিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বর্ষা শেষে রাজা যশোবর্মা দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। দু'ধারের শ্যামল শোভা দেখতে দেখতে তাঁর সৈন্যগণ উপনীত হোল শোন্ নদীর উপত্যকায়। এখানে তিনি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ ষোড়শোপচারে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা করলেন। তার পর তাঁরা মগধনাথকে পরাভূত করে সেখানকার রাজবধূদের আনলেন নিজেদের শিবিরে। সেই বন্দিনী রূপসীগণকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল যশোবর্মার রাজধানী কনৌজে—পরিচারিকার কাজ করবার জন্য!

এইভাবে নানা জনপদ জয় করতে করতে কনৌজ সৈন্যদের হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত হয়ে গেল। বর্ষার কোমল বারিধারা অঙ্গে মেখে সেই বীর সৈনিকগণ অবশেষে উপনীত হোল গৌড় রাজ্যে। তাদের আগমন সংবাদ পেয়ে গৌড় সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত

মনে চারিদিকে পালাতে লাগল। কিন্তু এরূপ কাপুরুষোচিত আচরণে সবার ধিক্কারের পাত্র হোতে হবে বুঝে সৈন্যাধ্যক্ষরা নূতন করে ব্যূহ বিন্যাসের আদেশ দিলেন। সুরু হোল উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম। গৌড়গণ তাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। তাদের শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হয়; গৌড়েশ্বরের ছিন্ন মস্তকে যশোবর্মার তরবারী সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতে লিখিত গৌড়বাহো কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ নয়—বৃহত্তর এক গ্রন্থের ভূমিকা। সহস্রাধিক শ্লোক রচিত হবার পর কবি লিখছেন, এইবার তাঁর কাহিনীর মহারম্ভ—শোনবার জন্য পাঠকগণ যেন পর দিবস প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।* যথারীতি প্রভাত এল, কিন্তু প্রভুর স্তুতিগান ও প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় কবি এমনই বিভোর যে পূর্ব আশ্বাসের কথা তাঁর আর স্মরণ নেই। তাই আরও প্রায় এক শতটি শ্লোক রচিত হবার পর তিনি লিখলেন যে প্রত্যুষে যখন তিনি গৌড়বধ কাহিনী বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে নভোমণ্ডল থেকে নক্ষত্র বর্ষণ সুরু হোল, যশোবর্মার গুণমুগ্ধ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।† সেই কারণে গৌড়বধ কাব্যে স্বয়ং গৌড়পতি থাকলেন অনুক্ত!

আসল কথা এই যে বাক্‌পতিরাজের কেশব-সম দিগ্বিজয়ী বীর যশোবর্মা সসাগরা পৃথিবী জয় করে ফেরবার কিছু কাল পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ অধিকার করে নেন। তাই তাঁর যেখানে উপসংহার, কহ্লনের সেখানে সুরু। রাজতরঙ্গিণী রচয়িতা বলেন, পবন যে দেশে কন্যাগণকে কুব্জ করে দিয়েছিল সেই গাধিপুরে‡ নরপতি ললিতাদিত্য আদিত্যসম উজ্জ্বল আভায় অত্মপ্রকাশ করলে

* গৌড়বাহো শ্লোক ১০৭৪
† ,, ,, ১০৪৪-৬৮
‡ গাধিপুর=কনৌজ

মতিমান কান্যকুব্জপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক তাঁকে আপ্যায়িত করেন।[১] অর্দ্ধ পথে গৌড়বাহোর সমাপ্তি রহস্য এখানে লুক্কায়িত রয়েছে!

আমাদের গৌড় কাহিনী ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সেই কারণে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পৌঁছে কোন শূন্যতা রাখা চলে না। কোন্ গৌড়-পতিকে যশোবর্মা বধ করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে গৌড়বাসী শিল্পী সুক্ষ্মশিব বিরচিত আদিত্যসেনের অপসড় লিপি এবং জীবিতগুপ্তের বড়-বর্ণকলিপি থেকে। শেষোক্ত লিপিতে দেখা যায় যে আদিত্যসেনের পর তাঁর মহিষী কণাদেবীর গর্ভজাত পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পুত্র জীবিতগুপ্ত এই বংশের শেষ রাজা।[২] বোধ হয় এঁরই ছিন্ন মস্তকে যশোবর্মার তরবারী সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বাক্‌পতিরাজ বলেন, গৌড় জয়ের পর কনৌজ সৈন্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গরাজকে পরাস্ত ও বশীভূত করে। সেখান থেকে তারা সমুদ্রতটের শোভা দেখতে দেখতে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলে যায় এবং বহু রাজ্য ও জনপদ জয়ের পর স্বরাজ্যে ফিরে আসে। তাদের জয় করবার আর কিছু নেই। তাই যশোবর্মার রণকুঞ্জরসকল নিজেদের দৈহিক বলের পরীক্ষা দেবার জন্য পর্বতগাত্রে আঘাত করছে; রণক্লান্ত সামন্তগণ বিদায় নিয়েছে। সেই সামন্তদের অগণিত সৈনিকের দীর্ঘ অনু-পস্থিতিতে কৃষিক্ষেত্রসমূহ হরিৎ ঘাসে ভরে উঠেছিল; এখন সেখানে চাষবাস সুরু হয়েছে। সৈনিক-বধূদের মুখে হাসি ফুটেছে। বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য যশোবর্মা চলে গেছেন গ্রীষ্মাবাসে!

সর্বত্র এই সাফল্য সত্ত্বেও কবি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন গৌড়বাহো বা গৌড়-বধ। কারণ বোধ হয় এই যে তাঁর প্রভুকে গৌড়ে সব চেয়ে বেশী প্রতিরোধের সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। গৌড় তাঁর বিজিত রাজ্যগুলির মধ্যমণি!

১ রাজতরঙ্গিনী ৪।১৩৩-৪৫

2 Fleet J. F. *Inscriptions of Gupta Kings* p. 200-28

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মরুভূমির ঝঞ্ঝা

গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

প্রথম আরব আক্রমণ

মহাসমুদ্রে প্রবল ঝড় উঠেছিল। উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে ভারতের রাষ্ট্রতরী মুহুর্মুহুঃ আলোড়িত হচ্ছিল। এই বিশাল দেশ এখন অভিভাবকশূন্য। উত্তর ভারত বহুধা বিভক্ত; দক্ষিণে চালুক্য শক্তি পল্লভদের কাছে পরাজয়ের ফলে ম্রিয়মান। বিদেশী আক্রমণ প্রতি-রোধের সকল রক্ষাব্যূহে ফাটল দেখা দেওয়ায় একবার তিব্বতী, আর একবার চীনারা এসে দুই দরজায় আঘাত হেনে গেল। হয় তো তারা আর আসবে না, কিন্তু দেহ দুর্বল হোলে রোগবীজাণু বহু রন্ধ্র দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বে ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দের কিছু পর থেকে গৌড়সহ সমগ্র ভারত জয়ের পরিকল্পনা আরবদের ছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের অনুমতিক্রমে সদ্য-বিজিত পারস্যের ওমান বন্দর থেকে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে দুইটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ভারতে প্রেরণ করা হয়। হর্ষবর্দ্ধন তখন জীবিত; সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী প্রবল প্রতাপে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত শাসন করছেন। তাঁর নৌসৈন্যের প্রহরা ভেদ করে আরব নৌবহর কোঙ্কন উপকূলের

টানা ও ব্রোচ এবং সিন্ধু উপকূলের দেবলে উপনীত হোলেও কোন দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। শেষ অভিযানের নায়ক মুঘাইরা নিহত হন এবং তাঁর নৌবহর বিধ্বস্ত হয়।

এই বিপর্য্যয় থেকে আরবগণ বুঝে নেয় যে জলযুদ্ধে ভারত জয় সম্ভব নয়। তাই পয়গম্বরের অনুগত শিষ্য, পরে ইরাকের শাসনকর্তা, আবু মুসা আসারি স্থলপথে অভিযান চালাবার জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করেন। সেই অনুযায়ী ভারত ও পারস্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত তিনটি বাফার রাজ্য কির্মান, সিস্তান ও মাক্রান ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে অধিকার করা হয়। শেষোক্ত রাজ্যের বৌদ্ধ অধিপতি শ্রীহাসরায় ও তাঁর পুত্র যুদ্ধে নিহত হন। আরব অধিকার এইভাবে সিন্ধু সীমান্ত স্পর্শ করলেও ওই হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ সুরু করবার জন্য খলিফা ওমরের অনুমতি পাওয়া যায় না। কারণ আবু মুসার রিপোর্ট থেকে খলিফা জানতে পেরেছিলেন যে সিন্ধ্ ও হিন্দের রাজা শক্তিমান ও অবাধ্য। তিনি অধর্মের পথে চলেন এবং পাপ তাঁর হৃদয়ে বাসা বেঁধে রয়েছে।১

প্রথম চার খলিফা ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। আরবদের অন্তহীন আত্মকলহের মধ্যেও ইসলামের প্রসার পরিকল্পনায় তাঁরা যেরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হোতে হয়। তৃতীয় খলিফা ওসমান হিন্দে অভিযান সুরু করবার পূর্বে এই দেশের আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য জাবাল এল-আবদির পুত্র হাকিমকে হিন্দে পাঠান। হর্ষবর্দ্ধন তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে আর্য্যাবর্ত শাসন করছেন এবং চালুক্য রণতরী পশ্চিম উপকুল পাহারা দিচ্ছে। সিন্ধুর অধিপতিও যথেষ্ট শক্তিশালী। ছদ্মবেশে সমগ্র পশ্চিম ভারত ঘুরে হাকিম সব লক্ষ্য করলেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে খলিফাকে জানালেন: অধিবাসীরা সাহসী, পথ ঊষর, খাদ্য-পানীয় দুষ্প্রাপ্য। ছোট ফৌজ পাঠালে ধ্বংস হবে, বড় ফৌজ অনাহারে মরবে।

—তুমি ঠিক কথা বলছ, না কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করেছ ?

—আমি নিজ জ্ঞানমতেই কথা বলছি।

খলিফা কিছুক্ষণ মৌন থাকলেন। ভারত সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ আপাততঃ স্থগিত রাখা হোল।[২]

দ্বিতীয় আরব আক্রমণ

ঘাতকের অস্ত্রে ওসমানের মৃত্যু হোলে পয়গম্বরের জামাতা আলী যখন খলিফা নিযুক্ত হন ভারতে তখন হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়েছে এবং দক্ষিণ থেকে পল্লভগণ এসে চালুক্য শক্তিকে পরাভূত করেছে। তার ফলে সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সিন্ধু তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। এমন সুযোগ পূর্বে কখনও আসে নি! ইরাক থেকে সেনাপতি হারাসের অধিনায়কত্বে ৩৮ হিজিরাব্দে* এক শক্তিশালী আরব বাহিনী সিন্ধু আক্রমণ করে। কিন্তু সে অভিযান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। যুদ্ধশেষে এক হাজার ক্রীতদাস এবং কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে হারাস ইরাকে ফিরে যান।

এই যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকায় পুনরায় সিন্ধু আক্রমণের জন্য হারাস তিন বৎসর ধরে সমরসজ্জা করতে থাকেন। সিন্ধুরাজ অপ্রস্তুত ছিলেন না, গুপ্তচরের মুখে সব সংবাদই পাচ্ছিলেন। সেই কারণে হারাস যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করেন সেই সময়ে তিনিও নিজ রাজধানী থেকে পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। খোরাসানের নিকট কিকানে উভয় সৈন্যবাহিনী ৬৬২ খৃষ্টাব্দে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সেই লোমহর্ষক যুদ্ধে আরবগণ পরাজিত হয় এবং হারাস নিহত হন।

* খৃঃ অঃ ৬৬০

এর পরে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে ক্ষুদ্র সিন্ধুকে বারবার আরব আক্রমণের বেগ সইতে হয়। কিন্তু অজেয় সিন্ধু অজেয় থেকে যায়। আরবগণ যখন পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস ও বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পরাভূত করে পশ্চিমদিকে আটলান্টিক তীরে গিয়ে উপনীত হয় সেই সময়ে জলপথ ও স্থলপথে বারবার অভিযান চালিয়েও ভারতের এই ক্ষুদ্র জেলাটি অধিকার করা তাদের সাধ্যে কুলায় নি। কিন্তু অক্লান্ত অধ্যবসায় কখনও ব্যর্থ হয় না। খলিফা আল-ওয়ালিদের নির্দেশে ইরাকের শাসনকর্তা হেজাজের সেনাপতি মহম্মদ বিন-কাশিম সাকিভি ৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু অধিকার করেন।

সিন্ধুর পর গান্ধার

একই সময়ে আরব সেনাপতি তরিক জিব্রাল্টার পার হয়ে স্পেনে উপনীত হন এবং উত্তর সীমান্তে কুতাইবা পারস্যের ভিতর দিয়ে মধ্য-এশিয়ার দিকে এগোতে থাকেন। এই অভিযানের পিছনেও ছিল খলিফা আল-ওয়ালিদের নির্দেশ। আক্রান্ত অঞ্চলগুলি তখন বৌদ্ধ—কাবুল এবং কাশ্মীর হিন্দু। কাশ্মীররাজ তারাপীড় এবং বোখারার বৌদ্ধ অধিপতি ইকশেধ ঘুরক আরবদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য চীন রাজধানীতে দূত পাঠান। কোন দূতই রিক্ত হস্তে ফেরেন নি; ট্যাং সম্রাট সবাইকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ওই সাম্রাজ্যের পূর্ব গরিমা আর নেই। নূতন সম্রাট চুং-সুং একে দুর্বল, তায় নানা সমস্যায় জর্জরিত। সেই কারণে কিছু দিন পরে খলিফার দূত তাঁর রাজসভায় এসে অতি সহজে নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার আদায় করে দেশে ফিরে যান।[৫] সমরখন্দ-বোখারাসহ সমগ্র তুর্কীস্থান দীর্ঘ দিন ধরে বীর বিক্রমে লড়েছিল, কিন্তু চীন সাম্রাজ্য থেকে কোন প্রকার সাহায্য না আসায় শেষ পর্য্যন্ত ৭১২ খৃষ্টাব্দে আরব অধিকারে চলে যায়। বৌদ্ধ অধিবাসীরা দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়।

ভারতে কিন্তু আরবগণ প্রাণপাত চেষ্টা করেও সিন্ধুর বাইরে এক পাও এগোতে পারে নি। তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্য চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সেই মহাদুর্যোগের দিনে প্রতি অঞ্চলে নূতন নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। কাশ্মীরে তারাপীড়ের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠাগ্রজ ললিতাদিত্য ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করে নূতন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য বিরাট আকারে সমর প্রস্তুতি সুরু করেন। ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান সমরনায়ক এই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়। তাঁর বিজয়-বাহিনী গৌড়ে এসে এখানকার রাজনৈতিক মানচিত্রে আমুল পরিবর্তন সাধিত করে। পরবর্তী অধ্যায়ে সে কথা আলোচনা করা হবে।

1 Elliot H. M. & Dowson J. *Chachnamah, p. 415*

2 Ibid. *Futuhu-Buldan, p. 115*

3 Ibid. *Ibid p. 116*

4 Strange G. L. *Lands of the Eastern Khaliphate, p. 460, 463*

5 Fitzgerald C. P. *China, p. 336*

সপ্তদশ অধ্যায়

কাশ্মীর ও গৌড়

গৌড়ে ললিতাদিত্য

যশোবর্মা কর্তৃক গৌড় বধের সঙ্গে সঙ্গে শত বর্ষব্যাপী গুপ্তাধিকারের উপর শেষ যবনিকা পড়লে বিজয়ী কনৌজরাজ যে কাকে এই রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন সমসাময়িক কোন গ্রন্থে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বহু দিন পরে লিখিত ফারসী ইতিহাস ওয়াকিয়াৎ-ই-কাশ্মীরে সূত্র উল্লেখ না করে বলা হয়েছে, গোসাল নামীয় এই গৌড়রাজ যশোবর্মার পতনের কিছু দিন পরে কাশ্মীরে গিয়ে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১] এই উক্তি যদি সত্য হয় তা হোলে জীবিতগুপ্তের বিনাশের পর এই গোসাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে রাজ্যভোগ বেশী দিন ঘটে নি। উলার হ্রদের জলরাশির উপর সেই সময়ে যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমগ্র আর্য্যাবর্ত প্লাবিত করে গৌড়ের কূলে এসে আঘাত করতে থাকে। তরে তলায় গোসাল ডুবে যান, গৌড়ের রাজনৈতিক জীবন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি, কাশ্মীর সিংহাসনে আরোহণের পর ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হোতে থাকেন। আরব স্রোত তখন মধ্য-এশিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা সমরখন্দ্ অধিকার করে কিল্‌কি গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে কাশ্মীরে মাঝে মাঝে গুপ্তচর পাঠাতে থাকে। তাদের লক্ষ্য অবশ্য শুধু কাশ্মীর নয়—সমগ্র হিন্দ্। সেজন্য সদ্যবিজিত তুর্কীস্থানের বাল্‌খে

এক শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কাবুল উপত্যকায় প্রবেশের জন্য বামিয়ান গিরিবর্ত্মের উপর ক্রমাগত আঘাত আসছে।২ সেখানকার শাহিরাজ্যের রক্ষাব্যবস্থায় একবার ভাঙন ধরলে স্রোতের মত আরব সৈন্য গান্ধারে প্রবেশ করবে। পশ্চিমে সিন্ধু এবং উত্তরে গান্ধার থেকে সুরু হবে ভারতের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ!

অতি সূক্ষ্ম সূতার উপর ঝুলছিল ভারতের ভবিষ্যৎ। বিশাল আরব সাম্রাজ্য মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে এই দেশকে গ্রাস করবার জন্য। জীবনপণ করে লড়েও সমরখন্দ্‌রাজ ইক্‌শেধ ঘুরক তাদের গতিরোধ করতে পারেন নি। ভারতের রক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? যশোবর্মা যেরূপ অবলীলাক্রমে সসৈন্যে ভারত পরিক্রমা করে স্বরাজ্যে ফিরেছেন তাতে এখানকার বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিগুলির দুর্বলতা প্রতিভাত হয়েছে। এখন ভরসা তিনি! কিন্তু শক্তিশালী জাতি গড়তে হোলে যেরূপ চরিত্রবলের প্রয়োজন যশোবর্মার তা নেই। তাঁর প্রসস্তিকারই তো লিখেছেন যে কনৌজ প্রাসাদের মধ্যে তিনি রূপের মেলা বসিয়েছেন। সেই রূপসীদের অঙ্গরাগের ব্যবস্থা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়। যশোবর্মা তাদের সঙ্গে জলক্রীড়া করেন; তাপদগ্ধ দেহ শীতল করবার জন্য তাদের নিয়ে গ্রীষ্মাবাসে যান। শুধু কি তাই? রাজসভায়ও তাঁর নারী চাই! সভাসদগণসহ রাজকার্য্য পরিচালনা করবার সময়ে বন্দিনী গৌড় রাজবালাগণ তাঁর বরবপুতে চামর ব্যজন করে।৩

এই যশোবর্মা! প্রকাশ্য রাজসভায় বসে যে রাজা রূপসী তরুণীদের সাহচর্য্য উপভোগ করতে লজ্জা পান না তিনি হবেন জাতির কর্ণধার? বিশাল আরব সাম্রাজ্যের সম্মুখীন হবার জন্য তাদের সমান বৈভবের প্রয়োজন নেই, কিন্তু উন্নত চরিত্র অপরিহার্য্য। সে চরিত্র যশোবর্মার নেই—ললিতাদিত্যের আছে। তিনি বুঝেছিলেন, আরবদের

সম্মুখীন হতে হোলে দেওয়ালের দিকে পিছন করে লড়লে চলবে না— এগিয়ে যেতে হবে। সিংহের বিবরে প্রবেশ করে তার কেশর আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু তার আগে চাই নিজ গৃহকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা। ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে সংঘবদ্ধ করবার জন্য ললিতাদিত্য সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন।

সুশিক্ষিত কাশ্মীরী সৈন্যগণ যখন আর্য্যাবর্তের সমভূমির উপর নেমে এল কেউ তাদের গতিরোধ করতে পারে নি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্বেদী রাজ্যের রাজমুকুট নিজ শিরে ধারণ করে ললিতাদিত্য এগিয়ে আসতে লাগলেন পূর্বদিকে। যশোবর্মা তখন গৌড়বধ সম্পন্ন করে আত্মতৃপ্তিতে ডুবে রয়েছেন। কোনও সীমান্ত থেকে যে এরূপ আক্রমণ আসতে পারে এমন কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। কাশ্মীরী সৈন্যরা এত ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর রাজ্যে এসে উপনীত হোল যে সৈন্য সন্নিবেশের জন্য সামন্ত ও সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে আহ্বান পাঠাবার সময় মিলল না। নিরুপায় যশোবর্মা সন্ধি প্রার্থনা করে ললিতাদিত্যের শিবিরে দূত পাঠালেন!

কাশ্মীরনাথ সে প্রস্তাবে সম্মত হন, কিন্তু তাঁর কোন কোন সহকারী ভিন্ন মত পোষণ করতেন। 'বসন্ত ঋতু সকল পুষ্পের আকর হইলেও চন্দনানিল বেশী সুগন্ধ বহন করে'* সন্ধিপত্রের মুখবন্ধে যশোবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক নিজ প্রভুর নাম আগে লেখায় ললিতাদিত্যের মন্ত্রী মিত্রশর্মা বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। তার ফলে যুদ্ধ পরিহার করা অসম্ভব হয় এবং পরাজিত যশোবর্মা তাঁর সভাকবি বাকপতিরাজ, রাজশ্রী ও ভবভূতিসহ ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেন।

কনৌজ জয়ের পর ললিতাদিত্যের বিজয়বাহিনী যায় কলিঙ্গে এবং তার পর আসে গৌড়ে। 'তাঁহার অনুরাগিণী রাজলক্ষ্মীর সুখাসনটি যে হস্তী বহন করিত যেন তাহার প্রতি সৌহার্দ্যবশতঃ গৌড়ভূমির সমস্ত

* রা: ত: ৪।১৩৬

হস্তী আসিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়।'*

এই ভাবে সমগ্র উত্তর ভারত জয়ের পর ললিতাদিত্য দাক্ষিণাত্যে গেলে কেউ তাঁর গতিরোধ করতে সাহস পায় নি। দীর্ঘকেশী কর্ণাটকীরা পরাজিত হয় এবং তাদের রূপসী রাণী রট্টা বশ্যতা স্বীকার করেন। 'ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী সদৃশ্যা অসীম শক্তিশালিনী সেই দেবীর পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথের সকল দ্বার ললিতাদিত্যের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যায়।' তার পর তাঁর সৈন্যগণ ক্রমক, কোঙ্কন প্রভৃতি রাজ্য জয় করে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকায় গিয়ে উপনীত হয়। এবার বিন্ধ্যগিরি সমাচ্ছন্ন ভূভাগ। সেখানকার অবন্তীরাজ্যে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ললিতাদিত্য উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পূজা দেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। সর্বত্র শুক-সারী তাঁর জয়গান করতে থাকে!

মধ্য-এশিয়ায় সার্থক অভিযান

সিন্ধু থেকে আরবগণকে দূরীভূত করবার জন্য ললিতাদিত্য এক শক্তিশালী বাহিনীসহ কাশ্মীর থেকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু রাজস্থানের মরুভূমি পার হবার সময়ে পথপ্রদর্শক শিকত-সিন্ধুর মন্ত্রী তাঁকে বিভ্রান্ত করায় জলাভাবে মধ্যপথে যাত্রা ভঙ্গ করতে হয়। সেই কারণে আরবগণ সিন্ধুতে অক্ষত থেকে যায়। তাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা হয় মধ্য-এশিয়ায়। 'তাঁহার আগমনে কম্বোজদিগের অশ্বশালা অশ্বশূন্য হয় এবং বোখারার অধিবাসীগণ নিজেদের অশ্বসকল পরিত্যাগ করিয়া পর্বতশিখরে পলায়ন করে।'†

বিজয়ী কাশ্মীরনাথ পরাজিত তুরস্কগণকে পরাজয়চিহ্ন প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য মস্তকার্দ্ধ মুড়াতে বাধ্য করেন। তার পর তিনি যুদ্ধে মুম্মুনিরাজকে তিনবার পরাজিত করেন। বেদিয়াউদ্দিন বলেন, তিনি

*রা: ত: ৪।১৪৮

† রা: ত: ৪।১৬৫

খোরাসানেও গিয়েছিলেন, কিন্তু আরবদের খ্যাতির সম্মুখে নতি স্বীকার করেন।[৪] এই সব সাফল্যের পর স্ত্রীরাজ্য জয় সম্পন্ন করে ললিতাদিত্য তিব্বতের একাংশ নিজ অধিকারে আনেন। দর্দিস্থানও অধিকৃত হয়।[৫] দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ৭ মাস ধরে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের পর উত্তর-কুরুতে* অভিযান চালাবার সময়ে কোনও অজ্ঞাত কারণে অভিযাত্রী-বাহিনীসহ তিনি নিশ্চিহ্ন হন।

কহ্লনের গৌড় বন্দনা

গৌড়ে অবস্থানের সময়ে ললিতাদিত্য এখানকার প্রাক্তন শাসন-কর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন কাশ্মীরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি যেই হোন তাঁর ভবিষ্যৎ তখন সংশয়দোলায় দোদুল্যমান; নূতন প্রভুর প্রসাদ লাভের আশায় কাশ্মীর যান। কিন্তু সেখানে আশানুরূপ সম্ভাষণ পান নি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ললিতাদিত্য তাঁকে জানান, যশোবর্মার পতনের পরও যে তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সে কেবল পরিহাসকেশবের অনুগ্রহ। পরে তাঁকে ত্রিগামী নামক স্থানে পাঠিয়ে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করান হয়।

কহ্লন সত্যকার ঐতিহাসিক। তাই ললিতাদিত্যের সমর নৈপুণ্য ও রাজোচিত গুণাবলীর প্রসংশা করেও এই মহৎ দোষের কথা গোপন রাখেন নি। তিনি লিখেছেন, 'ললিতাদিত্য বড়ই পরিহাস রসিক ছিলেন। সেই কারণে মনোরম নগরী পরিহাসপুর নির্মাণ করিয়া সেখানে রজতনির্মিত পরিহাসকেশব বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। একটি বুদ্ধ বিহারও নির্মিত হইয়াছিল।

'ইহা কলির মহিমা অথবা রাজ সিংহাসনের প্রভাব যে ললিতা-দিত্যের ন্যায় সর্বগুণাধার নরপতিও সময়ে সময়ে পাপ ব্যবহার দেখাইয়া গিয়াছেন।

* উত্তরকুরু—পামীরের নিকটবর্তী কোনও অঞ্চল

'যদিও এই রাজা ললিতাদিত্য মহত্ত্বে ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সাধারণ রাজাদের ন্যায় আর একটি দোষ ঘটিয়াছিল শুনা যায়।

'তিনি পরিহাসকেশব নামক বিষ্ণুবিগ্রহটিকে মধ্যস্থ রাখিয়া ত্রিগাম দেশে উগ্রসৈনিকের সাহায্যে গৌড়াধিপকে বধ করিয়াছিলেন।

'তৎকালে গৌড়েশ্বরের অনুচরদিগের মধ্যে অতি অদ্ভুত বিক্রম দেখা গিয়াছিল। তাহারা স্বর্গগত প্রভুর গুণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরী সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

'প্রথমে তাহারা সারদাদেবীকে দর্শন করিবার ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করে ও পরে সকলে একযোগে সেই মধ্যস্থভূত পরিহাসকেশবের মন্দিরটি আক্রমণ করে।

'কাশ্মীরনাথ দূরদেশে আছেন, এই সময়ে গৌড়বাসীরা প্রভুহত্যাজনিত ক্রোধে অন্ধ হইয়া পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া লইতে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইয়া তথাকার পূজকেরা পরিহাসকেশবের মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

'তখন বিক্রমশালী গৌড়ীয়েরা রজতময় রামস্বামী বিগ্রহকে পরিহাসহরি ভ্রমে আক্রমণ করিল। তাঁহাকে উৎপাটন করিয়া চূর্ণ করিয়া দিল।*

'কাশ্মীরী সৈন্য নগর হইতে বাহির হইয়া উহাদিগকে নানাবিধ প্রহারে হত্যা করিতে থাকিলেও উহারা রামস্বামীর তিল তিল পরিমাণ চূর্ণ চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল।

'সেই কৃষ্ণকায় গৌড়বাসীরা কাশ্মীর সেনার হাতে নিহত হইয়া যখন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল তখন বোধ হইতে লাগিল যেন গৈরিকাদি ধাতুর রসে অঞ্জনগিরির সুবৃহৎ প্রস্তরগুলি

* এই গৌড়গণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিল।

খসিয়া পড়িতেছে।

'ভাবিয়া দেখ দেখি, গৌড় হইতে কাশ্মীর কত সুদীর্ঘ কালের পথ! আর মৃত প্রভুর প্রতি অনুরাগই বা কিরূপ! সুতরাং তৎকালে গৌড়-বাসীরা যাহা করিয়াছিল তাহা বিধাতারও অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

'তাহাদের রুধিরধারায় অসামান্য প্রভুভক্তি উজ্জ্বলতর হইয়া বসুন্ধরা ধন্য হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামীর পবিত্র মন্দিরটি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে গৌড়বীরদের যশোরাশি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ঘোষিত হইতেছে।

তদিয়রুধিরসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলিকৃতা।
স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামীপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশস্য পুনঃ॥৫

কাশ্মীর ইতিহাসে গৌড় প্রভাব

ললিতাদিত্যের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়পীড় ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এক বৎসর পোনের দিন রাজদণ্ড পরিচালনার পর সেই ধর্মপ্রাণ যুবক সাধনভজনের জন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্যের উপর রাজ্যভার দিয়ে প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক বিজন কাননে চলে যান। মনোকষ্টে পিতৃমন্ত্রী মিত্রশর্মা সস্ত্রীক বিতস্তার জলে প্রাণ বিসর্জন করেন।

বজ্রাদিত্য ও তাঁর জেষ্ঠ পুত্রের কুশাসনের ফলে সর্বত্র গণবিক্ষোভ দেখা দিলে মন্ত্রীগণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জয়াপীড়কে ৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। রাজ্যলাভের পর জয়াপীড় তাঁর মহান পিতামহকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং পিতা ও অগ্রজের অযোগ্যতার ফলে সাম্রাজ্যের যে সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য

এক বিরাট বাহিনীসহ স্বদেশ থেকে রওনা হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর পিছন পিছন ফিরছিল। কাশ্মীর ছেড়ে যখন তিনি বেশ কিছু দূর এগিয়ে এসেছেন সেই সময়ে এক দিন খবর এল যে জজ্জ তাঁর সিংহাসন আত্মসাৎ করেছে। জজ্জ? যে শ্যালককে তিনি এতখানি বিশ্বাস করতেন সে এমনিভাবে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করল? তাকে শিক্ষা দিতে হবে! ক্রোধান্ধ জয়পীড় তাঁবু গোটাবার আদেশ দিলেন। সকল সৈন্যকে এখনই কাশ্মীরে ফিরে যেতে হবে।

আদেশ তো তিনি দিলেন, কিন্তু তা পালন করবে কে? তাঁর শিবিরের মধ্যে শত্রুর পঞ্চম বাহিনী বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজ করছিল। জজ্জের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে তারা গোপনে শিবির ছেড়ে কোথায় চলে গেল। তাদের দেখাদেখি আরও কিছু সৈনিক গেল পরিবার পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য। ক্ষোভে ও ঘৃণায় জয়াপীড় সামন্তগণকে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরবার আদেশ দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ চললেন পূর্ব দিকে। অশ্বারোহী সৈনিকদেরও বিদায় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অশ্বগুলি তিনি নিজের সঙ্গে রাখলেন। প্রয়াগে পৌঁছে একটি বাদে সেই এক লক্ষ অশ্ব দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে এক গভীর নিশীথে কাশ্মীররাজ সবার অলক্ষ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন!

কিন্তু কোথায় যাবেন? গৃহে শ্যালক চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, পথে বহু সৈন্য তাঁকে ত্যাগ করেছে, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আসবার সময়ে কোন সামন্ত এসে সম্মান দেখাল না। কার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবেন? এই দুর্দিনে কে তাঁকে আপন বলে গ্রহণ করবে? নখরদন্তহীন সিংহকে গ্রাহ্য করে কে? জয়াপীড় শুনেছিলেন, সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চল স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করলেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত এখনও তাঁর প্রতি অনুরক্ত আছেন। সেখানে গেলে

হয়তো অধিরাজের মর্য্যাদা মিলবে। কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন কেমন করে? প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রবেশ করে কল্লাট নাম নিয়ে রাজধানীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ঐশ্বর্য্য দেখে জয়াপীড়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এক শতাব্দী পূর্বে হিউয়েন-সাং এখানে এসে অপর্য্যাপ্ত পনস্-ফল দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু জয়ন্তের সুশাসনের ফলে এখন সেখানে ঐশ্বর্য্যের বন্যা বইছে। লক্ষ্মীদেবী যেন স্বরূপে বিরাজ করছেন! এক দিন সন্ধ্যা সমাগমে নগরমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কার্তিকেয় মন্দির থেকে কানে এল নারীকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত লহরী। দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন—তথাপি সঙ্গীতজ্ঞ কাশ্মীররাজ সেই সঙ্গীত ভরত-শাস্ত্রানুযায়ী গাওয়া হচ্ছে বুঝে তাই শোনবার জন্য দেবালয়ের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করলেন।

আগন্তুকের অসামান্য কান্তি ও আভিজাত্যপূর্ণ অবয়ব সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিস্মিত করল। আত্মপরিচয় না দিলেও তাঁর সম্ভ্রান্তসুলভ চালচলন দেখে দেবনর্তকী কমলার বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, হয় রাজপুত্র নতুবা বিশেষ মর্য্যাদাশালী বংশের যুবক। কমলা ডুবল! সেই বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সখীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানাল। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জয়াপীড় কমলার গৃহে গেলে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ প্রদানের পর সুবর্ণনির্মিত পালঙ্কে শয়ন করতে দেওয়া হয়। নর্তকী অসাধারণ ধনশালিনী!

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অরণ্যে তখনও সিংহের বাস ছিল। পর দিন প্রভাতে কমলার মুখ থেকে জয়পীড় শোনেন যে নিশাগমের পর পার্শ্ববর্তী অরণ্য থেকে এক সিংহ বেরিয়ে এসে রাজধানীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। তার ভয়ে সূর্য্যাস্তের পর কেউ বাড়ীর বাইরে যায় না, সবাই গৃহে ফিরে

এসে সদর দরজা বন্ধ করে। নগরবাসীদের সিংহভয় থেকে মুক্ত করবার জন্য সবার অলক্ষ্যে জয়াপীড় সেই দিন সন্ধ্যায় নগরের বাইরে চলে গিয়ে তার প্রবেশপথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। যথাসময়ে পশুরাজ যখন সেখান দিয়ে পথাতিক্রম করছিল সেই সময়ে তিনি অতর্কিত আক্রমণে তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে দিলেন। তাতে সিংহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলেও ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে তাঁর হাতের কেয়ূর কেমন করে তার দাঁতে আটকে যায়!

সিংহনিধনের সংবাদ পেয়ে পর দিন প্রভাতে দলে দলে নগরবাসী ঘটনাস্থলে এসে উপনীত হোল। জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত কেয়ূর দেখে তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে কাশ্মীররাজ তাদেরই নগরে এসে অজ্ঞাতবাস করছেন। রাজা জয়ন্তের কানেও সংবাদটি পৌঁছাল। তাঁর উল্লাস আর ধরে না! পৃথিবীনাথ যে তাঁরই রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হোতে পারে? মন্ত্রী ও সভাসদবর্গসহ তিনি নিজেই চলে গেলেন কমলালয়ে এবং সেখান থেকে জয়াপীড়কে সমাদর করে আনলেন নিজ প্রাসাদে।

জয়ন্তের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে তিনি পুত্রবৎ লালনপালন করছিলেন। রাজকন্যা রাজকন্যারই মত সুন্দরী এবং সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী। তাঁর জন্য জয়াপীড়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর পাত্র তিনি কোথায় পাবেন? পুরবাসীরা অবশ্য পূর্বে জয়াপীড়ের আগমনাশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন আর তাদের কোন ভয় নেই। সবার সম্মতি নিয়ে জয়ন্ত কন্যাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করলেন এবং জামাতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিলেন। তিনিও 'পূর্ব-পরিত্যক্তা রাজলক্ষ্মীকে পাইলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।'

জয়াপীড় বুঝলেন, ধর্ম এখনও আছে—চন্দ্রসূর্য্য লোপ পায় নি। পরমাত্মীয় যখন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে সময়ে এই

অপরিচিত ভূপতি কত উদারতাই না দেখালেন! অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলোকের সন্ধান পেলেন; শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য গৌড়ের সকল রাজাকে জানালেন যে ললিতাদিত্যের পৌত্র ও কাশ্মীরের বর্তমান অধীশ্বররূপে তিনি আদেশ দিচ্ছেন যে জয়ন্তকে যেন তাঁরা নিজেদের প্রধানরূপে গ্রহণ করেন। এই ভাবে 'বিনা যুদ্ধোদ্যমে গৌড়ের পঞ্চ নৃপতিকে জয় করিয়া তিনি শ্বশুর জয়ন্তকে তাঁহাদের অধিপতি করিয়া দিলেন।'*

জজ্জ কাশ্মীর অধিকার করলেও জয়াপীড়ের সমর্থকগণ নিষ্ক্রিয় থাকে নি; প্রাক্তন মন্ত্রী মিত্রশর্মার পুত্র দেবশর্মার অধীনে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। তাঁর আত্মপ্রকাশের সংবাদ কাশ্মীরে পৌঁছালে দেবশর্মা কিছু রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে এসে প্রভুর সঙ্গে যোগ দেন। সেই সৈনিক ও জয়ন্ত প্রদত্ত শক্তিশালী গৌড় বাহিনীসহ এক শুভ দিনে জয়াপীড় স্বরাজ্যের দিকে রওনা হোলেন। কমলনয়না কল্যাণদেবী ও আশ্রয়দাত্রী কমলা তাঁর সঙ্গে চললেন।

জজ্জ অপ্রস্তুত ছিলেন না। জয়াপীড়ের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি দক্ষিণ সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। পুষ্কলেত্র গ্রামে উভয় বাহিনীর মধ্যে বহু দিন ধরে যুদ্ধ চলে। তার শেষ পর্য্যায়ে শ্রীদেব নামক এক রাজভক্ত চণ্ডাল ক্ষেপনীযন্ত্র দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করে জজ্জকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিলে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়।

এই ভাবে তিন বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর গৌড়সেনার সাহায্যে জয়াপীড় হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন। গৌড়বালা কল্যাণদেবীর মধুর ব্যবহারে তিনি এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে স্বয়ং প্রতিহারীর পদ গ্রহণ করে তাঁকে সম্মানিত করেন। তিনিও স্বামীর বিজয় স্মরণীয়

* ব্যাধাদ্ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্ ॥ রাঃ তঃ ৪।৪৬৮

করবার জন্য জজ্জ যে স্থানে নিহত হয়েছিলেন সেখানে কল্যাণপুর নামে গণ্ডগ্রাম নির্মাণ করেন। এই গৌড়নন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র সংগ্রামপীড় পরে কাশ্মীরের অধীশ্বর হন। তিনি দ্বিতীয় পৃথিব্যাপীড় নামেও পরিচিত।৬

1 Wilson H. H. *Hindu History of Kashmir, p. 48*

2 Bellew H. W. *Kashmir and Kashgar, p. 57*

৩ গৌড়-বাহো, শ্লোক ৭৩৮-৯৬

4 Wlson H. H. *Hindu History of Kashmir, p. 45*

৫ রাজতরঙ্গিনী ৪।২৯৪-৩৩৫

৬ ,, ৪।৪৮৩-৮৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

শূরশাসনে রাঢ়

শূর বংশের অভ্যুদয়

উপাস্য দেবতার নামে গৌড়রাজকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ললিতাদিত্য তাঁকে ঘাতকের ছুরিকার উপর তুলে দিলেন! তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হোল না! অথচ তিনি বর্বর ছিলেন না। তাঁর ন্যায় সর্বগুণাধার নরপতি শুধু কাশ্মীরে কেন যে কোন দেশে বিরল। প্রথম অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ভূতেশ মহাদেবের দেবোত্তর কোষাগার থেকে যে এক কোটী মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন দিগ্বিজয় শেষে দশ কোটী মুদ্রা প্রণামীসহ তা পরিশোধ করেন। কান্যকুব্জের উদ্বৃত্ত রাজস্ব ললিতপুরের আদিত্য মন্দিরের নামে উৎসর্গ করা হয়। তাঁর ব্যবস্থায় পরিহাস কেশব মন্দিরে বিশেষ পর্বদিনে এক লক্ষ নরনারী দক্ষিণাসহ অন্ন গ্রহণ করত। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কাশ্মীরের প্রতি গ্রামে খাল কেটে জল সরবরাহের জন্য জলযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁর নির্দেশে বিতস্তার উপর বহু পুল ও ঘাট এবং কাশ্মীরের সর্বত্র বহু চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হয়। এরূপ আদর্শ নরপতি দেবতা স্বাক্ষী করে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন তা রক্ষা করা হয় নি ঐতি-হাসিকের কাছে সেই প্রশ্ন বরাবর রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে।

সঠিক উত্তর আমরাও দিতে পারি না। তবে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে যুদ্ধ জয়ের পর ললিতাদিত্যকে নিজ সৈন্যাধ্যক্ষগণের উচ্চাকাঙ্খার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের দাবী পূরণের জন্য প্রথম অভিযানের শেষে 'তিনি জালন্দর, লোহার ও অন্যান্য

সমৃদ্ধ প্রদেশসমূহ প্রসাদস্বরূপ প্রধান কর্মচারীদিগকে প্রদান করিয়া তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।'* কিন্তু বিরাট দিগ্বিজয় সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভূভাগ বেশী ছিল না। অধিকাংশ জনপদ করদরাজগণের অধিকারভুক্ত; তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। মহাসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক পাত্র পানীয়ের জন্য ললিতাদিত্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন!

বিজিত কান্যকুব্জ আদিত্যদেবের নামে উৎসর্গ করা হোলেও প্রস্তরীভূত দেবতা সেখানকার কর আদায় বা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন না। সেই কারণে একাধিক সৈন্যাধ্যক্ষকে ওই রাজ্যে সামন্ত নিয়োগ করা হয়। মগধেও কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি আরও আছেন; তাঁদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ললিতাদিত্য গৌড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

ঠিক এই সময়ে গৌড়ের রাঢ় বিষয়ে শূর বংশ এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন বিষয়ে অন্য এক নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা কবিশূর দরদ দেশের† অধিবাসী।১ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশেও নাকি বর্ণিত আছে যে দরদ দেশাগত শূররাজগণ গৌড়ের পূর্বতন বৌদ্ধ রাজাকে জয় করে এখানকার আধিপত্য লাভ করেন—

আগমৎ ভারতং বর্ষং দরদাৎ সঃ রবিপ্রভ।
জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজনং তথা গৌড়াধিপং বলান্॥

শুধু দরদ কেন, মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য বহু অঞ্চলের অধিবাসীগণ ললিতাদিত্যের অধীনে কাজ করতেন। 'বায়ু যেমন নানা বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি সংগ্রহ করে সেই রাজাও তেমনি নানা দেশ হইতে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিজের নিকট আনাইয়া-

* রাজতরঙ্গিনী, ৪।১৭৭

† দরদ্ দেশ—দর্দিস্থান। কাশ্মীর ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত ভূভাগের প্রাচীন নাম। এখনকার চিত্রল, হুন্জা, গিলগিট ও আস্তর উপত্যকা দরদ্ দেশের অন্তর্ভুক্ত।—*Encyclopædia Britanica.*

ছিলেন।' তাঁর বৌদ্ধ মন্ত্রী চাঙ্কুনার আদি নিবাস আমুদরিয়া নদীর ওপারে—বোখারায়। এই মন্ত্রীর ভ্রাতা সে যুগের অদ্বিতীয় রাসায়নিক কঙ্কণবর্ষ ও শ্যালক ঈশানচন্দ্র ললিতাদিত্যের অধীনে কাজ করতেন। চাঙ্কুনার প্রতি তাঁর স্নেহ এত গভীর ছিল যে মগধ জয়ের পর 'সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়' ভগবান বুদ্ধের যে মুর্তিটি তিনি হস্তীপৃষ্ঠে শোভাযাত্রা করে স্বরাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে তা উপহার দেন। পরিহাসপুরের স্নুগত-বিম্ব বিহারে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।†

কায়স্থ জাগরণ

এই সব অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যে কায়স্থ ছিল বেশী। কারণ, ললিতাদিত্যের কর্কোটানাগ বংশ ওই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর দিগ্বিজয় ও বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কায়স্থগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি মিত্রশর্মার ন্যায় ব্রাহ্মণ ও চাঙ্কুণার ন্যায় বৌদ্ধ মনীষীদের সাহায্য গ্রহণ করলেও বিজিত রাজ্যগুলিতে সামন্ত নিয়োগ করবার সময়ে কায়স্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতেন। স্ববর্ণীয়দের উপর তাঁর এতখানি আস্থা ছিল যে সভাসদগণের নিকট প্রেরিত অন্তিম উপদেশাবলীতে তিনি লেখেন, 'রাজারা যখন কায়স্থদের অধিকৃত কর্মস্থলগুলি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন তখন নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে প্রজাপুঞ্জের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।'*

এরূপ এক দিগ্বিজয়ী বীরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় কায়স্থগণ এই সময় থেকে উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে।

† রা. ত. ৪।২১১-১৬

* কর্ম্মস্থানানি বীক্ষন্তে ক্ষ্মাপাঃ কায়স্থবদ্ যদা।
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্য বিপর্য্যয়ঃ॥ রা. ত. ৪।৩৫২

এত দিন তারা ছিল ভূম্যাধিকারী ও রাজসরকারের লেখক ; এখন থেকে হোল শাসক। ক্ষত্রিয়রা পেছিয়ে যেতে লাগল। এই নূতন শাসক-কুলের সবাই যে আর্য্যবংশসম্ভূত ছিল এমন কথা বলা চলে না। চেদি, শকসেন, সূর্য্যধ্বজ প্রভৃতি বংশীয় কায়স্থগণ সত্যই আর্য্য ছিলেন কিনা তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। রাঢ়ের সামন্ত কবিশূর যে দরদ্‌দেশাগত সে কথা তো আগে বলেছি। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জয়ন্ত, কনৌজের বীরসিংহ, কোলাঞ্চের চন্দ্রকেতু প্রভৃতি নূতন যে সব কায়স্থ শাসকের নাম এই সময়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর ভেসে ওঠে তাঁরা মূলে কোথাকার অধিবাসী ছিলেন তা বলা শক্ত। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কায়স্থগণ আর্য্যাবর্ত্তের সর্বত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আদিশূর

কবিশূরের পৌত্র আদিশূর যখন রাঢ়ের অধীশ্বর সেই সময়ে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় রাজ্যহারা হয়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এসে আশ্রয় নেন। তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলা হয়েছে গৌড়েশ্বর, আবার বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থে আদিশূর গৌড়েশ্বর। একই সময়ে দুইজন গৌড়েশ্বরের উপস্থিতি দেখে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, উভয়ে একই ব্যক্তি—জয়ন্ত আদিশূরের বিকল্প নাম। এই অনুমানের ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল। রাঢ় যেমন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নয়, জয়ন্ত তেমনি আদিশূর নন। আদিশূরের গৌড় রাঢ়, জয়ন্তের গৌড় পুণ্ড্রবর্দ্ধন। দুজনে দুই স্বতন্ত্র জনপদ শাসন করতেন।

ললিতাদিত্যের মহাপ্রয়াণের পর উত্তরাধিকারীদের অকর্মণ্যতার জন্য তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য যখন শূন্যে মিলিয়ে যায় সেই সময়ে অন্যান্য সামন্ত রাজ্যগুলির মত রাঢ়ও স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য যে মূল্যের প্রয়োজন তার হাত থেকে শূররাজগণ রেহাই পান নি। একের পর এক প্রতিবেশী রাজা এসে রাঢ় আক্রমণ করে তাঁদের

অবস্থা দুর্বিসহ করে তোলে। কবিশূর ও মাধবশূরের রাজত্ব এই সব বহিরাক্রমণের ভিতর দিয়ে কেটে যায়। আদিশূরের অভিষেকের সময়ে রাঢ় এক স্বতন্ত্র রাজ্য। স্বাধীন রাঢ়ের তিনি প্রথম অধীশ্বর।

তাঁর যাত্রাপথ কুসুমাবৃত ছিল না। সর্বানন্দ মিশ্র লিখেছেন, 'তিনি স্বদেশী ও বিদেশী বহু রাজা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, রাজভাট বংশীয়দের অধিকৃত কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব ও গুর্জর দেশের নরপতিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের অধিপতি ব্যতীত অন্য সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল।'[২] এই দিগ্বিজয়ের কাহিনী বহুলাংশে স্তুতিবাদ হোলেও আদিশূর যে একাধিক বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধজয় তালিকা থেকে কান্যকুব্জ বাদ দেবার কারণ এই যে তাঁর রাজ্যাভিষেকের বেশ কিছু কাল পূর্বে ললিতাদিত্য ওই রাজ্যটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুই সামন্তের হস্তে অর্পণ করেন। উভয় রাজ বংশ ছিল তাঁর আত্মীয়। তিনি বিবাহ করেছিলেন কান্যকুব্জরাজ চন্দ্রদেবের কন্যা চন্দ্রমুখীকে; অপর কনৌজের অধীশ্বর বীরসিংহের সঙ্গেও অনুরূপ কোনও সম্পর্ক ছিল।[৩] এক সময়ে রাজ্য দুইটির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে আদিশূর শ্বশুরের সাহায্যার্থে সসৈন্যে কনৌজ যান। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নি; তাঁর আগমনের ফলে বীরসিংহ নিরস্ত হন।*

আদিশূর গৌড় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। দরদ্‌দেশাগত সামন্ত কবিশূরকে দিয়ে যে বংশের যাত্রা সুরু হয়েছিল তাঁর সময়ে তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তিনি রাঢ়কে কার্কোটা বংশের আধিপত্য থেকে মুক্ত করে একাধিক বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করেন। পৌরাণিক যুগের সিংহবাহুর পর জনপদটি এই প্রথম স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠার উপর ভেসে ওঠে। এজন্য অবশ্যই তিনি গৌরব

* আদিশূরস্তদা তস্য সভাসম্মন্ত্রিণাং বরঃ।
সহায়ঃ শ্বশুরশ্চৈব বীরসিংহ নিরস্তবান্॥—লঘুভারত, পৃঃ ৩২৮

দাবী করতে পারেন কিন্তু গৌড়-বঙ্গের সকল নরনারী যে আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তার মূলে রয়েছে তাঁর আদর্শ শাসনপ্রণালী ও সুদূরপ্রসারী সমাজ সংস্কার।

পরবর্তী শূররাজগণ

আদিশূরের মৃত্যুর পর রাণী চন্দ্রমুখীর গর্ভজাত পুত্র ভুশূর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঢ় তখন এক শক্তিশালী রাজ্য; কিন্তু উত্তর সীমান্তের ওপারে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে চলছে বিশৃঙ্খলা। অপুত্রক জয়ন্তের মৃত্যু হওয়ায় ওই রাজ্য এখন অভিভাবকশূন্য। সেই সুযোগে ভূশূর সহজে রাজ্যটি আত্মসাৎ করেন। তারপর থেকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বরেন্দ্র নামে পরিচিত হয়। এরূপ নাম পরিবর্তনের কারণ অজ্ঞাত। শতাব্দীকাল পূর্বে হিউয়েন-সাং এখানে এসে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন তাতে নূতন নাম স্থান পায় নি। তারপর কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যখন এখানে এসে আত্মগোপন করেন তখনও জনপদটি আগেকার নামে পরিচিত। শূরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের গর্ভ থেকে বরেন্দ্র কেন ভূমিষ্ঠ হোল তার কোনও লিখিত বৃত্তান্ত কোথাও নেই। এ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী যে কয়টি বিবরণ রয়েছে তার কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পিতৃরাজ্যের সম্প্রসারণ সাধন করলেও পিতার প্রতিভা ভূশূরের মধ্যে ছিল না। তাঁর শত্রু গোকুলে বাড়ছিল। প্রতিবেশী এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি গোপালের পুত্র ধর্মপাল তাঁকে বরেন্দ্র থেকে দূরীভূত করে রাজ্যটি অধিকার করে নেন। পালশক্তির সঙ্গে শূর বংশের সেই যে সংঘর্ষ সুরু হয় দীর্ঘ দিন ধরে তা চলতে থাকে। এক সময়ে শূররাজগণ তাঁদের রাজধানী সিংহেশ্বর থেকে শূরনগরে সরিয়ে আনেন। উত্তর-রাঢ় উভয় শক্তির রণভূমিতে পরিণত হয়। ভূশূরের পুত্র অবনীশূর এই ভূভাগটি পালদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার

করেন, কিন্তু ধর্মপালের পুত্র দেবপাল আবার এখান থেকে শূরশক্তির অবসান ঘটান।

শূর বংশকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বোধ হয় প্রথম স্থান দেন আকবরের সভাসদ আবুল ফজ্‌ল আলামি। আইন-ই-আকবরীতে সদ্যগঠিত মোগল সাম্রাজ্যের ১৫টি সুবার ঐতিহাসিক কাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আদিশূর ও তাঁর ১০জন বংশধর সুবা বাংলার উপর ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।[৪] সাকুল্যে এই এগার জন শূররাজের পরিচয়—

নাম	রাজত্বকাল
আদ্‌শূর	৭৫ বৎসর
যামিনীভান্‌	৭৩ ,,
অন্‌রুধ	৭৮ ,,
পন্‌তাপরুদ্দেব	৬৫ ,,
ভবদত্ত	৬৯ ,,
বেকদাস	৬২ ,,
গিবধর	৮০ ,,
পৃথ্বীধব	৬৮ ,,
সৃষ্টিধর	৭৮ ,,
পরভাকর	৬৩ ,,
জয়ধর	২৩

হিন্দু নাম ফারসী পুঁথির পৃষ্ঠায় উঠে চিরদিনই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। পৃথ্বিরাজ হয়েছেন পিথুরায়, লক্ষ্মণসেন রায় লছ্‌মনিয়া! সেই অপরূপ নামগুলি আবার যখন ইংরাজীতে তর্জমা করা হয় তখন দুধ থেকে জল বার করবার উপায় থাকে না! সময় তালিকাগুলিও কৌতুহলোদ্দীপক। জয়ধর বাদে কোন শূররাজই ৬২ বৎসরের কম রাজত্ব করেন নি। বাদশাহের সভাসদের বাদশাহী সময়! অবশ্য এরূপ দীর্ঘ রাজত্বকাল দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কারণ আবুল

ফজল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকে ভারতের ইতিহাস রচনা সুরু করেছিলেন বলে প্রতি রাজার আয়ু কিছু বাড়িয়ে না দিলে জমা খরচের মিল রাখতে পারতেন না !

আইন-ই-আকবরী একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থে জ্ঞাতব্য বিষয় বহু থাকলেও শূর বংশের সময় তালিকায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ বিষয়ে কহ্লন পণ্ডিত অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। তাঁর বর্ণনা অনুসারে ললিতাদিত্য ৭৩২ খৃষ্টাব্দে উত্তরকুরুতে মহাপ্রয়াণ করেন। এর পূর্বে কোনও সময়ে কবিশূর রাঢ়ের আধিপত্য লাভ করেছিলেন।

কবিশূর ছিলেন ললিতাদিত্যের সামন্ত—মাধবশূর মহাসামন্ত। তাঁর অভিষেকের সময়ে কার্কোটা সাম্রাজ্যের যে ভাঙন সুরু হয় সেই সুযোগে তিনি প্রায়-স্বাধীনভাবে রাঢ় শাসন করতে থাকেন। তাঁর পুত্র আদিশূর মৌখিক আনুগত্যটুকু পর্য্যন্ত ত্যাগ করে স্বরাজ্যের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। সেই কারণে কুলাচার্য্যদের চক্ষে তিনিই প্রথম শূররাজ। আবার তাঁর অধস্তন সপ্তম পুরুষে অনুশূরের পর এই বংশের পতন সম্পূর্ণ হয় বলে অনুশূরকে তাঁরা শেষ শূররাজ বলে মনে করেন।* তার পরও সঙ্কুচিত এক জনপদের উপর তাঁদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তখন ভার থাকলেও ধার নেই !

পূর্বে বলেছি ভূশূরের সময়ে (৭৪৩-৮১৫) সদ্যোত্থিত পালশক্তির সঙ্গে শূররাজগণের বৈরীতার সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে হিমালয়ের ওপারে থেকে তিব্বতীগণ এসে উভয় শক্তিকে পরাভূত করে সমগ্র গৌড়ে এক প্লাবনের সৃষ্টি করে। দুঃসহ আবহাওয়ার জন্য হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক তারা বিদায় নিলে রাঢ়ের শূর ও গৌড়ের পাল-রাজগণ আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অজয়ের

* আদিশূরোভূশূরোশ্চ ক্ষিতীশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণীশূরঃ কশ্যাপি ধরাশুরঽনুশূরকঃ ॥
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তা ক্রমশঃ স্মৃতবর্ণিতা।...
—রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী

উত্তরদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ পালশক্তির অধিকারভুক্ত হয়; শূররাজগণ বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের প্রাধান্য মেনে নেন।

প্রথমে তিব্বতী ও পরে পালদের কাছে পরাজয়ের ফলে শূর বংশের দুর্বলতা প্রতিভাত হয়ে উঠলে দক্ষিণ থেকে নূতন কোনও শক্তি এসে রাঢ়ের একাংশ অধিকার করে নেয়। তার ফলে আদিশূর যে ক্ষেত্রে কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দু'জনকে মানভূম ও মেদিনীপুর জেলায় দুইখানি গ্রাম দান করেছিলেন, ক্ষিতীশূর প্রদত্ত সকল শাসনগ্রাম সেক্ষেত্রে রূপনারায়ণের উত্তরে অবস্থিত। ওই নদীর দক্ষিণে সকল ভূভাগ ইতিমধ্যে শূরবংশের হাতছাড়া হয়েছিল।

উত্তর রাঢ় কিন্তু পুনরধিকৃত হয়। তৃতীয় পালরাজ বিগ্রহপালের সময়ে পশ্চিমে রাষ্ট্রকূট ও হৈহয় এবং উত্তরে তিব্বতীগণ কর্তৃক গৌড়রাজ্য পুনরায় বিপন্ন হোলে অবনীশূরের পুত্র ধরণীশূর (৮৭০-৯০৫) পাল শক্তির সেই বিপদের সুযোগ নিয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। গঙ্গাতীরবর্তী সিংহেশ্বরে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ধরাশূরের রাজত্বকাল (৯০৫-৩৫) অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটে। সকল সীমান্ত তখন সুরক্ষিত, তাই তিনি আদিশূর প্রবর্তিত সমাজ সংস্কারের ধারা চালিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগী হন। শুচিতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিচারে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে কুলাচল্ল ও সচ্ছোত্রীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন নূতন কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন।

যামিনীশূরের সময়ে (৯৩৬-৯৬৫) শূররাজ্যের উপর উত্তর সীমান্ত থেকে আবার নূতন করে আক্রমণ আসতে থাকে। এবার পাল বাহিনীর কাছে বারবার পরাজিত হয়ে শূর শক্তি শেষ পর্য্যন্ত গড়-মান্দারণে এসে আশ্রয় নেয়। স্থানটি হুগলী জেলার জাহানাবাদ থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 'অদ্যাপি পর্য্যটক গড়-মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের

নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধুলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে।'[৫] এখানে ভিতরগড় নামে যে প্রাচীন অট্টালিকারাজির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় সেখানে ছিল শূর বংশের শেষ রাজধানী—অপার মন্দার।

যামিনীশূরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নারায়ণপাল যে কতখানি লাভবান হয়েছিলেন তা বলা শক্ত। শূররাজ যদি বা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন, তাঁর অধীনে যে সব সামন্ত বংশ রাঢ়ের স্থানে স্থানে রাজত্ব করত তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে জয়যান ও পাঁচথুপির ঘোষ বংশ, ফতেসিংহের সিংহ বংশ, ঢেক্করীর ঘোষ বংশ, বীরভূমের মিত্র বংশ, দক্ষিণখণ্ডের ঘোষ বংশ, সিঙ্গুর ও জগদ্দলের পাল বংশ এবং ভুরিশ্রেষ্ঠীর দাশ বংশ প্রধান। না পাল, না শূর কোন শক্তির পক্ষে এই সামন্তগণকে বশীভূত করা সম্ভব হয় নি। উভয় অধিরাজের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে তাঁরা নিজ নিজ অধিকারের উপর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। রাঢ় কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

রাজ্যগুলির মধ্যে ভুরিশ্রেষ্ঠীর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই সময়ে চান্দেল্ল রাজকবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই রাজ্যের রাজধানীকে এক ঐশ্বর্য্যশালী নগরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬] সমসাময়িক পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা ও বিক্রমশীলা যেমন বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভুরিশ্রেষ্ঠী নগরীও তেমনি স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র চর্চার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভুরিশ্রেষ্ঠীপতি পাণ্ডুদাশের রাজত্বকালে শ্রীধরাচার্য্য ন্যায়কন্দলী নামক সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সামন্তবংশগুলির অনেকে শূররাজগণের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে

আবদ্ধ হোলেও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষার অন্ত ছিল না। সেই কারণে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে মধ্য-ভারত থেকে চন্দ্রাত্রেয় বা চান্দেল্লরাজ যশোবর্মার পুত্র ধঙ্গদেব যখন রাঢ় আক্রমণ করেন তখন তাঁকে প্রবল কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। কোন সামন্ত-রাজই নিজ অধিরাজের পিছনে দাঁড়াবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বরং সিঙ্গুর ও জগদ্দলের পাল বংশ বোধ হয় আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিল। খাজুরাহোর মরকতেশ্বর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ এক শিলা-লিপিতে এই রাঢ়ী সামন্ত বংশকে যে সম্মানিত করা হয়েছে তার অন্য কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ধঙ্গদেব অবলীলাক্রমে গড়-মান্দারণ অধিকার করে রাঢ়াধীশ ও তাঁর মহিষীকে বন্দী করে স্বরাজ্যে নিয়ে যান।

রাঢ়ের দুঃখ এখানে শেষ হয় নি। কিছু কাল পরে দ্রাবিড় দেশ থেকে রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যবাহিনী এসে যখন দক্ষিণ রাঢ় আক্রমণ করে রণশূর তখন বীর বিক্রমে লড়েও শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন। তার কিছুকাল পরে এই মহান বংশের উপর পড়ে শেষ যবনিকা।

উজ্জ্বল কুল—উজ্জ্বল যুগ

শূর বংশের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সর্বানন্দ মিশ্র লিখেছেন, 'পূর্বে উজ্জ্বলকুলসম্ভূত মাধবশূর নামক ভূপতির পুত্র দানশীল কুলীন মহারাজা আদিশূর গৌড় দেশে আধিপত্য করিতেন। তিনি তৎকালীন শত্রুপক্ষকে নিজ ভুজবলে জয় করিয়াছিলেন। নানা দেশদেশান্তরীয় নরপতিসমূহ পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণে মুকুট স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতেন।'

আদিশূরের অভিষেককালে রাঢ় ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রক্তহীনতায় তার সমাজদেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছিল। সেই বিবর্ণ দেহে নূতন রক্তের সঞ্চার করে মুমূর্ষু রোগীকে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত

থেকে বাঁচান। তাঁর বংশকে উজ্জ্বল কুল আখ্যা দেওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে।

সমগ্র শূর যুগই উজ্জ্বল যুগ। গৌড়-বঙ্গের সমাজ ব্যবস্থার যে রূপ এখন আমরা দেখতে পাই এই যুগে তা রচিত হয়। এখনকার গগনচুম্বি প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন আদিশূর ও তাঁর বংশধরগণ। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে শাসনদণ্ড পরিচালনার পর ৭৮২ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয় রাঢ় তখন ভারতের এক সমৃদ্ধতম অঞ্চল। তিনি এক যুগের রাজা নন—যুগ যুগান্তরের। যে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত তিনি করে গিয়েছিলেন কালক্রমে তা রাঢ় ছাড়িয়ে সমগ্র পূর্ব ভারতের জীবন-যাত্রাকে গরিমাময় করে তোলে।

১ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৯

২ সর্বানন্দ মিশ্র, কুলতত্ত্বার্ণবঃ, পৃঃ ২

৩ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ, পৃঃ ৮৬

4 Abul Fazle Allami *Ain-i-Akbari, Gladwins' trans., p. 313*

৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গেশনন্দিনী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৬ কৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্, দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃঃ ৫৮

উনবিংশ অধ্যায়

রাঢ়ের সমাজ বিপ্লব

কোলাঞ্চ দেশাগতা বিপ্রাঃ

আদিশূরের ছিল সমস্যা। পিতা ও পিতামহ এক সদ্য-স্বাধীন রাজ্য তাঁর হাতে সমর্পণ করে গেছেন, অথচ লোকবলের একান্ত অভাব। কান্যকুব্জ ও নালন্দায় বহু দিন ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সাধনা চলছিল তার কণামাত্রও এই রাজ্যে এসে পৌঁছায় নি। প্রজাপুঞ্জ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। তাদের কৃষ্টি নেই, চেতনাবোধ নেই, উচ্চাকাঙ্খা নেই। শিক্ষার অভাব সর্বব্যাপী। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী পাওয়া যায় না, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মেলে না। দৈন্য অন্দরে কন্দরে। যে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণীয় নরনারী রাঢ়ে রয়েছে তারা বিদ্যাচর্চায় বিরত। অন্যান্য সম্প্রদায়ও নিরক্ষর। পয়সা দিলে ব্রাহ্মণগণ দেবমন্দিরে মন্ত্র পড়ে, আবার বৌদ্ধবিহারে গিয়ে সূত্রও আওড়ায়!

তাই আদিশূর তাঁর অভিষেকের চতুর্দশ বর্ষে কয়েকজন শক্তিমান ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে স্বরাজ্যে আনেন। তাঁদের আগমনের ফলে রাঢ়ের সমাজ জীবন নূতন রূপ ধারণ করে। সমগ্র গৌড় ইতিহাসে এত বড় তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা আর কখনও ঘটে নি বলে সকল কুলজীগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী মতে বেদবানাঙ্গ শাকে, অর্থাৎ ৬৫৪ শকাব্দে, আদিশূর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে, অর্থাৎ ৬৬৮ শকাব্দে ব্রাহ্মণরা গৌড়ে আসেন।*

* বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্ছাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ॥

এই ব্রাহ্মণগণ এসেছিলেন কোলাঞ্চ দেশ থেকে। দেশটির অবস্থান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমাদের বিবেচনায় দ্বিধাবিভক্ত কনৌজের যে অংশে আদিশূরের শ্বশুর চন্দ্রদেব রাজত্ব করতেন সেইটি মূল কনৌজ ; বীরসিংহ শাসিত পূর্বার্দ্ধটি কোলাঞ্চ। শতাব্দীকাল পূর্বে মৌখরি রাজগণের সময় থেকে সমগ্র অঞ্চলটির তারকা সেই যে উর্দ্ধমুখী হতে থাকে পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও তাতে ছেদ পড়ে নি। এখানে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বাস করতেন, বিদ্যানুশীলন ব্যাপকভাবে হোত। সেই কারণে রাণী চন্দ্রমুখীর পরামর্শ অনুসারে আদিশূর তাঁর আত্মীয় বীরসিংহের কাছে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও রাজনীতিজ্ঞ কায়স্থ চেয়ে দূত পাঠান।

একই সময়ে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর দেশবিদেশে মনীষার সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কয়েক-জন দার্শনিক কাশ্মীরে গিয়ে পাতঞ্জলির মহাভাষ্যের সংস্কার করেন। তিনি নিজে অবসর সময়ে পণ্ডিত ক্ষীরার কাছে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতেন। মনোরথ, শঙ্খদন্ত, দামোদর, সন্ধিমান প্রমুখ এত পণ্ডিত ভারতের সকল অঞ্চল থেকে এসে জয়াপীড়ের সভায় সমবেত হয়েছিলেন যে সর্বত্র পণ্ডিতের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[১]

রাঢ়াধীশ আদিশূর ও কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পরস্পরের বিদ্যোৎ-সাহীতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিনা কে জানে! হয় তো বা তাঁরা দূর থেকে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছিলেন। একই সময়ে উভয় রাজ্যে এত বিদগ্ধজনের আগমনের অন্য কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী দেবশর্মা ছিলেন

* ক্ষিতিশাদিদ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চরক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এব চ ॥ ৮২
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্যধর্ম্মিণঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ ॥ ৮৩—কুলতত্ত্বার্ণবঃ

ব্রাহ্মণ ; কিন্তু বামন, জয়দত্ত প্রভৃতি কায়স্থগণ তাঁর মন্ত্রীত্ব করতেন। উর্দ্ধতন রাজপুরুষরা অধিকাংশই ছিলেন এই বর্ণভুক্ত। আদিশূরও অনুরূপভাবে প্রজাদের কৃষ্টিজীবন উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও রাজ্য পরিচালনার জন্য পাঁচজন কায়স্থকে স্বরাজ্যে আনেন।

কুলাচার্য্যগণ বলেন যে কোলাঞ্চরাজ প্রেরিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ যখন আদিশূরের রাজধানীতে এসে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন তখন তাঁদের পাণ্ডিত্য দেখে রাঢ়পতি বিস্ময়ে অভিভূত হন। কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়তে হোলে এমনি সব শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন! যজ্ঞ সম্পাদনের পর ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে ফিরে গেলে তিনি পুনরায় বীরসিংহের কাছে দূত পাঠান। সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁর চাই, তাঁদের তিনি স্থায়ীভাবে স্বরাজ্যে স্থাপনের অভিলাষী। অনুরূপ শক্তিমান কয়েকজন কায়স্থেরও প্রয়োজন। ভিন্ন রাজ্যের অধীশ্বরের মুখে নিজ প্রজাদের প্রশংসা শুনলে কোন রাজার মন না হর্ষোৎফুল্ল হয়? গৌড় দূতকে বিদায় দিয়ে বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণকে আদেশ দিলেন সপরিবারে রাঢ়ে যাবার জন্য। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করে তাঁরা এক দিন দেশ থেকে যাত্রা করলেন। কায়স্থগণ আসেন গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণগণ গো-যানে—

> গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
> গোযানারোহিনা বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমান্বিতাঃ।
> খড়্গচর্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

পঞ্চব্রাহ্মণের পরিচয়

প্রধান অর্থাৎ কায়স্থদের কথা পরে অলোচনা করা হবে। ব্রাহ্মণগণ এসেছিলেন জনসাধারণের কৃষ্টিজীবনের উন্নয়নের জন্য। শূররাজ্যের সর্বত্র গিয়ে তাঁদের জ্ঞানের আলো জ্বালতে হবে। তাঁরা অন্ধকে দেবেন দৃষ্টি, বধিরকে শ্রবণশক্তি। তাই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে রাজধানীতে আটকে না রেখে রাঢ়াধীশ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে

দেন। পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁদের প্রত্যেককে একখানি করে গ্রাম দেওয়া হয়, কিন্তু তীর্থাবাস ও অধ্যাপনার স্থান নির্দিষ্ট হয় স্বতন্ত্র এক অঞ্চলে। সংসার বন্ধন যেন তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন উৎপাদন করতে না পারে! বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে পরিচয় দেওয়া আছে এখানে তা উদ্ধৃত করা হোল—

১। ক্ষিতীশ

পিতা—অজ্ঞাত
গোত্র—শাণ্ডিল্য
বসতিস্থান—পঞ্চকোট, মানভূম
তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী—কালিঘাট।

২। বীতরাগ

পিতা—রত্নাকর
গোত্র—কাশ্যপ
বসতিস্থান—কামকোটী, বীরভূম
তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী—ভর্তিপুর, মালদহ।

৩। সুধানিধি

পিতা—উষাপতি
গোত্র—বাৎস্য
বসতিস্থান—হরিকোটী, মেদিনীপুর
তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী—ত্রিবেণী।

৪। মেধাতিথি

পিতা—দিণ্ডি
গোত্র—ভরদ্বাজ
বসতিস্থান—কঙ্কগ্রাম, বাঁকুড়া
তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী—অগ্রদ্বীপ, বাঁকুড়া।

৫। সৌভরি

পিতা—শ্রীমান্ প্রিয়ঙ্কর
গোত্র—সাবর্ণ
বসতিস্থান—বটগ্রাম, বর্দ্ধমান
তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী—গুপ্তিপাড়া, হুগলী।

আদিশূরের ব্যবস্থানুযায়ী সন্নিহিত অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ এসে ব্রাহ্মণপঞ্চকের কাছে অধ্যয়ন করত এবং শিক্ষা সমাপনের পর নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে টোল খুলত। সেখানেও ছাত্রদের আহার-অধ্যয়নের ব্যয়ভার রাজ সরকারের। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে শূররাজ্য চতুষ্পাঠী ও টোলে ভরে ওঠে; প্রবর্তকের জীবদ্দশাতেই রাঢ়ের সকল অঞ্চল বিদ্যার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণ

কান্যকুব্জাগত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ সকল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বীজপুরুষ হোলেও গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ নন—শেষও নন। তাঁদের আগমনের পূর্বে এখানে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল—পরেও নূতনতর ব্রাহ্মণ এসেছে। অচ্ছ্যুৎ-যাজন এবং শাস্ত্রাধ্যয়নে বিরতির ফলে পূর্বতন ব্রাহ্মণগণ কিছুটা পতিত হয়েছিল বলে নবাগতরা তাদের ঘৃণার চক্ষে দেখত; অধঃপতিত স্ববর্ণীয়দের আত্মোন্নয়নে সাহায্য করবার পরিবর্তে দূরে সরিয়ে রাখত। সেই হতভাগ্যগণ সম্বন্ধে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ পরে লেখেন যে তারা আসলে শুদ্র, আদিশূর তাদের ব্রাহ্মণ সাজিয়ে যুদ্ধজয়ের পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন!

এই সপ্তশতী বা সারস্বত ব্রাহ্মণদের মূল বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার সাতশৈকা পরগণা। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তারা নবাগতদের সঙ্গে মেশবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। শূর রাজগণও উভয় শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদানে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত! শুদ্র-ব্রাহ্মণের সঙ্গে কাজ করবে সাগ্নিক দ্বিজগণ? তাঁরা মাঝে মাঝে সপ্তশতীদের ঘর থেকে কন্যা নিতেন—কিন্তু দিতেন না। তাও কন্যার যথেষ্ট রূপ বা তার পিতার প্রচুর বিত্ত থাকলে!

তাতেই সপ্তশতীগণ কৃতার্থ! এইভাবে কন্যাদান করে সেই হীন

ব্রাহ্মণদের একাংশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজে মিশে গেছে; একাংশ মনোকষ্টে দেশত্যাগী হয়েছে; অপর একাংশ পরে ধর্মান্তর গ্রহণ করে অপমানের জ্বালা জুড়িয়েছে। যারা এখনও অবশিষ্ট আছে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তারা অচ্ছ্যুৎ বাড়ীতে যজন-যাজন করে এবং যজমানদের সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রার পার্থক্য বিশেষ রাখে না। তিন শতাব্দী পূর্বে নুলো পঞ্চানন* সপ্তশতীদের হীনাবস্থার কথা করুণ ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। এখনও তারা তাই। তাদের অনেকে অগ্রদানী ও গ্রহাচার্য্য; কিছু পাচকও আছে।

বৈদ্য জাতির উদ্ভব

পাচক অবশ্য রাঢ়ীদের মধ্যেও আছে। কিন্তু সব রাঢ়ী যেমন পাচক নয়, সব সপ্তশতী তেমনি অগ্রদানী বা গ্রহাচার্য্য নয়। সর্বানন্দ মিশ্রের মতে অন্ধ্রাধিকারের সময়ে মহারাজ শুদ্রক সপ্তশতীদের আদি পুরুষকে সারস্বত দেশ থেকে গৌড়ে আনেন।[২] এই সারস্বত দেশ যে কোথায় তা বলা শক্ত। আদিশূরের সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল বটে, শাস্ত্রহীন হয় নি। জীবিকার জন্য অনেকে আয়ুর্বেদ চর্চা করত; চিকিৎসা ব্যবসায় ছিল তাদের করতলগত। যাজক প্রতি-বেশীরা নবাগতদের অবজ্ঞা সইতে পারে, ভূম্যধিকারীরা তাদের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে ময়ূরপুচ্ছে দেহ ঢাকতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের সত্ত্বা ত্যাগ করবে কেন? তারা ছোট কিসে?

চিকিৎসা ব্যবসায়ী এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কনৌজাগত সাগ্নিক বিপ্রদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবার কারণ হয় নি। আবার যে সব সপ্তশতী সমাজ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম

* নুলো পঞ্চানন—তেজস্বী কুলাচার্য্য। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার নিকটবর্তী ইছাপুর-বরাহকুলীর চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশজ। হস্ত দুর্বল বলে নুলো। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠি কথা একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

চালাচ্ছিল বা যারা আচারভ্রষ্ট হয়ে হীনাবস্থায় নেমে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও সম্ভব নয়। সেই কারণে এই ভিষক-ব্রাহ্মণগণ নিজেদের চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য আবরণ রচনা করে দিনাতিপাত করতে থাকে। কয়েক পুরুষ এইভাবে কাটবার পর তারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তখন বৃত্তির পরিচয়ে তাদের পরিচয়—বর্ণের পরিচয়ে নয়।

এমনি এক উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্য সম্প্রদায় অন্য কোনও প্রদেশে নেই বলে অনেকের ধারণা যে গৌড়-বঙ্গের এই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মিলনের ফল। বৈদ্যকুলতিলক ভরত মল্লিক[৩] এবং ডাকের রচয়িতা আনন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত[৪] অনুরূপ মত সমর্থন করে লিখেছেন যে ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বৈশ্যা মাতার গর্ভে তাঁদের সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এ যুক্তি অচল! হিন্দু সমাজের গঠন ও বিবাহপদ্ধতি এরূপ কোন সঙ্কর বর্ণ সৃষ্টির সুযোগ দেয় না।

ভরত মল্লিক বা দাশগুপ্ত মহাশয় যাই বলুন, সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের ন্যায় গোঁড়া ব্রাহ্মণও স্বীকার করেছেন যে বৈদ্যগণ সত্য ও ত্রেতায় ব্রাহ্মণ ছিল, দ্বাপরে অধঃপতিত হতে হতে কলিতে এসে একেবারে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। কবে সত্য-ত্রেতা গেল এবং দ্বাপর এল তা জানি না, তবে বৈদ্যগণ যে সঙ্কর বর্ণ নয় এই উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য তারা শূদ্র! কিন্তু রঘুনন্দনপন্থীদের মতে কলিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই তো শূদ্র।

পূর্বকথিত সম্বন্ধ-নির্ণয়ে দেখা যায় যে রাঢ়ী বৈদ্যগণ শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম ও সাতশৈকা এই তিনটি সমাজে বিভক্ত। সাতশৈকা সমাজ! এই নামীয় সমাজ তো অন্য কোনও বর্ণের মধ্যে নেই। নামটির মধ্যে গৌড়ের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ সপ্তশতীদের অস্তিত্ব উঁকি মারছে। তাদের এক শাখা যেমন অগ্রদানী বা গ্রহাচার্য্যের কাজ করে, অন্য শাখা তেমনি বৈদ্য সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। বর্ণ

হিসাবে পতিত হওয়ায় সে পরিচয় বর্জন করে তারা বৃত্তির পরিচয়ে গৌড় ও বঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

পঞ্চ কায়স্থের পরিচয়

আদিশূর বুঝেছিলেন যে প্রজাসাধারণকে অজ্ঞতার হাত থেকে বাঁচাতে হোলে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিও অপরিহার্য্য। রাষ্ট্র শক্তিশালী না হোলে তাঁর পরিকল্পিত স্বর্ণসৌধ নির্মিত হবে বালির বাঁধের উপর। তাই তিনি ব্রাহ্মণদের দেখিয়েছিলেন সম্মান, কিন্তু কায়স্থদের দিয়েছিলেন পদোচিৎ মর্য্যাদা। সে আজ বারো শ' বৎসর পূর্বেকার কথা। উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীর সংখ্যা এখন বহু লক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তারা আজও পরস্পরের উপর ঠিক তেমনি নির্ভরশীল যেমনটি ছিল রাঢ়ে প্রথম আগমনের সময়ে। যে গ্রামে কায়স্থ আছে সে গ্রামে ব্রাহ্মণও আছে; যে গ্রামে কায়স্থ নেই সেখানে ব্রাহ্মণ নেই। উভয় সম্প্রদায়ের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ লক্ষ্য করে কুলাচার্য্যদের কেউ বা লিখেছেন যে কায়স্থগণ এসেছিলেন পঞ্চব্রাহ্মণের প্রহরীরূপে, কেউ বা লিখেছেন দাসরূপে, আবার কেউ বা লিখেছেন শিষ্যরূপে। কিন্তু কোন অনুমান নির্ভুল নয়। কারণ পঞ্চব্রাহ্মণ যে ক্ষেত্রে এসেছিলেন গোযানে সেক্ষেত্রে কায়স্থদের মধ্যে তিনজন এসেছিলেন অশ্বে, একজন গজে এবং একজন শিবিকায়।* গোযানারোহীর প্রহরী বা শিষ্য অশ্ব, গজ বা শিবিকায় পথ চলতে পারে না।

বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণগুলির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কায়স্থদের সাক্ষাৎ মেলে বহু পরে। তাই তাদের নিয়ে কুলাচার্য্যগণের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কারও মতে তারা

* গোযানেনাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

—দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটকারিকা

ক্ষত্রিয়, আবার কারও মতে শূদ্র। তবে সাধারণ শূদ্র নয়—সৎশূদ্র! কিন্তু কায়স্থ—কায়স্থ; আর কিছুই নয়। এই মূল কথাটি উপেক্ষা করে এক দিকে কায়স্থ নেতাগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় এবং অন্য দিকে পুরোহিতগণ তাদের শূদ্র প্রতিপন্ন করবার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন! পঞ্চকায়স্থের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁর মিশ্রকারিকায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা হোল—

১। মকরন্দ ঘোষ
গোত্র—সৌকালীন
বংশ—সূর্য্যধ্বজ।

২। দশরথ বসু
গোত্র—গৌতম
বংশ—চেদি।

৩। কালিদাস মিত্র
গোত্র—বিশ্বামিত্র
বংশ—চন্দ্র।

৪। বিরাট গুহ
গোত্র—কাশ্যপ
বংশ—অগ্নিকুল

৫। পুরুষোত্তম দত্ত
গোত্র—মৌদ্গাল্য
বংশ—শকসেন

মকরন্দাদির নামের সঙ্গে যে পদবীগুলি যুক্ত রয়েছে এখন সেগুলি সুপরিচিত হোলেও তাঁদের নিজেদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। কবে বা কেমন করে যে এগুলির উদ্ভব হয়েছে কেউ তা বলতে পারে না। ব্রাহ্মণদের পদবীগুলির মত এগুলি বোধ হয় গ্রামভিত্তিক নয়। কিন্তু এগুলি কি? কান্যকুব্জের সাক্সেনা গৌড়ে এসে কেন ঘোষ

হোল বা শ্রীবাস্তব কেন বসু হোল তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজন আছে।

পূর্বে বলেছি, কায়স্থগণ এসেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় আদিশূরকে সাহায্য করতে। সেই কারণে ব্রাহ্মণদের ন্যায় তাঁদের গ্রামাঞ্চলে যাবার প্রয়োজন হয় নি। পুরুষোত্তম বাদে অন্য চারজন রাজধানীতে অবস্থান করে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করতেন এবং সমগ্র রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির রূপ দান করবে কে? কাজকর্ম বাড়বার সঙ্গে নূতন নূতন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সব কর্মীদের অনেকেই ছিলেন কায়স্থ। তাঁদের মধ্যে যে তেইশজন রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন প্রাচ্য-বিদ্যার্ণবের সংগ্রহ থেকে তাঁদের পরিচয় এখানে দেওয়া হোল—

	নাম	গ্রাম
১।	পুরুষোত্তম দত্ত	বটগ্রাম
২।	শিখিধ্বজ দেব	মণিকোটী
৩।	জয়ধর সেন	মল্লকোট
৪।	বীরবাহু সিংহ	সিংহপুর
৫।	ভূমিঞ্জয় কর	লক্ষ্মীপুর
৬।	চক্রধর পালিত	কুমার
৭।	দেবদত্ত নাগ	মল্লপুর
৮।	চন্দ্রভানু নাথ	পদ্মদীপ
৯।	চন্দ্রচূড় দাস	লোহিত
১০।	চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র	নন্দীগ্রাম
১১।	জয়পাল	দেবগ্রাম
১২।	রিপুঞ্জয় রাহা	বাটাজোড়
১৩।	বীরভদ্র ভদ্র	স্বর্ণগ্রাম
১৪।	দণ্ডধর ভড়	দক্ষপুর

১৫।	তেজধর নন্দী	মাণ্ডব
১৬।	বশিষ্ট কুন্ত	ভল্লকোটী
১৭।	ভদ্রবাহু সোম	শম্ভুকোটী
১৮।	ইন্দুধর রক্ষিত	মৎস্যপুর
১৯।	ভুধর দাশ	কেশিলী
২০।	হরিবাহু অঙ্কুব	মেঘনাদ
২১।	লোমপাদ বিষ্ণু	ভল্লকুলী
২২।	বিশ্বচেতা আঢ্য	সিন্ধুরাঢ়
২৩।	মহাবীব নন্দন	শূরপুর

গ্রামগুলি সব রাঢ়ে অবস্থিত। ব্রাহ্মণগণকে যেভাবে শাসন গ্রাম দান করা হয়েছিল কায়স্থরা সেভাবে এগুলি লাভ করে নি। কায়স্থদের পক্ষে নাকি তার প্রয়োজন হয় না! তারা সর্বভূক—মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়ে যে মায়ের মাংস খায় না সে কেবল দন্তোদ্গম হয় না বলে!* যথানির্দ্ধারিত গ্রামে বাস করে এই রাজপুরুষগণ সন্নিহিত অঞ্চলের শাসনকার্য্য চালাতেন এবং সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ দিয়ে নিজেদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। রাজার গ্রাম রাজার থাকত, ব্রাহ্মণদের ন্যায় সেগুলিতে তাঁদের কোনরূপ স্থায়ী সর্ত বর্তাত না।

রাঢ়ের সপ্তশতী বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের গ্রহবিপ্রগণের ন্যায় এই কায়স্থদের অনেকেই ছিল গৌড়ের মূল অধিবাসী। আদিশূরানীত পঞ্চকায়স্থের পূর্বেও যে এখানে কয়েক ঘর কায়স্থ ছিল এরূপ অনুমান করবার কারণ আছে। তাদের মধ্যে কেউ ছিল রাজপুরুষ, কেউ বা ছিল ভূস্বামী। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বলেন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাঢ়ের ঔদম্বরিক বিষয়ে নারায়ণভদ্র নামে এক কায়স্থ সামন্ত ছিলেন।[৭] অনুরূপ কায়স্থ আরও ছিল।

* কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম॥

কনৌজাগত স্ববর্ণীয়দের চাপে তারা যথেষ্ট কোণঠাসা হোলেও বোধ হয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের মত প্রাণহীন হয়ে পড়ে নি। নবাগতগণ তাদের সঙ্গে আদান প্রদান করত—অবশ্য সীমাবদ্ধভাবে!

১ লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, সম্বন্ধ-নির্ণয়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৭৯

২ সর্বানন্দ মিশ্র, কুলতত্ত্বার্ণবঃ

৩ বিশ্বকোষ, ১৯শ ভাগ, পৃঃ ৫৩১

৪ আনন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাকৈর, পৃঃ ১৫

৫ লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২১৪-৩০

৬ রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ ৮৮-৯৩

৭ নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ কাণ্ড, পৃঃ ২৯

বিংশতি অধ্যায়

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঞী

ক্ষিতীশূরের গ্রামদান

কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণ রাঢ়ের কৃষ্টিজীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে লোকান্তর গমন করলে দায়িত্ব পড়ে তাঁদের পুত্রগণের উপর। কিন্তু আলোকের নীচেই ছিল অন্ধকার; ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের মত বিদ্যা-বুদ্ধি অধিকাংশ ব্রাহ্মণকুমার আয়ত্ত করতে পারেন নি। পৈতৃক বিষয় থেকে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ হোত এবং তাতেই তাঁরা ছিলেন খুসী। আগেকার ঐতিহ্য রক্ষা করবার মত আকাঙ্খা বা সামর্থ অনেকের মধ্যে দেখা যায় নি। পঞ্চব্রাহ্মণের সেই তেইশজন পুত্রের নাম—

ক্ষিতীশের	পুত্র	ভট্টনারায়ণ, দামোদর, শৌরী, বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর।
বীতরাগের	,,	দক্ষ, সুষেণ, ভানু, কৃপানিধি।
সুধানিধির	,,	ছান্দড়, ধরাধর।
মেধাতিথির	,,	শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি, শশী।
সৌভরির	,,	বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর, মহেশ্বর।

বরেন্দ্রজয়ের পর ভূশূর এই ব্রাহ্মণ কুমারদের মধ্যে দামোদর, সুসেন, ধরাধর, শ্রীধর ও পরাশরকে সেখানে স্থাপন করেন। তাঁরা সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। বাকি আঠারোজন থেকে যান রাঢ়ে। পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর দিয়ে তাঁদের দিন চলত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের

অভাব হয় নি। ধনবান সপ্তশতীদের ঘরে বিবাহ করে দু'চারজন বেশ বিত্তশালীও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পুত্রদের সময়ে অনটন দেখা দেয়। কলসীর জল গড়িয়ে খেলে কত দিন চলে? পিতামহগণ ছিলেন পাঁচজন, তাঁরা এখন ছাপ্পান্ন। আরও আসছে। অন্ততঃ তিনজন ব্রাহ্মণপত্নী সন্তানসম্ভবা। মাত্র পাঁচখানি গ্রামের আয় দিয়ে এতগুলি পরিবারের ভরণপোষণ চলবে কি করে? নিজেদের অসুবিধার কথা জানিয়ে ব্রাহ্মণগণ রাজদরবারে আবেদন পেশ করলেন।

ভূশূর তখন গত হয়েছেন, তাঁর পুত্র ক্ষিতীশূর রাঢ়াধীশ। তিনি ব্রাহ্মণদের আবেদনখানি পড়লেন--মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শও করলেন। যাঁরা বিদ্বান ও জ্ঞানবান তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে; কিন্তু মূর্খেরা রাজানুগ্রহ আশা করতে পারে না। তাদের সাহায্য দানের অর্থ অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া। রাঢ়াধীশের এই অভিমত ব্রাহ্মণদের কাছে পৌঁছালে তাঁরা প্রতি গোত্র থেকে একজন করে সুপণ্ডিতকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে আবার রাজদরবারে পাঠালেন। এবার ক্ষিতীশূর প্রসন্ন হোলেন, সেই পঞ্চ মুখপাত্রের অনুরোধ রক্ষা করে তাঁদের ৫৬জন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৫৬খানি গ্রাম দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কিন্তু দানপত্রগুলি পৃথকভাবে লেখা হবে না, সমাগত ব্রাহ্মণগণ সকল ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকে গ্রামগুলি গ্রহণ করবেন। তাঁদের পরিচয় হবে সবার পরিচয়। সবাই তাঁদের সন্তান বলে গণ্য হবেন। বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থে দানগ্রহণকারী সেই ৫৬জন ব্রাহ্মণের নাম যে ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এখানে তা মুদ্রিত হোল—

ভট্টনারায়ণের বংশে—

১। বরাহ ২। গুরি
৩। নান ৪। রাম
৫। গণ ৬। সাণ্ডেশ্বর
৭। মহামতী ৮। মধুসূদন

	৯। বুঢ়	১০। বিকর্তন
	১১। নীপ	১২। বাটু
	১৩। নীল	১৪। কোয়র
	১৫। সোম	১৬। দীন
শ্রীহর্ষের বংশে—	১। জন	২। ধুরন্ধর
	৩। নান	৪। রাম
দক্ষের বংশে—	১। সুলোচন	২। ধীর
	৩। শ্রীহরি	৪। রাম
	৫। কাক	৬। কৃষ্ণ
	৭। জট	৮। শুভ্র
	৯। নীল	১০। শুভ
	১১। পালু	১২। বনমালী
	১৩। কেশব	১৪। কৌতুক
ছান্দড়ের বংশে—	১। শঙ্কর	২। সুরভী
	৩। বিশ্বম্ভর	৪। ধীর
	৫। মহাযশা	৬। মন
	৭। নারায়ণ	৮। গুণাকর
	৯। শ্রীধর	১০। রবি
	১১। কবি	
বেদগর্ভের বংশে—	১। হল	২। যোগী
	৩। মধুসূদন	৪। কুমার
	৫। রাজ্যধর	৬। বিশ্বরূপ
	৭। বশিষ্ঠ	৮। দক্ষ
	৯। মদন	১০। গুণাকর
	১১। রাম	

এই ভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের তালিকা ও তাঁদের শাসনগ্রামগুলির নাম কুলাচার্য্যগণ লিখিত একাধিক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এ সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব গ্রামগুলির অবস্থান ও উদ্ভূত গাঞীগুলির যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন এখানে তার

সারাংশ উদ্ধৃত করা হোল:—

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
ভট্টনারায়ণ বংশে প্রদত্ত			
(গোত্র—শাণ্ডিল্য)			
বরাহ	বন্দ্যঘটি	বর্দ্ধমান সহর থেকে সাত ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	বর্তমান নাম বাঁড়রী। এই গ্রাম থেকে 'বন্দ্য' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
গুয়ি	কুলভ	বর্দ্ধমান। ইন্দাস গ্রাম থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	বর্তমান নাম কুলহা। এই গ্রাম থেকে 'কুলভী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
নান	কুসুমকুল	বর্দ্ধমান। মন্তেশ্বর গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে।	এই গ্রাম থেকে 'কুসুমকুলি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
রাম	গড়্গড়	বীরভূম। সিউড়ী থেকে ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'গড়গড়ি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
গণ	ঘোষল	মানভূম জেলায় বরাকর নদীর দক্ষিণে।	এই গ্রাম থেকে 'ঘোষলি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
সাণ্ডেশ্বর	সেউ	মুর্শিদাবাদ। জঙ্গীপুর থেকে চার ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'সেউড়ি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মহামতি	দীঘড়া	হুগলী। জাহানাবাদ থেকে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, দ্বারকেশ্বর তীরে।	এই গ্রাম থেকে 'দীর্ঘাঙ্গী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মধুসূদন	কড়ী	বীরভূম। সিউড়ী থেকে দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্বে, অজয়ের তীরে।	এই গ্রাম থেকে 'কড়্যাল' বা 'কড়িয়াল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
ব্যুঢ়	মাস বা মাসদহা	বীরভূম। পূর্বোক্ত কড়ীর অদূরে।	এই গ্রাম থেকে 'মাসচটক' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বিকর্তন	বড়া বা বোড়া বৈকুণ্ঠপুর।	বাঁকুড়া। বিষ্ণুপুর থেকে এগার ক্রোশ পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'বড়াল' বা 'বটব্যাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
নীপ	কেশরকোণা	বাঁকুড়া। পূর্বোক্ত বড়া গ্রামের এক ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'কেশরকোনি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বাটু	পাবিহাল	বীরভূম। সাঁইথিয়ার দেড় মাইল দক্ষিণে।	বর্তমান নাম পরিহারপুর। এই গ্রাম থেকে 'পারি' বা 'পরিহাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
নীল	বসুয়া	মুর্শিদাবাদ। দ্বারকাতীরে, রামপুর থেকে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'বসুয়াড়ী' গাঞীব উদ্ভব হয়েছে।
কোয়র	কুশ	বর্দ্ধমান সহর থেকে তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'কুশারী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
সোম	ঝিকরা	মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর থেকে আট ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'ঝিকরাল' বা 'ঝিকরাড়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
পীন	বোকট্ট বা বোকড়া	বর্দ্ধমান। রায়নার নিকটে।	এই গ্রাম থেকে 'বোকট্টাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

শ্রীহর্ষ বংশে প্রদত্ত

(গোত্র—ভরদ্বাজ)

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
জন	ডিণ্ডীগা বা ডিংসা	বর্দ্ধমান। দিগনগরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'ডিংসাই' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
ধুরন্ধর	মুখটী বা মুকটী	বাঁকুড়া। অম্বিকানগরের নিকটে।	এই গ্রাম থেকে 'মুখো' বা 'মুখৈটি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
নান	সাহড়া	মুর্শিদাবাদ। নলহাটীর অদূরে।	এই গ্রাম থেকে 'সাহড়ী' বা 'সাহড়িয়ান্' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
রাম	রায়	বর্দ্ধমান। সাতশইকা পরগণা।	এই গ্রাম থেকে 'রায়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
দক্ষ বংশে প্রদত্ত (গোত্র—কাশ্যপ)			
সুলোচন	চাটুতি বা চাটতি	বর্দ্ধমান। খানা জংশন থেকে দেড় ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'চট্ট' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
ধীর	গুড়	মুর্শিদাবাদ সহর থেকে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'গুড়ী' গাঞীব উদ্ভব হয়েছে।
শ্রীহরি	সিমলা	হুগলী। বৈঁচি ষ্টেশন থেকে আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'সিমলাই' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
রাম	পালধি	বর্দ্ধমান। কাটোয়া থেকে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'পালধী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
কাক	হড়	বর্দ্ধমান থেকে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে।	—
কৃষ্ণ	পোড়াবাড়ী	বীরভূম। সাঁইথিয়া থেকে চার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'পোড়ারী' বা 'দগ্ধবাটিক' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
জট	পোষেলা	বর্দ্ধমান। মঙ্গলকোট থেকে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'পোষলী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
শম্ভু	তিলাড়া	হুগলী। বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া থেকে সাড়ে সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'তিলাড়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
নীল	অম্বুল	বর্দ্ধমান। কালনার নিকট।	এই গ্রাম থেকে 'অম্বুলী' বা 'আমরুলী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
শুভ	ভুরি	হুগলী। ভুরসুট পরগণা। গ্রাম বিলুপ্ত।	এই গ্রাম থেকে 'ভুরি' বা 'ভুরিশ্রেষ্টিক' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
পালু	পলসা	মুর্শিদাবাদ। মুরারই ষ্টেশনের নিকট।	এই গ্রাম থেকে 'পলসায়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বনমালী	পর্কট বা পাকুড়	পূর্বে বীরভূম, বর্তমানে সাঁওতাল পরগণা।	এই গ্রাম থেকে 'পাকড়াশী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
কেশব	মূলগ্রাম	বর্দ্ধমান। শ্রীখণ্ড থেকে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'মুলী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
কৌতুক	পীতমুণ্ড	সাঁওতাল পরগণা। পাকুড় থেকে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'পীতমুণ্ডী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

ছান্দড় বংশে প্রদত্ত

(গোত্র—বাৎস্য)

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
ধীর	পিপ্পল	বীরভূম। মল্লারপুর থেকে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'পিপলাই' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
সুরভি	ঘোষ	বীরভূম। পূর্বোক্ত পিপ্পল গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'ঘোষাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বিশ্বম্ভর	পূর্বগ্রাম	মুর্শিদাবাদ সহর থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'পূর্বগ্রামী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
শঙ্কর	পুতিতুণ্ড	মুর্শিদাবাদ। জেমুয়াকান্দি থেকে চার ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'পুতিতুণ্ডী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মহাযশা	বাপুলা	বর্দ্ধমান। মঙ্গলকোট থেকে দেড় ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'বাপুলি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মন	হিজ্জল	বর্দ্ধমান সহর থেকে আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'হিজ্জল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
নারায়ণ	কাঞ্জড়া	বাঁকুড়া। ছাতনা থেকে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'কাঞ্জিয়াড়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
গুণাকর	চোৎখণ্ড	বর্দ্ধমান। মেমারি থেকে দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'চতুর্থী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
শ্রীধর	কাঞ্জি	বর্দ্ধমান। কাটোয়া থেকে ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'কাঞ্জিলাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
রবি	মহন্ত	মুর্শিদাবাদ। পলাশী থেকে আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'মহিন্তা' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
কবি	শিমুল	বর্দ্ধমান। খাঞ্জাখাঁ গড়ের এক ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে।	এই গ্রাম থেকে 'শিমুলি' বা 'শিমুলায়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

বেদগর্ভ বংশে প্রদত্ত

(গোত্র—সাবর্ণ)

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
হল	গাঙ্গুল	বর্দ্ধমান। শক্তিগড় ষ্টেশন থেকে কিঞ্চিদধিক পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'গাঙ্গুলী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
যোগী	ঘণ্টা	অজ্ঞাত।	এই গ্রাম থেকে 'ঘণ্টেশ্বরী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মধুসুদন	পালি বা পালিগ্রাম	বর্দ্ধমান। মঙ্গলকোট থেকে দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'পালি' বা 'পালিয়াল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
কুমার	বালি	মুর্শিদাবাদ থেকে চার ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'বালিগামি' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
রাজ্যধর	কুন্দ	বর্দ্ধমান। মঙ্গলকোট থেকে দেড ক্রোশ পূর্বে।	এই গ্রাম থেকে 'কুন্দলাল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বিশ্বরূপ	নন্দি	বর্দ্ধমান। কাটোয়া থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে।	এই গ্রাম থেকে 'নন্দী' বা 'নন্দীয়াল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	হুগলী। বর্তমান নাম সিধলা।	এই গ্রাম থেকে 'সিদ্ধল' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
দক্ষ	সাও	অজ্ঞাত।	এই গ্রাম থেকে 'সাওিশ্বরী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
মদন	দায়া	বীরভূম। মল্লারপুর থেকে দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'দায়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।
গুণাকর	শির বা সিহারা	বর্দ্ধমান। রায়না থেকে আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।	এই গ্রাম থেকে 'শিয়াড়ী' বা 'সিহারী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

ছাপ্পান্ন গ্রামের প্রধান গ্রামগুলির অবস্থান

নাম	গ্রাম	অবস্থান	গাঞী
৫৬	নায়	বর্দ্ধমান। কাটোয়া থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে।	এই গ্রাম থেকে 'নায়ী' বা 'নায়াড়ী' গাঞীর উদ্ভব হয়েছে।

সব গ্রাম রাঢ়ে অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ্যার্ণবের হিসাব অনুসারে সমস্ত অঞ্চলটি ২২° ৫০′ থেকে ২৪° ২৮′ ৪৫″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬° ৪১′ থেকে ৮৮° ২৩′ ৪″ পূর্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তর সীমানা পাকুড় এবং দক্ষিণ সীমানা হুগলী জেলার ভূরশূট পরগণা। সামগ্রীক আয়তন অল্পাধিক দশ হাজার বর্গ মাইল।[১]

এরূপ স্বল্পপরিসর ভূভাগে বসতি স্থাপন করায় ব্রাহ্মণগণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হোলেও একেবারে সংযোগহীন হয়ে পড়েন নি। উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁরা মিলিত হোতেন; মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজনের কাছে তত্ত্বতল্লাস পাঠাতেন। বৈবাহিক আদান প্রদানে কোন অসুবিধা হোত না; কেউ পরলোক গমন করলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁর স্বগোত্রীয়গণ যথারীতি অশৌচও পালন করতেন।

গাঞীর ভাঙাগড়া

এইভাবে কয়েক পুরুষ কাটবার পর আনন্দভট্ট তাঁর বল্লাল-চরিতে* গাঞীমালা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন।[২] রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তখন বহু সহস্রে দাঁড়িয়েছে। অনেকে গ্রামান্তরে চলে গেছে, সামাজিক অদল বদলও হয়েছে যথেষ্ট। তারপর হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র† প্রভৃতি বিভিন্ন কুলাচার্য্য এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কয়েকখানি গ্রন্থও

* প্রকাশ কাল—শকাব্দ ১৪৩২, খৃষ্টাব্দ ১৫১০।

†এড়ুমিশ্র—চব্বিশ পরগণা জেলার এড়িয়াদহ নিবাসী কুলাচার্য্য। রোসাকর কুন্দলালের পৌত্র। নানা কারণে সমাজপতিদের বিরাগভাজন হোলেও তাঁর লিখিত সমাজকাহিনী শেষ পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। আসল নাম অজ্ঞাত, গ্রাম নামে পরিচিত।

রচিত হয়। সেগুলি পড়ে রাঢ়ের সর্বত্র জনসাধারণ বলতে থাকে—পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঞী, তা ছাড়া বামুন নাই। প্রবাদটি ভ্রান্তিহীন নয়। কারণ, রাজার কাছ থেকে কোন শাসনগ্রাম লাভ না করলেও সপ্তশতীদের মধ্যে বাসগ্রামের নামানুসারে কয়েটি গাঞী গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা হীন ব্রাহ্মণ, কেউ তাদের আমল দিত না!

হরিমিশ্রের আড়াই শ' বৎসর পরে বাচস্পতিমিশ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেন বোকট্টাল, ঝিক্‌রাল ও হিজ্জল এই তিন গাঞী তখন লোপ পেয়েছে। পুঁথির পৃষ্ঠায় তাদের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে তিনি সন্ধান পান নি। পক্ষান্তরে কুলিকুলি, কেয়ারী, ভট্ট, পুংসীক, দীঘল ও আকাশ এই ছয়টি নূতন গাঞীর উদ্ভব হয়েছে। এইরূপে একদিকে ভাঙন ও অন্যদিকে গড়নের কারণ তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব কয়ড়া, ভট্ট, পুংস ও দীঘল এই চারটি গ্রামের অবস্থান যথাক্রমে বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় নির্দ্ধারিত করেছেন। আকাশ গ্রামের সন্ধান তিনি পান নি।

বাচস্পতিমিশ্রের উপরোক্ত মত গ্রহণ করলে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঞী সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ঊনষাট। ব্রাহ্মণ-ইতিহাস রচয়িতা এই মত সমর্থন করে বলেছেন যে ক্ষিতীশূরের গ্রামদানের সময়ে তিনজন ব্রাহ্মণপত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তাঁদের তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় রাঢ়াধীশকে পরে নূতন করে তিনখানি গ্রামদান করতে হয়।[৩] কিন্তু এই যুক্তির সমর্থক বেশী নেই। ছাপ্পান্ন গাঞীর প্রতি ব্রাহ্মণদের আস্থা অটল। এমন কথাও মধ্যে উঠেছিল যে তিনটি সপ্তসতী গ্রাম ভুল করে রাঢ়ীদের গাঞীমালায় সন্নিবেশিত করায় গাঞী ব্যত্যয় ঘটেছে। ছাপ্পান্নটির বেশী গাঞী রাঢ়ীদের মধ্যে নেই।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে রাঢ়াধীশ ক্ষিতীশূর রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে যে গ্রামগুলি দান করেছিলেন আজও সেগুলির অস্তিত্ব থাকলেও বহু স্থানে

আদি ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ অন্যত্র চলে গেছেন। কোন কোন গ্রামে ভিন্ন গাঞী ব্রাহ্মণ এসে বাস করছে। আবার ব্রাহ্মণশূন্য হয়েছে এমন শাসন-গ্রামও বিরল নয়। তবুও সেই রাঢ়াধীশের স্মৃতি আজও ব্রাহ্মণ সমাজের পদবীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

গাঞীর বিবর্তন

পূর্বে ব্রাহ্মণদের গোত্র ছিল—পদবী ছিল না। ক্ষিতীশূর প্রদত্ত গ্রামগুলি লাভ করবার পর ধীরে ধীরে পদবী গড়ে উঠতে লাগল। প্রথম গাঞী সৃষ্টির সময়ে তিন গোত্রে রাম নামীয় তিন ব্যক্তি ছিলেন। তিন জনের পার্থক্য নিরূপণের জন্য নামের শেষে গ্রামের নাম যুক্ত করা ব্যাতীত গত্যন্তর ছিল না। রাম পালধি থেকে রাম গড়গড়ির পার্থক্য বোঝাবার দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। এইভাবে সূত্রপাত হোলেও গাঞী পূর্ণাঙ্গ পদবীতে পরিণত হতে বেশ কয়েক পুরুষ সময় লেগেছিল।

সর্ব দেশে দেশে সর্ব কালে এইভাবে পদবীর উদ্ভব হয়েছে। কাশ্মীরাগত এক ব্রাহ্মণ পরিবার উত্তর প্রদেশের কোন নহরের তীরে বাস করায় নেহেরু নামে পরিচিত হয়। পার্শীদের মধ্যে আন্‌ক্লেসারিয়া, বিলিমোরিয়া প্রভৃতি পদবীগুলির মূলে রয়েছে বিশেষ কোনও নগর বা গ্রামের নাম। বৃত্তিভিত্তিক পদবীও যথেষ্ট রয়েছে। উকিলের পৌত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী হয়েও পিতামহের পেশাকে নিজের বংশ পরিচয়রূপে ব্যবহার করে। ম্যাক্‌মিলান প্রভৃতি স্কচ বা ও'কোনার প্রভৃতি আইরিশদের পদবীগুলির উদ্ভবও অনুরূপভাবে হয়েছে।

মকরন্দ প্রভৃতি কায়স্থদের বংশধরগণও এইভাবে গ্রামভিত্তিক পদবী লাভ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। যে ঘোষ বা বসুয়া গ্রাম থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ঘোষাল বা বসুয়াড়ী পদবীর উদ্ভব হয়েছে, কায়স্থদের ঘোষ ও বসুগণ যে সেই গ্রামগুলি থেকে উদ্ভূত পদবী ব্যবহার করেন

না এমন কথা কে বলতে পারে? আবার বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একই পদবী দেখে মনে হয় যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ হয় তো একই বৃত্তিভোগী বা একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ; পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছেন।

সপ্তশতীদের গাঞী

সপ্তশতীদের মধ্যেও ঠিক এমনিভাবে ধীরে ধীরে গ্রামভিত্তিক পদবীর উদ্ভব হয়। বাচস্পতি মিশ্র ও দেবীবর ঘটকের হিসাব অনুসারে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের গোত্র আট ও গাঞী আটাশ। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার সেই গাঞীগুলিকে এইভাবে নির্দ্ধারিত করেছেন—

কৌণ্ডিন্য গোত্রে—	পিখুড়ী, বালখুবি, নানকসাই, নালসী, জগাই, ভাগাই, সাগাই, আখর ইত্যাদি।
গৌতম গোত্রে—	গোস্বামী, যবগাঁই।
পরাশর গোত্রে—	রায়, নালসিগাঁই, পিখুড়ী।
কাশ্যপ গোত্রে—	রায়, কাশ্যপ-কাঞ্জাড়ি।

গোত্র আরও আছে—গাঞীও আছে। শুনক, বশিষ্ঠ, হারীত ও কৌৎস গোত্রে কালাই, হেলাই, দাই, বানসি, বাণ্টুরি, ফর্‌ফর, বড়ল, যাস, কাটানি প্রভৃতি গাঞী প্রসিদ্ধ। নদীয়া জেলার শান্তিপুর, ফুলিয়া, বেলগড় ; বর্দ্ধমান জেলার সিংয়েরকোন, পালশীট, নবগ্রাম, ময়নানড় ; হুগলী জেলার সিমলাগড়ী, নালসী, চুঁচূড়া, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর ; চব্বিশ পরগণা জেলার কলিকাতা, জয়নগর, পলাবাড়ী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এই সব গাঞীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণ যথেষ্ট রয়েছেন। তবে তাঁদের অনেকে এখন গাঞীর পরিবর্তে গোস্বামী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদের আচরণে তাঁরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ; তাঁদের হীনাবস্থা থেকে উন্নয়নের ক্ষীণ দাবীও মাঝে মাঝে শোনা যায়। পদবী পরিবর্তন তারই বহিঃপ্রকাশ।

উপাধির ব্যভিচার !

এরূপ পদবী পরিবর্তন রাঢ়ীদের মধ্যেও বড় কম হয় নি। দশম শতাব্দীতে ধরাশূর যখন ব্রাহ্মণগণকে নূতন কুলমর্য্যাদা দেন বোধ হয় তখন বা তার পরে কোনও সময়ে বন্দ্য বংশীয় মহেশ, মুখো বংশীয় উৎসাহ, চট্ট বংশীয় অরবিন্দ এবং গাঙ্গুল বংশীয় শিশু পাণ্ডিত্যের জন্য রাজার কাছ থেকে বিশেষ উপাধি পান। সেই থেকে এই চার বংশীয় সকল ব্রাহ্মণের গ্রামীন পদবীর অন্তে সম্মানসূচক 'উপাধ্যায়' কথাটি যোগ করবার রীতি প্রচলিত হয়েছে। সেই উপাধ্যায়যুক্ত গাঞী কাল-ক্রমে তাঁদের স্থায়ী পদবীতে পরিণত হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্বমর্য্যাদায় চারিদিকে ঘোরাফেরা করায় অন্য গ্রামীন ব্রাহ্মণগণ ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। উপাধ্যায়দের তুলনায় নিজেদের ছোট করে রাখা তাঁদের মনঃপূত হয় না। সেই কারণে অনেকে নিজস্ব গাঞী ত্যাগ করে স্বগোত্রীয় উপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণের পদবী গ্রহণ করতে থাকেন। এরূপ পদবী পরিবর্তন কিছু দোষণীয় নয়—গোত্র অপরিবর্তিত থাকলেই হোল! এইভাবে স্ফীতিলাভ করায় বন্দ্য, মুখো, চট্ট ও গাঙ্গুল গাঞীর সংখ্যা এখন গড়গড়ি, পূতিতুণ্ডি, পাকড়াসী, পিপলাই, বাপুলি, রাই প্রভৃতি গাঞীর তুলনায় এত বেশী। এইসব গাঞীর অনেকে উপাধ্যায়দের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করলে তাদের সংখ্যা এভাবে স্ফীত হোত না। ব্রাহ্মণ ইতিহাস রচয়িতা এই প্রথাকে উপাধির ব্যভিচার বলে অভিহিত করেছেন।

সে ব্যভিচার আজও চলছে। আমার পরিচিত এক তরুণ ব্রাহ্মণ কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর পূর্বতন পদবী পরিবর্তিত করে নিজেকে বন্দ্যোপাধ্যায় বলে পরিচয় দেন। তাঁর বক্তব্য এই যে তিনিও যখন বন্দ্যোপাধ্যায়দের ন্যায় শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত তখন নিশ্চয় তাঁর পিতৃপিতা-মহগণ কোনও নবাবের কাছ থেকে পাওয়া এক অদ্ভুত পদবী এতদিন

ব্যবহার করে এসেছেন ! যুবক জানেন না যে তাঁর বংশ-পদবী ও নূতন পদবীর উদ্ভব একই সঙ্গে হয়েছিল। দুটিই গ্রামভিত্তিক।

১ নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, পৃঃ ১১৭-২৯

২ আনন্দভট্ট, বল্লাল চরিত, শ্লোক ৪৬-৬৪

৩ হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ ইতিহাস, পৃঃ ৫২, ৫৯

৪ বনমালী ভট্টাচার্য্য, সাগর প্রকাশ, পৃঃ ১৩,৪৭

একবিংশ অধ্যায়

পাল বংশ

গোপালের পরিচয়

পূর্বে বলেছি রাঢ়ে যখন শূররাজগণের অভ্যুদয় হয় সেই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করতেন জয়ন্ত। রাজ্যহারা কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর রাজধানীতে এসে আশ্রয় নেন। গৌড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন যে আরও কয়েকজন ক্ষুদ্রতর রাজা রাজত্ব করতেন রাজতরঙ্গিনীতে তার উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে একজন বোধ হয় গোপাল। তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে বরেন্দ্রের এক সাধারণ ঘরে এই ভাগ্যান্বেষী যুবকের জন্ম হয়। সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন তাঁর পিতামহ এবং রণকুশল বপ্যট পিতা। জন্মসূত্রে তিনি পিতামহের কাছ থেকে শাস্ত্র এবং পিতার কাছ থেকে শস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সহধর্মিণীর নাম দেদ্দাদেবী।

যে তাম্রশাসন থেকে গোপালের এই পরিচয় জানা যায় মালদহের নিকটবর্তী খালিমপুর গ্রামের এক কৃষক জমিতে হল কর্ষণের সময়ে সেটি মাটির ভিতর থেকে আবিষ্কার করে। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে ধাতুখণ্ডটি যেমন সকল মূল্যের অতীত কৃষকের কাছেও তাই। সেটিকে বাড়ী নিয়ে এসে সে সিঁদুর মাখিয়ে পূজা সুরু করে, দান-বিক্রয় করতে অসম্মত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় কৃষকপত্নীর কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটির হস্তে অর্পণ করেন। ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র গুণশালী তাতট কর্তৃক ধর্মপালের রাজ্যারম্ভের সংবৎ ৩২,

মার্গদিন ২২শে লেখা এই তাম্রশাসন দ্বারা নারায়ণবর্ম্মা নামক এক ব্যক্তিকে গৌড়েশ্বর কিছু ভূমি দান করেন।১ বুদ্ধের দশবলকে স্মরণ করে প্রসঙ্গক্রমে পাল বংশের অভ্যুদয়কাহিনী যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে নীচে তা দেওয়া হোল—

১

ওঁ স্বস্তি! যিনি সর্বজ্ঞতাকে রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-করুণা-পরিপালিত বহু-মার-সেনা-সমাকুল দিঙ্মণ্ডল-বিজয়-সাধনকারী দশবল*তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

২

মনোহারিণী লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থল যেমন সমুদ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তিস্থল যেমন শশধর সেইরূপ অবনীপালকুলের সর্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজপুরুষ সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩

যিনি বিপুল কীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন অরাতি-নিধনকারী কুশল প্রশংসনীয় সেই বপ্যট দয়িতবিষ্ণু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪

মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া দিয়াছিল পূর্ণিমা-রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামে সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫

চন্দ্রের যেমন রোহিণী অগ্নির যেমন স্বাহা শিবের যেমন সর্ব্বাণী ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা এবং বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী সেই

* বুদ্ধের দশবল—দান-শীল-ক্ষমা-বীর্য্য-ধ্যান-প্রজ্ঞা-বলানি চ।
উপায়ঃ প্রাণীবিজ্ঞানং দশবুদ্ধ-বলানি চ॥

রাজার সেইরূপ দেদ্দাদেবী নাম্নী চিত্তবিনোদনকারিনী প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে যে মাৎস্যন্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে কোন কোন গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে শশাঙ্কের তিরোধানের পর থেকে দীর্ঘ এক শত বৎসর ধরে গৌড়ে যে অরাজকতা চলে সেই সময়ে সবলের প্রতি দুর্বলের অত্যাচারে জনজীবন বিড়ম্বনাময় হয়ে পড়েছিল। পুকুরের বোয়াল, সোল প্রভৃতি বড় মাছরা যেরূপ নির্বিচারে ছোট মাছদের ভক্ষণ করে এই ভূভাগের বিচ্ছিন্ন রাজারা তেমনি ক্ষুদ্রতর রাজাদের গ্রাস করত এবং প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। সেই অরাজকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রজাপুঞ্জ গোপালকে সমগ্র গৌড়ের অধীশ্বর নির্বাচিত করে।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। প্রজাপুঞ্জের এরূপ নির্বাচনাধিকার সে যুগে ছিল না। তারপর, শশাঙ্কোত্তর যুগের অরাজকতা! শশাঙ্ক তো জলবুদ্বুদের মত ভেসে উঠে জলবুদ্বুদেরই মত মিলিয়ে গিয়েছিলেন, কোন শক্তিশালী রাজবংশ বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর তিরোধানের ফলে অশান্তি দেখা দেবে কেন? সেই থেকে এই ভূভাগের যে ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট থাকলেও অরাজকতা নেই। গোপালের অভ্যুদয়ের সময়ে অন্য কোথাও না হোক গৌড়ের রাঢ় প্রদেশে শক্তিশালী শূর বংশ রাজত্ব করছিল। সেই কারণে রাঢ়ীগণকে মাৎস্যন্যায়ের কবলে পড়তে হয় নি। আর রাঢ় বাদ দিলে গৌড়ের থাকে কতটুকু?

এমন হতে পারে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তের মৃত্যুর পর যখন সেখানে অরাজকতা দেখা দেয় সেই সময়ে বা অনুরূপ কোনও অজ্ঞাত কারণে বরেন্দ্রের এক অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিলে পঞ্চগৌড়ের অন্যতম অধীশ্বর গোপালদেব তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিজ রাজ্যসীমা

কিছুটা সম্প্রসারিত করেছিলেন। গৌড়ের সকল রাজা বা প্রজাপুঞ্জ সম্মিলিত হয়ে তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেছিলেন এমন কথা বললে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। তিনি সমগ্র গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন না।

সকল নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর—ধর্মপাল

৬-৭-৮

> সেই গোপালদেব ও দেদ্দাদেবী হইতে ধর্মপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।......নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর সেই রাজা একাকী সমগ্র বসুমতীর শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।... সেই রাজা প্রকট-লীলাচালিত-সেনাবল সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হয়।......সেই রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে চলমান সেনাসমূহের আস্ফালনোত্থিত ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়।

১২

> তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গিবিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।
>
> —খালিমপুর লিপি

প্রসঙ্গটি অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হোলেও অন্তঃসারশূন্য নয়। ধর্মপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন পাল রাজ্যের আয়তন তখন এমন কিছু বড় ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী কূটনীতিক; শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে

যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন। তাঁর নির্দেশে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের অধীনে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়; প্রবীণ যোদ্ধা লাউসেন নিযুক্ত হন প্রধান পরামর্শদাতা। সকল সৈনিককে কঠোরভাবে শিক্ষাদানের পর সেনাপতি বাকপাল যখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারে নি। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা চলছিল। সেই সুযোগে বাকপালের সৈন্যগণ পূর্বদিকে কামরূপ ও বঙ্গ এবং পশ্চিমে মগধ ও মিথিলার রাজ্যগুলি একে একে জয় করে।

এই দিগ্বিজয়ে রাঢ়ের শূরবাহিনী দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়। দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত হয় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকার নিয়ে। রাজা জয়ন্তের মৃত্যুর পর সেখানে যখন অরাজকতা চলছিল সেই সময়ে রাঢ়াধীশ ভূশূর এসে রাজ্যটি অধিকার করেন। ধর্মপালেরও রাজ্যটির উপর লোভ ছিল, কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়। তাই শূররাজের সাফল্য অসহায়ভাবে দেখতে হয়। কিছুকাল পরে তাঁর সমরায়োজন সম্পূর্ণ হোলে যখন তিনি সসৈন্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়ে উপনীত হন শূরবাহিনীর পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেই সময়ে কনৌজে হঠাৎ চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেখানকার দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর সুযোগ নিয়ে সমগ্র আর্য্যাবর্তে আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাঢ় অভিযান আপাততঃ স্থগিত রেখে ধর্মপাল পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন।

নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও কান্যকুব্জ তখনও আর্য্যাবর্তের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার কৃষ্টি সারা দেশকে প্রভাবিত করে। কিন্তু গৃহযুদ্ধের আগুণে রাজ্যটি এখন পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে রাজ্যহারা কাশ্মীররাজ জয়াপীড় যখন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গৌড় সৈন্যসহ কনৌজের ভিতর দিয়ে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সেখানকার অন্যতম রাজা বজ্রায়ুধ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন;

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গৌড়সৈন্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি। এখন সমগ্র কনৌজ এই আয়ুধ বংশের অধিকারভুক্ত; বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধ সিংহাসনে সমাসীন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। শত্রুর প্রেরণায় পুত্র ইন্দ্রায়ুধ তাঁকে দূরীভূত করে সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে। কূটনীতিজ্ঞ ধর্মপাল পিতার পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে বিশেষ সাহায্য দেন। সেই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যাবর্তের সিংহদ্বার তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কান্যকুব্জরাজ যাঁর আশ্রিত তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াবে কে?

চক্রায়ুধকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ধর্মপাল আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একে একে জয় করতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দ্বিগ্বিজয় পূর্বে কামরূপ, পশ্চিমে দিল্লী, উত্তরে জলন্ধর ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।[২] এক অখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষের পৌত্র এবং ক্ষুদ্র নরপতির পুত্রের পক্ষে এরূপ বিশাল রাজ্য স্থাপন কম গৌরবের কথা নয়। রাজন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ধর্মপাল পরবল নামক জনৈক রাষ্ট্রকূটরাজের কন্যা রন্নাদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্র নগরীতে স্থাপিত হয় তাঁর জয়স্কন্ধাবার—সামরিক রাজধানী। অবশ্য এ পাটলিপুত্র সে পাটলিপুত্র নয়। হিরণ্যনদীর গর্ভে বিলীন সেই মহানগরীর পার্শ্বে ধর্মপাল এক নকল বুঁদিগড় নির্মাণ করেছিলেন! তাঁর মূল রাজধানী ছিল বোধ হয় গৌড় নগরী।

কান্যকুব্জে সাফল্য সত্ত্বেও ধর্মপালের যাত্রাপথ কুসুমাবৃত ছিল না। তাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কান্বিত হয়ে মালবের গুর্জর-প্রতিহাররাজ বৎসরাজ কনৌজ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই গুর্জর-প্রতিহার বংশের বীজপুরুষ নাকি রামানুজ লক্ষ্মণ। তিনি এক সময়ে ভ্রাতা শ্রীরাম-চন্দ্রের দ্বারপালের কাজ করায় তাঁর বংশধরগণ প্রতিহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আলোচ্য সময়ে তাঁদের ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র গুজরাট,

মালব ও রাজস্থানের কিছু অংশ ছেয়ে ফেলেছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে তাদের শৌর্য্যশালী নেতা নাগভট্ট সিন্ধুর আরবগণকে কোণঠাসা করে অন্য সীমান্তে প্রসারলাভের কথা চিন্তা করতে থাকেন। এখন ধর্মপাল এসে কনৌজ অধিকার করায় নাগভট্টের পুত্র বৎসরাজ চিন্তিত হয়ে পড়েন। গৌড়বাহিনী কনৌজ ত্যাগ করবার কিছু কাল পরে বৎসরাজের প্রতিহার সৈন্যগণ এসে সেখানে উপনীত হোলে চক্রায়ুধ আবার সিংহাসনচ্যুত হন। সেই বিপদের দিনে ধর্মপাল আশ্রিতকে ত্যাগ করেন নি; কিন্তু বৎসরাজের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে মগধের দিকে তাঁবু অপসারণ করতে হয়।

মালবের ঠিক দক্ষিণে ছিল আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাষ্ট্রকূট রাজ্য। বৎসরাজের কনৌজ জয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের শঙ্কিত হবার কারণ হয়। গৌড়সেনা যেভাবে পশ্চাদাপসারণ করছে তাতে সমগ্র আর্য্যাবর্তের উপর হয় তো বৎসরাজের আধিপত্য স্থাপিত হবে; রাষ্ট্রকূট শক্তি কোনঠাসা হয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য ধ্রুব কালবিলম্ব না করে গুর্জর-প্রতিহারগণকে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করেন। তার ফলে ধর্মপাল রাহুমুক্ত হন।

এমনিভাবে কিছুকাল চলবার পর রক্ষক ভক্ষক হয়ে দেখা দেয়। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে প্রতিহার বাহিনী পরাজিত হওয়ায় রাষ্ট্রকূট সৈন্যগণ কনৌজ অধিকার করে মগধের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ধর্মপাল তাদের প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বে কোনও অজ্ঞাত কারণে রাষ্ট্রকূট বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। তাদের পরিত্যাক্ত স্থানে নূতন প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট এসে আবির্ভূত হন। কিন্তু তিনি ধর্মপালকে স্থানচ্যুত করতে পারেন নি। উত্তর ভারত পূর্বার্দ্ধে পাল ও পশ্চিমার্দ্ধে গুর্জর-প্রতিহার-দের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[২]

ধর্মপালের উত্তর সীমান্তও নিরাপদ ছিল না। তিব্বত তখন বিরাট

শক্তি। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর তিব্বতী বাহিনী চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী চ্যাংগান অধিকার করেছে। পশ্চিমে তারা পামীর পার হয়ে পূর্ব-তুর্কীস্থানে পৌঁচেছে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের উপর তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোং আইদে-বিৎসন ও রল-পচন শতাব্দীকাল ধরে রাজত্ব করেন।[৪] সাফল্যের উৎসাহে তিব্বতী সৈন্যগণ হিমালয় অতিক্রম করে গৌড়ে প্রবেশ করে; কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি।[৫] সেনাপতি জয়পালের অধিনায়ত্বে পাল সৈন্যগণ তাদের দূরীভূত করে দেয়। তিব্বতী আক্রমণ এক তুচ্ছ সীমান্ত সংঘর্ষে পর্য্যবসিত হয়।

দেবপাল

ধর্মপালের জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিভুবনপাল পরলোক গমন করায় তাঁর তিরোধানের পর রাণী রন্নাদেবীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র দেবপাল গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাল রাজ্য তখন যথেষ্ট স্থায়িত্ব লাভ করেছে, রাজবংশ ঘরে বাইরে প্রভূত মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম ভোগ করছে। তা সত্ত্বেও বহিরাক্রমণের আশঙ্কা পুরাপুরি দূর হয় নি। পালশক্তির সঙ্গে সমান্তরালভাবে পূর্বতন দুই শত্রু নিজেদের সামরিক বল বৃদ্ধি করছিল। ভারত তিনটি শক্তিশালী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

দেবপালের সমসাময়িক গুর্জর-প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ ছিলেন তাঁরই ন্যায় প্রতিভাশালী ও সঙ্গতিসমৃদ্ধ। কান্যকুব্জে রাজধানী অপসারিত করে তিনি সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে দেবপালের কোন বিবাদ না থাকলেও তাঁর পিতামহ বৎসরাজের হাতে ধর্মপাল যে একবার নিগৃহীত হয়েছিলেন সে কথা তিনি ভোলেন নি। একবার মিহিরভোজের গুজরাট সামন্তগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তা দমন করবার জন্য অন্যান্য সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হয়। সেই সময়ে দেবপাল প্রতিহার রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি।

তৃতীয় শক্তি রাষ্ট্রকূট। রাজা অমোঘবর্ষ তাঁর গৌড় ও কনৌজ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় অপেক্ষা কম শক্তিশালী নন। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণদিকস্থ সকল ভূভাগ আগে থেকেই তাঁর অধিকারভুক্ত। এখন তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলের রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এইভাবে ত্রিধাবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাল, উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গুর্জর-প্রতিহার ও দক্ষিণাঞ্চলে রাষ্ট্রকূটগণ বিভিন্ন সামন্ত ও আশ্রয়পুষ্ট রাজ্যসহ রাজত্ব করছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কিছু মধুর ছিল না, কিন্তু কেউ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপও করত না। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করত।

এরূপ সশস্ত্র শান্তি চিরদিন বিদেশীদের আহ্বান জানিয়েছে। এই বিভেদ থেকে লাভবান হবার আশায় সিন্ধুর আরব শাসক ইমরান্-বিন্-মুশা সসৈন্যে পূর্ব দিকে আসতে থাকেন এবং হিমালয় পার হয়ে তিব্বত-রাজ রল-পচনের (৮১৫-৬৮) সৈন্যবাহিনী গৌড়ে প্রবেশ করে। তিব্বত তখনও বিরাট শক্তি, চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী চ্যাংগানসহ সমগ্র মধ্য-এশিয়া রাজা রল-পচনের অধিকারভুক্ত।[৫] কিন্তু গৌড়ে তিব্বতী সৈন্যগণ বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। সেনাপতি জয়পালের অধিনায়কত্বে পাল বাহিনী অতি সহজে তাদের দূরীভূত করে। তিব্বতী আক্রমণ এক তুচ্ছ সীমান্ত সংঘর্ষে পর্য্যবসিত হয়।

এই অতর্কিত আক্রমণ সত্ত্বেও তিব্বতের সঙ্গে পাল রাজ্যের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে নি। এখানকার বিভিন্ন মহাবিহারে তিব্বতী ছাত্রগণ এসে অধ্যয়ন করত, আবার এখান থেকে বহু ধর্মাচার্য্য বুদ্ধের বাণী বহন করে তিব্বতে যেতেন। গৌড়েশ্বরকে পাশ কাটিয়ে দুই দেশের মধ্যে এরূপ আদান প্রদান নিশ্চয় সম্ভব হয় নি। সেই কারণে মনে হয় যে রাজা রল-পচনের সঙ্গে দেবপালের সৌহার্দ্য ছিল।

তাঁর শাসন পালশক্তির চরম বিকাশের যুগ। সেনাপতি জয়পালের সংগঠনী শক্তি ও সামরিক নেতৃত্বের ফলে সকল সীমান্ত সুরক্ষিত হয় এবং

প্রধানমন্ত্রী দর্ভপাণির শাসন নৈপুণ্যে দেশ ধনধান্যে ভরে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যের যে বেশ চর্চা হোত এ যুগের কয়েকখানি তাম্রশাসন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে গুলির ভাষা মার্জিত ও প্রাঞ্জল। চারু ও কারুশিল্পের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিন শতাব্দী পূর্বে গুপ্তযুগে যে নূতন শিল্পপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল এই সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। সেই শিল্পের ভিত্তিতে বরেন্দ্রবাসী শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপালো এক নূতনতর শিল্পধারার প্রবর্তন করেন। পিতাপুত্র সম্বন্ধে লামা তারানাথ লিখেছেন, প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি গঠনে তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তাঁরা এমন সব শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করেছিলেন যা কেবল নাগগণের দ্বারা সম্ভব। চিত্রশিল্পেও উভয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; পিতার শিষ্যরা প্রাচ্য-সম্প্রদায় এবং পুত্রের শিষ্যরা মধ্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হোত। শেষোক্তগণ মগধে ছিল সংখ্যাবহুল।[৮]

দুঃখের বিষয় এই প্রতিভাবান শিল্পীদ্বয়ের কোন সৃষ্টিই আমাদের হস্তগত হয় নি; তবে রাজা যেখানে বৌদ্ধ বিষয়বস্তু যে সেখান বৌদ্ধ দেবদেবীদের ঘিরে গড়ে উঠেছিল এরূপ অনুমান আমরা করতে পারি। এযুগে নির্মিত অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, খসর্পণ প্রভৃতির যে সব প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলি পিতাপুত্র বা তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সৃষ্টি। ধীমান গোষ্ঠীর নির্মিত হেবজ্র, হেরুক, জম্ভল প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার এবং প্রজ্ঞাপারমিতা, পর্ণশবরী, আর্য্যতারা, বজ্রতারা, হারীতি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীমূর্তিগুলি আজও তাঁদের স্মৃতি বহন করছে।

এই শিল্পধারা স্থাপত্যের উপরেও প্রতিফলিত হয়। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, কিন্তু রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে সোমপুরী মহাবিহারের যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বার শ' বৎসর পরেও নির্মাতাদের দক্ষতার পরিচয় তার ভিতর পাওয়া যায়। বিহারটির ভিত্তি দৈর্ঘ্যে ৩৬১ ফুট এবং প্রস্থে ৩১৮ ফুট।

দেওয়ালের ইটগুলি সব ধ্বসে পড়েছে, তবুও যে সব নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট আছে তা দেখে বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুষমামণ্ডিত এই মহাবিহারটির উচ্চতা ছিল এক শ' ফুট। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল আরাধ্য বিগ্রহ; চারপার্শ্বের চার প্রকোষ্ঠে স্থাপিত ছিল ধাতুনির্মিত চারটি মূর্তি। সেগুলির একটি বার্মিংহাম আর্ট গ্যালারিতে রক্ষিত আছে।[৭]

পালযুগের চিত্রকলার সঙ্গে সমসাময়িক যবদ্বীপ চিত্রকলার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাই দেখে জিমার মনে করেন, যবদ্বীপের শিল্পী ও স্থপতিরা পালরাজ্য থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করত।[৮] উভয় দেশের মধ্যে তখন সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিব্বতের ন্যায় যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপ থেকে বহু ছাত্র নালন্দায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসত। সেখানকার শৈলেন্দ্রবংশীয় সম্রাট বালপুত্রদেব এখানে এক বিহার নির্মাণ করে তার পরিচালনার জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। যে তাম্রপটে দানপত্রটি লেখা হয়েছিল তার মধ্যে গৌড় কাহিনীর যে উজ্জ্বল অধ্যায় লুক্কায়িত রয়েছে পরে তা আলোচনা করা হবে।

1 *Journ. Asiat. Soc. Beng., Vol. LXIII, part 1. p. 29*
2 Sumpa Khan-po Yece Pal-Jor *Pag Sam Jon Zang, p. 112*
3 Panikkar K. M. *Survey of Indian History, p. 85*
4 Bell C. *Tibet, Past and Present, p. 128*
5 Petech L. *Study of the Chronicles of Ladakh, p. 62*
6 *Indian Antiquery, Vol. IV, p. 101*
7 Percy Brown *Indian Architecture (Buddhist & Hindu), p. 151*
8 Zimmer H. *Art of Indian Asia, Vol. 1, p. 16*

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বৌদ্ধ জাগরণ

বৌদ্ধজগতের প্রতীচ্য প্রদেশ—গৌড়

ধর্মপাল ছিলেন পরমসৌগত। বজ্রাসনের দশবলকে স্মরণ করে তিনি জনৈক অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে ভূমিদান করেছিলেন। তাঁর পুত্র দেবপাল সকল প্রজার জন্য সর্বার্থ-ভূমিশ্বর পর-প্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সৎপথ-প্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি কামনা করেছিলেন। এমনি বুদ্ধবন্দনা চলে সমস্ত পালযুগ ধরে। তাঁদের সুদীর্ঘ শাসনকালে গৌড় ও মগধ হয়ে দাঁড়ায় ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল।

আলোচ্য সময়ে অর্দ্ধেক এশিয়া বুদ্ধের জ্যোতিতে ভাস্বর। গৌড়ের উত্তরে নেপাল পুরাপুরী বৌদ্ধ। তিব্বত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দুইজন অধিপতি খ্রি-স্রোং আইদে-বিৎসন্ ও রল-পচন গৌড়েশ্বর ধর্মপাল ও দেবপালের সমসাময়িক। বিশাল তিব্বতী সাম্রাজ্যের অসংখ্য মঠে বিহারে তথাগতের পূজা হয়। আরও উত্তরে মোঙ্গলগণ একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। নিরবিচ্ছিন্ন তিব্বতী আক্রমণ ও অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে চীনের ট্যাং সাম্রাজ্য যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও অমিতাভের দ্যুতি সেখানে ম্লান হয় নি। সম্রাট তে-সুং (৭৭৯-৮০৫) নিয়মিতভাবে সূত্র পাঠ করেন। চ্যানপন্থী স্থবির তাও-ই বৌদ্ধ ও লাও-সে মতের সমন্বয় সাধন করেছেন।

উত্তরে কোরিয়া ট্যাং সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধকে ত্যাগ করে নি। স্বাধীন কোরিয়ার নূতন রাজবংশ বৌদ্ধমত প্রসারের জন্য

সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছে। জাপানে চলছে নারা যুগ। সমগ্র রাজধানী বুদ্ধমন্দিরে শোভিত হয়েছে ; একের পর এক সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করে প্রবজ্যা গ্রহণ করছেন। দেংগিও দাইসি মহাযান মতের ভিত্তিতে হিয়াই পর্বতশীর্ষে তেন-দাই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দক্ষিণে সাগরপারে বিশাল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে বৌদ্ধমত রাজধর্ম। বোরোবুদুর মহামন্দিরের নির্মাণকার্য্য সবেমাত্র সুরু হয়েছে। কম্বোজে বিরাট ধর্মবিপ্লবের পর মহাযান মত আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে ; অঙ্কোরবটের নির্মাণকার্য্য চলছে। আনাম, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে বৌদ্ধদের মধ্যে অনুরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর শেষ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মহাযানী, থেরাবাদী ও হীনযানীরা জয়যুক্ত হচ্ছে।

বৌদ্ধজগতের এই যে বিরাট প্রাণস্পন্দন তার নাভিকেন্দ্র কপিলাবস্তুর সেই রাজপ্রাসাদ, লুম্বিনীর সেই পুষ্পোদ্যান, নৈরঞ্জনা তীরের সেই বোধিদ্রুম। সকল বৌদ্ধের দৃষ্টি ভারতের এই পুণ্য তীর্থগুলির উপর নিবদ্ধ। এ সময়ে বুদ্ধের দেশে যদি বুদ্ধ নির্বাসিত থাকেন তা হোলে ক্ষোভের অবধি থাকবে না। এই মতকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে পালরাজগণ সমগ্র ভারতের মুখ রক্ষা করেন। তাঁদের সময়ে গৌড় ও মগধ বিশাল বৌদ্ধ জগতের পশ্চিমতম প্রদেশে পরিণত হয়।

দুঃখের বিষয়, তিব্বতী সাহিত্য ব্যতীত এই মহান বংশের ধর্মানুরাগের বিবরণ জানবার উপকরণ খুব বেশী নেই। কিন্তু সেগুলি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি। ইতিহাস ও সাহিত্যের মানদণ্ডে লামা তারানাথ, লামা বুৎসন্ ও সুম্পা-খাম্পোর গ্রন্থগুলি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য। অথচ বাংলা বা ইংরাজী ভাষায় সেগুলির বিশদ অনুবাদ হয় নি। প্রক্ষিপ্ত যে সব অংশ আমাদের হাতে এসেছে তাতে বিকৃতি ও অসংলগ্নতার অন্ত নেই।

লামা তারানাথের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, ধর্মপালের সময়ে পালরাজ্যে ৪টি মহাবিহারসহ প্রায় ৫০টি বৌদ্ধবিহার ছিল।

মগধের বিক্রমশীলা বিহার তিনি নিজে নির্মাণ করেন ; বরেন্দ্রভূমির সোমপুরী বিহারের নির্মাণকার্য্য শেষ হয় তাঁর পুত্র দেবপালের সময়ে ; গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্ত নালন্দায় যে মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন তখনও তা কিরণ বিকিরণ করছিল। ওদন্তপুরী মহাবিহার নির্মাণ করেন প্রথম পালরাজ গোপালদেব।১ মগধের ক্ষুদ্রতর ত্রৈকূট বিহারে তপস্যা করতেন আচার্য্য হরিভদ্র।

গৌড়ে মধ্য-এশিয়ার শরণার্থী

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বে মধ্য-এশিয়ায় বিরাট আলোড়ন হয়ে গেছে। সেই যে আরব সেনাপতি কুতাইবা ৭১২ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দের বৌদ্ধ শাসক ইক্‌সেধ ঘুরককে পরাজিত করেন তারপর থেকে চলে বৌদ্ধ মুসলমানে অবিরাম সংগ্রাম। মধ্যে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য সসৈন্যে সেখানে গিয়েছিলেন। তার পরও স্থানীয় বৌদ্ধগণকে শক্তি যোগাচ্ছিল তিব্বত। প্রধানতঃ তিব্বতী বাহিনীর পরাক্রমের ফলে পূর্বদিকে ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। এমন কি খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সময়ে (৭৮৬-৮০৯) তিব্বতী সৈন্যগণ জনৈক মুসলমান বিদ্রোহীর পক্ষাবলম্বন করে খলিফার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তার পূর্বে ৭৫১ খৃষ্টাব্দে চীনা বাহিনীর পরাজয়ের ফলে মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রতিরোধ চিরতরে ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আরবদের আধিপত্য।

এই সর্বাত্মক পরাজয়ের পর অসংখ্য বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়। আবার অনেকে ধর্ম ত্যাগের পরিবর্তে স্বদেশ ত্যাগ করে। খোটান মহাবিহারের অধ্যক্ষ স্থবির সঙ্ঘবর্দ্ধন প্রমুখ বহু অর্হৎ আশ্রয়ের সন্ধানে তিব্বতের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু কোথায় যাবেন ? সর্বত্র আগুন জ্বলছে। বোখারা, সমরখন্দ, কাশগড়, ফরগণা, তোখারীস্থান সকল বৌদ্ধ রাজ্যেই আরবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয় ইসলাম কবুল কর, নয় নিপাত যাও। ধর্মোন্মাদগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে হাজার হাজার

বৌদ্ধ শরণার্থী এল সিংকিয়াংএর সালবাই অঞ্চলে। স্থানটি তখন তিব্বত সাম্রাজ্যের এক প্রদেশ। কিন্তু স্থানীয় রাজপুরুষরা সেই বিপুল সংখ্যক নরনারীর পুনর্বাসনে ইতস্ততত। দেখাতে লাগলেন। অনাহারে, রোগে ও শীতে অনেকের জীবনলীলা সাঙ্গ হোল। তিব্বতরাজ মেসাগ-তিসোম সেই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না; কিন্তু তাঁর মহিষী চীন সম্রাট দুহিতা চীন-চেং ছিলেন নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ। স্বধর্মীয় শরণার্থীদের করুণ কাহিনী কানে এসে পৌঁছালে রাণীর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাঁর নির্দেশে সালবাইয়ের ক্ষত্রপের কাছে আদেশ পাঠান হয় সকল শরণার্থীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে; যারা তিব্বতে আসতে চায় বিনা দ্বিধায় তাদের পাঠিয়ে দিতে।[২]

মধ্য-এশিয়ার এই শরণার্থীদের মধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী স্থবির ছিলেন। তাঁদের আগমনে তিব্বতে বৌদ্ধমত নবজীবন লাভ করে। কিন্তু রাজপরিবারের উপর তাঁদের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে অভিজাত শ্রেণীর কিছু সংখ্যক তিব্বতীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। আবার বোনপো-পন্থীরা তাঁদের নামে নানারূপ কুৎসা রটাতে থাকে। এই সব বিরোধীতায় উত্যক্ত হয়ে তাঁদের অনেকে চলে যান উদয়ন, গিলগিট, লাদাক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজ্যে।

কয়েকজন যে গৌড়েও এসেছিলেন এরূপ অনুমান আমরা করতে পারি। অনুমান অবশ্য অনুমান। কিন্তু পাল রাজ্যে সেই সময় যে কয়টি মহাবিহার নির্মিত হয় সেগুলির পরিচালনার জন্য অধ্যাপক সংগ্রহের অন্য কোন সূত্রও তো দেখতে পাচ্ছি না। কয়েক বৎসর পূর্বে আদিশূরকে মাত্র দশ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জন্য যেক্ষেত্রে কোলাঞ্চরাজের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল, সেক্ষেত্রে অবৌদ্ধ এক ভূভাগে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারগুলির পরিচালনার জন্য শত শত আচার্য্য গৌড় বা মগধ থেকে সংগৃহীত হোল কেমন করে?

গৌড় ও তিব্বত

গৌড় কাহিনীর মধ্যে তিব্বতের ইতিহাস ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করছে। ধান ভানতে বসে শিবের গীত গাইতে হচ্ছে! কিন্তু উপায় নেই। কৃষ্টির ক্ষেত্রে গৌড় ও তিব্বত এখন পরস্পারের সঙ্গে এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে আমাদের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মধ্য-এশিয়ার শরণার্থীদের যখন তিব্বত থেকে দূরীভূত করা হয় রাজা মেসাগ-তিসোম ও রাণী চিন-চেং তখন ইহজগতে নেই। তাঁদের বালক পুত্র খ্রি-স্রোন্ আইদে-বিৎসান এখন তিব্বতাধীশ। কিন্তু রাজসভা দ্বিধাবিভক্ত, শক্তিমান বোনপোপন্থী মন্ত্রী ও সভাসদগণ বৌদ্ধদের একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছে। শুধু যে বহিরাগত বৌদ্ধগণ বিদায় নিয়েছে তা নয় স্থানীয় বৌদ্ধরাও মাথা তুলতে পারছে না। এই বৌদ্ধ নিপীড়ন তরুণ রাজার সমর্থন লাভ করে নি। যৌবনে উপনীত হয়ে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণের পর তিনি একদিকে বোনপো-পন্থীদিগকে ধীরে ধীরে অপসারিত করেন এবং অন্যদিকে বৌদ্ধমতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নালন্দা থেকে স্থবির শান্তিরক্ষিতকে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। জনৈক শ্রমণকে চীনে পাঠান হয় ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য। কিন্তু চীনা বৌদ্ধরা তাঁকে জানায়, বোনপোর প্রভাবে তিব্বতের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে জম্বুদ্বীপের শক্তিমান তান্ত্রিক পদ্মসম্ভব ব্যতীত দৈত্য নিধন করতে আর কেউ পারবে না।

পদ্মসম্ভব উদয়নের অধিবাসী। বৌদ্ধগাথা অনুসারে তিনি অমিতাভের পুত্র। শৈশব থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে উদয়নরাজ* ইন্দ্রভূতি তাঁকে পুত্রবৎ লালনপালন করতে থাকেন।

* উদয়ন—গান্ধারের অংশ বিশেষ; এখনকার স্বোয়াত উপত্যকা ও সন্নিহিত ভূভাগ নিয়ে গঠিত বৌদ্ধ রাজ্য। রাজধানী গজনী। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন এখানে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

বুদ্ধশান্তিপাদ ও অন্যান্য গুরুর কাছে শিক্ষালাভের ফলে তিনি তন্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে স্বয়ং বজ্রবরাহী তাঁর বশীভূত হন; ডাকিনী মন্দারবা তাঁর ভৈরবীর কাজ করত।

রাজা খ্রি-স্রোন্এর আহ্বানে পদ্মসম্ভব তিব্বতে গিয়ে বোনপো নেতাগণকে একে একে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাদের সকল চক্রান্ত চূর্ণ করে ওই দেশে বৌদ্ধমত পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। পদ্মসম্ভব ও শান্তিরক্ষিতের পরামর্শে তিব্বতরাজ ওদন্তপুরীর অনুকরণে সাম্যে মহাবিহার নির্মাণ করেন। চীনা বৌদ্ধরা সেই সময় তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু তাদের নেতা হোসাং মহাযান রাজার সম্মুখে তর্কযুদ্ধে শান্তিরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলের কাছে পরাভূত হওয়ায় ভারতীয় বৌদ্ধগণ তিব্বত দরবারে বিশেষ মর্য্যাদা ভোগ করতে থাকে।[৩]

খ্রি-স্রোন্ আইদে-বিৎসানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ চীন, নেপাল, কাশ্মীর ও উদয়ন থেকে বৌদ্ধাচার্য্যগণ তিব্বতে যেতেন। তাঁর পৌত্র রল-পচনের সময়ে হাওয়া ভিন্ন দিক থেকে বইতে থাকে। পণ্ডিত সংগ্রহের জন্য এই রাজা পালরাজ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। তাঁর সময়ে বহিরাগত প্রায় সকল আচার্য্য নালন্দা, বিক্রমশীলা বা ওদন্তপুরীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এই রাজার প্রেরণায় মহাবুৎপত্তি নামে যে বৌদ্ধ বিশ্বকোষ রচিত হয় তাতে পাল রাজ্যের কয়েকজন পণ্ডিত অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিযুক্ত ভাষা কমিশনের একাধিক সদস্য গিয়েছিলেন গৌড় বা মগধ থেকে।

আততায়ীর হস্তে ধর্মপ্রাণ রাজা রল-পচনের জীবনাবসান হোলে উগ্র বৌদ্ধবিদ্বেষী লন্দার্মা তিব্বত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে সমগ্র তিব্বতে চলে বীভৎস বৌদ্ধ নিপীড়ন। তার ফলে শুধু বহিরাগত নয়, স্থানীয় সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই নাটকের শেষ অধ্যায়ে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

কর্তৃক লন্দার্মা নিহত হোলেও বোনপোপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পায় নি। দীর্ঘ ৭৫ বৎসর ধরে তারা তিব্বতের রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। সেই সময়ে ধর্মের ন্যায় শাসন ব্যবস্থায়ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; বিশাল তিব্বতী সাম্রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে যায়।

এই অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটিয়ে লন্দার্মার বংশধর রাজা ইসেসোদ শুধু তিব্বতের রাষ্ট্রীয় শক্তি পুনরুজ্জীবিত করেন নি, বৌদ্ধমতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার বহু পূর্বে উদয়নের পতন হয়েছে, কাশ্মীরের উপর চলেছে বিধর্মীদের আক্রমণ। তাই রাজভিক্ষু ইসেসোদকে ধর্মাচার্য্যের অন্বেষণে পালরাজ্যে দূত পাঠাতে হয়। মগধের স্থবির ধর্মপাল নিযুক্ত হন তাঁর উপাধ্যায়। অমিতাভের জ্যোতিতে তিব্বত যাতে পুনরুদ্ভাসিত হয় সেজন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য সুনির্বাচিত একুশজন তরুণকে তিনি কাশ্মীর ও মগধ-গৌড়ের বিভিন্ন মহাবিহারে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে রিন্-চেন জ্যাং-পো (৯৯৮–১০৫৫) বৌদ্ধ ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তি।

রিন্-চেনের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধর্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে গৌড় থেকে শ্রদ্ধাকরবর্মণ, পদ্মাকরগুপ্ত, কমলগুপ্ত, রত্নবজ্র প্রমুখ মনীষীগণ তিব্বতে গিয়ে তাঁকে অনুবাদকার্য্যে সাহায্য করেন। বহু ধর্মগ্রন্থ তিব্বতীতে অনুদিত হয়। কিন্তু আরও চাই। বৌদ্ধমতকে ক্লেদমুক্ত করবার জন্য আরও ধর্মাচার্য্যের প্রয়োজন। রাজা ইসেসোদ যখন উপযুক্ত পণ্ডিতের সন্ধান করছিলেন সেই সময়ে তাঁর কাছে সংবাদ গেল যে এ বিষয়ে বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য্য অতীশ দীপঙ্করের যোগ্যতা অসামান্য। কিন্তু তুর্কীস্থানে বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সেই অর্হৎকে স্বরাজ্যে আনা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী তিব্বতরাজ বায়ান-চুব-অদ তাঁর অপূর্ণ বাসনা পূরণ করতে উদ্যোগী হন।

অতীশ দীপঙ্কর

গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বকালে সাহোরা জেলার বিক্রমপুরী নগরীতে এক রাজপরিবারে অতীশের জন্ম হয়। তিব্বতীদের চক্ষে তিনি জব-অর্জে—মহৎ ব্যক্তি। বাল্যকালে বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যতীত ব্যাকরণ, দর্শন এবং ভেষজবিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভের পর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন। নয়টি পুত্রকন্যাও হয়। কিন্তু আরাধ্যা দেবী তারা তাঁকে সংসারে আবদ্ধ থাকতে দিলেন না, স্ত্রীপুত্রের মায়া ত্যাগ করে একদিন তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন।৫

এবার তন্ত্রে দীক্ষা। ওদন্তপুরী মহাবিহারে শান্তিপা, নরোপা প্রভৃতি তান্ত্রিকদের কাছে শিক্ষালাভের পর তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে তখন পালরাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি সেখানে গিয়ে আচার্য্য চন্দ্রকীর্তির কাছে দীর্ঘ দিন ধরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তারপর সিংহলের পথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পবিচয় পেয়ে তাঁকে বিক্রমশীলা মহাবিহারে আহ্বান জানান হয়। স্থবির রত্নাকর ও আচার্য্য অতীশ ওই মহাবিহারের দুইটি স্তম্ভ ছিলেন।

অতীশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য রাজা বায়ান-চুব-অদের কর্মচারী যখন বিক্রমশীলায় আসেন তখন তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর। সে বয়সে দূরদেশে যাওয়া চলে না, কিন্তু তারাদেবীর প্রত্যাদেশ পেয়ে ১০৪০ খৃষ্টাব্দের এক শুভদিনে তাঁকে রওয়ানা হতে হোল। নেপালের পথে তিব্বত পৌঁছে তিনি তিব্বতরাজকে তন্ত্র শিক্ষা দেন এবং থোলিন্ সঙ্ঘারামে অবস্থান করে বৌদ্ধমতকে আবিলতামুক্ত করতে উদ্যোগী হন। তাঁর ও রিন্-চেন জ্যাং-পোর যৌথ প্রচেষ্টায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয়। বোধিপথপ্রদীপ নামে একখানি মৌলিক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। সম্ভলে প্রচলিত কালচক্ররীতি অনুসরণ করে কাল গণনার নূতন পদ্ধতিরও তিনি প্রবর্তন করেন। মাতৃভূমিতে

প্রত্যাবর্তন তাঁর অদৃষ্টে ছিল না ; ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিক্রমশীলা মহাবিহার

ব্রাহ্মণ্য মতের ভিত্তিতে প্রজাদের কৃষ্টি জীবনের উন্নয়নের জন্য আদিশূর যখন কনৌজ থেকে পাঁচজন শক্তিশালী ব্রাহ্মণকে এনে কালীঘাট, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে পাঁচটি চতুষ্পাঠী খোলেন তার কয়েক বৎসর পরে ধর্মপাল তাঁর রাজ্যের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ শ্রমণ নিয়োগ করে প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রেরণায় গৌড় ও মগধে বহু শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়। সেখানে পাঠ সমাপনের পর যারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে চাইত তাদের জন্য নালন্দা আছে। কিন্তু নালন্দা বহু দূর। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সমস্ত জগতের জন্য উন্মুক্ত ; স্থানীয় ছাত্রদের সুযোগ সেখানে সীমাবদ্ধ। তাই ধর্মপাল বিক্রমশীলায় আর একটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে এই মহাবিহার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা গেলেও তুর্কীরা পরে এটিকে এমনভাবে ধ্বংস করে যে এর সঠিক অবস্থান পর্য্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। এখনকার ভাগলপুর জেলার চম্পাকনগরের সন্নিহিত গঙ্গাতীরবর্তী কোনও স্থানে বিহারটি অবস্থিত ছিল। কিন্তু কোন সে স্থান এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে শিলাময় ভূখণ্ডের উপর মহাবিহারটি নির্মিত হয়েছিল, বৌদ্ধ-কাহিনী অনুসারে, বহুকাল পূর্বে বিক্রম নামে এক যক্ষ সেখানে নিহত হওয়ায় স্থানটির নাম হয় বিক্রমশীলা। তিব্বতী শাস্ত্রকারদের মতে মহাবিহার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানটি নির্বাচিত করেন তান্ত্রিকাচার্য্য কাম্পিল্য। এখানকার সৌন্দর্য্য ও নির্জনতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি বুঝে নেন যে বিহার নির্মাণের জন্য সেই স্থান অনবদ্য। কিন্তু রাজ-শক্তির সাহায্য না পাওয়ায় তাঁর অভিলাস অপূর্ণ থেকে যায়। মৃত্যুর

পর তিনি গৌড়েশ্বর ধর্মপালরূপে জন্মগ্রহণ করে পূর্বজন্মের অভীপ্সা পূরণে ব্রতী হন।

নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলাও ছিল প্রাচীরবেষ্টিত মহাবিহার। এর প্রধান প্রবেশদ্বারে নাগার্জুনের প্রতিকৃতি ক্ষোদিত করা হয়েছিল। বেষ্টনী প্রাচীরের বাহিরে অভিভাবক ও অতিথিদের জন্য নির্মিত হয়েছিল এক ধর্মশালা। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত এখানে জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হোত। সেজন্য কেন্দ্রস্থলে ছিল বিজ্ঞানভবন। তার ছয়টি দ্বার ছয়টি বিদ্যাভবনের দিকে উন্মুক্ত থাকত। এক একজন দ্বারপণ্ডিত এক এক বিদ্যাভবনের তত্ত্বাবধান করতেন; তাঁদের সাহায্য করতেন ১০৮ জন করে আচার্য্য। সমগ্র মহাবিহারে যে কয়েক শত অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের উপাধি ছিল পণ্ডিত। প্রয়োজনের সময় আট হাজার ছাত্রের মিলিত হবার মত একটি মুক্ত অঙ্গন মহাবিহারে ছিল।

যে ছয়জন দ্বারপণ্ডিতের কথা পূর্বে বলেছি তাঁদের তর্কে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে পাঠেচ্ছু ছাত্রগণকে এই মহাবিহারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোত। লামা তারানাথের বিবরণ অনুসারে এক সময়ে পূর্ব দরজার দ্বারপণ্ডিত ছিলেন রত্নাকরশান্তি, পশ্চিম দরজার ভগীশ্বর-কীর্তি, উত্তর দরজার নারোপা, দক্ষিণ দরজার প্রজ্ঞাকরমতি, মধ্য দরজার রত্নবজ্র এবং দ্বিতীয় মধ্য দরজার জ্ঞানশ্রীমিশ্র। এঁদের সমকক্ষ আরও দুই জন মহাপণ্ডিত বিক্রমশীলায় ছিলেন। তাঁদের উপর কেন্দ্রীয় ধর্মবিদ্যালয়ে শাস্ত্র শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল। এই আটজন মহাপণ্ডিতকে মহাবিহারের আটটি স্তম্ভ বলে মনে করা হোত।

বিক্রমশীলার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন গৌড়েশ্বর ও তাঁর সামন্তবৃন্দ। ছাত্রগণ বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি পেত। অবসর সময়ে পাণ্ডুলিপি নকল করে তাদের অনেকে কিছু কিছু উপার্জনও করত। অনুরূপ এক পাণ্ডুলিপি অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞা-

পারমিতা লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

বিক্রমশীলায় মাঝে মাঝে ধর্মসভার অনুষ্ঠান হোত। তিব্বতরাজ প্রেরিত যে সব ব্যক্তি অতীশকে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন অনুরূপ এক ধর্মসভায় যোগ দিয়ে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হোল—

> প্রত্যুষে সেই ধর্মসভায় যখন শ্রমণগণ মিলিত হোলেন আমি তখন একজন স্থবির কর্তৃক পরিচালিত হয়ে তাঁদের মধ্যে আসন গ্রহণ করলাম। সর্বপ্রথম পূজ্যপাদ বিদ্যাকোকিলা সেই সভায় পৌরহিত্য করবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হোলেন। মহত্ত্বব্যঞ্জক তাঁর অবয়ব ; সুমেরু পর্বতের ন্যায় ঋজু হয়ে নিজ আসনে উপবেশন করলেন। পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি দীপঙ্কর অতীশ কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, হে তিব্বতীয় আয়ুষ্মান, আপনি কি বলছেন? ইনি আচার্য চন্দ্রকীর্তির শিষ্য পূজ্যপাদ লামা বিদ্যাকোকিলা। আপনি কি জানেন না, ইনি জব অতীশের গুরু ছিলেন।
>
> তখন আমি পুরোভাগে উপবিষ্ট আর একজন আচার্য্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি অতীশ কিনা। উত্তরে শুনলাম, তিনিও অতীশের শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ নরোপন্থ। শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি সমগ্র বৌদ্ধজগতে দ্বিতীয় নেই। এইভাবে আমার চক্ষু যখন অতীশের অন্বেষণ করছিল সেই সময়ে বিক্রমশীলারাজ সেখানে এসে উচ্চাসনে উপবেশন করলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে আসলেন গুরুগম্ভীর প্রকৃতির একজন পণ্ডিত। তরুণ আয়ুষ্মানগণ গাত্রোত্থান করে তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন, রাজাও আসন ছেড়ে উঠলেন। তাঁর দেখাদেখি ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণও উঠে দাঁড়ালেন। সেই লামার উপর এইভাবে সম্মান বর্ষিত হোতে দেখে আমি তাঁকে রাজগুরু বা অনুরূপ কোন স্থবির বা

> স্বয়ং অতীশ মনে করে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। উত্তরে শুনলাম, তিনি একজন আগন্তুক। নাম বীরভদ্র। নিবাস ও জ্ঞানের গভীরতা কারও জানা নেই।
> এইরূপে সেই বিদ্বজ্জন সভায় সমস্ত আসন যখন অধিকৃত হয়ে গিয়েছে তখন তাঁর সমস্ত গরিমা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হোলেন মহাজ্ঞানী অতীশ। তাঁর কমনীয় মুখ ও চিত্তাকর্ষক অবয়ব সমস্ত সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। তাঁর কটিদেশে এক গুচ্ছ চাবি ঝুলছিল। ভারতীয়, নেপালী ও তিব্বতীগণ তাঁকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগল এবং নিজের দেশবাসী বলে জ্ঞান করল। ৬

ইনি অতীশ দীপঙ্কর। এই বিক্রমশীলা মহাবিহার। দীর্ঘ চার শত বৎসর ধরে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করে এই মহাতীর্থ একদিন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি যেখানে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করতেন সেখানে আবির্ভূত হোল বখ্‌তিয়ার খিলজীর তুর্কী সেনাগণ। বিদ্যার মূল্য তাদের কাছে কিছুই নয়—জ্ঞানার্জন অর্থহীন বিলাস। তারা শিখেছিল এই সব প্রতিষ্ঠান ভাঙলে পুণ্য হয়—ধনলাভও হয়। তাই পরম উৎসাহে বিক্রমশীলাকে গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দিল!

1 Datta B. N. *Mystic Tales of Lama Taranath, p. 41*
2 Thomas F. W. *Tibetan Literary Texts and Documents Concerning Chinese Turkesthan, p. 77*
3 Sumpa Khan-po Yece Pal-Jor *Pag Sam Jon Zang, p. 170-73*
4 Petech L. *Study of the Chronicles of Ladakh, p. 69-70*
5 Hoffman H. *The Religions of Tibet, p. 119*
6 Vidyabhusan S. C. *Mediæval School of Indian Logic, p. 150*

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গৌড় ও শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য

শ্রীবিজয়ের পরিচয়

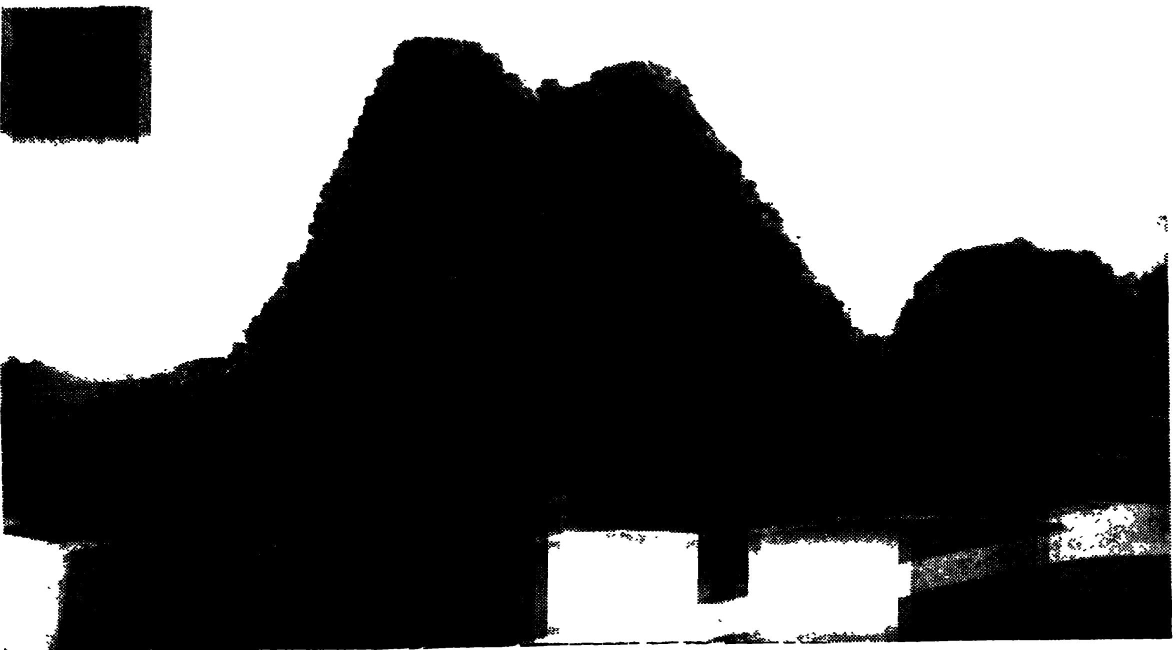
এশিয়ার মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের বুকে ইন্দোনেশীয়া নামে যে দ্বীপমালা ভেসে রয়েছে তার সঙ্গে ভারতের পরিচয় কিছু নূতন নয়। প্রাচীনতম বহু সংস্কৃত গ্রন্থে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। সুমাত্রা থেকে প্রচুর স্বর্ণ পূর্বে আমদানী হোত বলে তার ভারতীয় নাম সুবর্ণ দ্বীপ। এখন বালি ব্যতীত অন্যান্য দ্বীপ ধর্মান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। দ্বীপবাসীদের জীবনে রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব খুব বেশী। প্রধান ভাষা কবিতে অর্জুনবিবাহ, ভারতযুদ্ধ* বান্দুং আদিশক, মাণিকমায়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম পুস্তকগুলি ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। লক্ষ্মীদেবী মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকেও পূজা পান।১ গরুড়দেবের জনপ্রিয়তা খুব বেশী বলে প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। শুধু কি তাই? গত শতাব্দীতে যব ঐতিহাসিক নাথকুসুম এই দ্বীপরাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, কিম্বদন্তী অনুসারে বিষ্ণু অনন্তশয্যা ত্যাগের পর যবদ্বীপে বাস করতেন। কিন্তু সংযামগুরুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মার পৌত্র জালপাশির পুত্র ত্রিতুষ্টি যবদ্বীপের রাজারূপে প্রেরিত হন। তিনি ওই দেশের প্রথম রাজা।

* ভারত-যুদ্ধ—সংস্কৃত থেকে কবি ভাষায় অনুদিত মহাভারত; প্রথম প্রকাশ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দ।

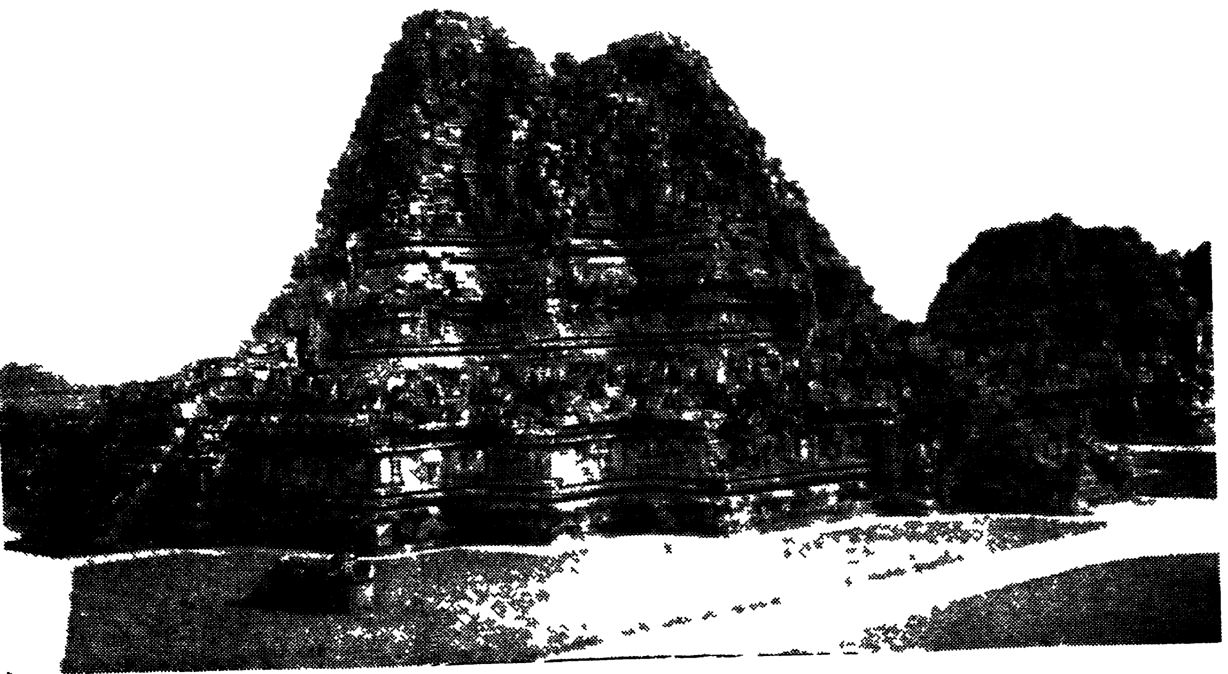
খৃষ্টজন্মের কিছু পূর্ব বা পর থেকে দক্ষিণ ভারতের পহ্লবগণ যবদ্বীপের স্থানে স্থানে কয়েকটি উপনিবেশ এবং সেই সঙ্গে শৈবমত প্রতিষ্ঠিত করে। ফা-হিয়েন ৪১৩ খৃষ্টাব্দে এখানে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ দেখেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধের সংখ্যা নামমাত্র। তার কয়েক বৎসর পরে কাশ্মীরী ভিক্ষু গুণবর্মণ চীন যাবার পথে জনৈক যবরাজ ও তাঁর মাতাকে বৌদ্ধমতে দীক্ষা দেওয়ার পর থেকে এই মত দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। দুই শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ অমিতাভের জ্যোতিতে এরূপভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে পরিব্রাজক ই-ৎসিং ৬৭১ ও পুনরায় ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রা ভ্রমণের পর লেখেন যে প্রত্যেক চীনা তীর্থযাত্রীর উচিত ভারত যাবার পথে কিছু দিন এখানে অবস্থান করা। এখানকার রাজধানী শ্রীবিজয়ে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন।

সুমাত্রা তখন যব-বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র রাজ্য। মালয়ের কতকাংশও এখানকার রাজবংশের অধিকারভুক্ত। আধুনিক পালেম্বাংএর নিকট অবস্থিত এই রাজ্যের নূতন রাজধানী শ্রীবিজয়ের ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। এখানকার প্রধান বৌদ্ধবিহারে ই-ৎসিং সহস্রাধিক ভিক্ষুর দেখা পেয়েছিলেন। এই রাজ্যের রাজদূত কুমার ৭২৪ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রায় একই সময়ে শৈলেন্দ্র নামক এক সৈনাধ্যক্ষ মধ্য-যবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। শ্রীবিজয় ছিল বৌদ্ধপন্থী, যবদ্বীপ কিন্তু শৈব। আদিশূর যখন রাঢ়ে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছিলেন সেই সময়ে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে শৈলেন্দ্রের বংশধর রাজা সঞ্জয় দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একে একে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয়ের পর সমগ্র যবভূমির উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। সুমাত্রা, বালি, মাদুরা ও অন্যান্য দ্বীপেও সে অধিকার প্রসারিত হয়। সঞ্জয় ও তাঁর বংশধরদের পরাক্রমের ফলে শুধু শ্রীবিজয় নয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শৈলেন্দ্র বংশের অধিকারভুক্ত হয়। এক সময়ে এই অধিকার পূর্বদিকে ফিলিপাইন ও



যবদ্বীপ—লোরো জংগ্রামের চণ্ডী মন্দির
নবম শতাব্দীতে নির্মিত



যবদ্বীপ—লাবে জ গ্রামের চণ্ডী মন্দির

দেশে এইরূপ লিপিচাতুর্য্যের আশ্রয় লওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

মহাযান মত গ্রহণের পর থেকে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সমাজ জীবনে গৌড় প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। সম্রাট পরিবারের কুলগুরু কুমারঘোষ গিয়েছিলেন গৌড়দ্বীপ থেকে ; শ্রীবিজয় রাজধানীতে তিনি একটি মঞ্জুশ্রীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ও পুরোহিতদের পরামর্শে সম্রাট পনঙ্করণ ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের বিখ্যাত কালাসন মন্দির নির্মাণ করেন। ভগবতী আর্য্যতারাকে স্মরণ করে ওই মন্দির সম্রাজ্ঞী তারার নামে উৎসর্গ করা হয়।[৬]

এখন থেকে শ্রীবিজয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম বৌদ্ধ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে থাকে। এখানকার মহাবিহার বিক্রমশীলা-ওদন্তপুরীর ন্যায় দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করে। একাদশ শতাব্দীতে স্থবির চন্দ্রকীর্তি ছিলেন সেই মহাবিহারের প্রধান সঙ্ঘাধ্যক্ষ। তাঁর কাছে দ্বাদশ বর্ষ শাস্ত্রাধ্যয়নের পর দীপঙ্কর অতীশের শিক্ষাজীবন শেষ হয়।

বালপুত্রদেবের তাম্রশাসন

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি, সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥

পূর্ব প্রবন্ধে যে তাম্রশাসনখানির কথা উল্লেখ করেছি নালন্দার ধ্বংসস্তূপ খননের সময়ে সেটি আবিষ্কৃত হয়। আরও অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু এই তাম্রপট্টটির গুরুত্ব সমধিক। এর উপর

ক্ষোদিত লিপির ভিতর দিয়ে সে যুগের ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায় লোকচক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে; দেবপালের খ্যাতি যে নিজ রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে সাগরপারে পৌঁছেছিল তা বোঝা যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধ সূত্র থেকে সবাই জানত, বুদ্ধের বাণী সে সময়ে তিব্বত, গৌড় ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এক অদৃশ্য সেতু রচনা করেছিল; কিন্তু তিনটি দেশের শাসকদের মধ্যে সম্বন্ধ যে কিরূপ ছিল তা জানবার কোন উপায় ছিল না। তাম্রলিপিটিতে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের পুরাতাত্ত্বিকদের মনে প্রবল ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়।

বহু শতাব্দী ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবার পর তাম্রপট্টটি যখন অন্ধকারময় গহ্বর ছেড়ে উপরে চলে আসে তখন দেখা গেল, এটি একটি মৌন ধাতুখণ্ড নয়। সমস্ত পৃথিবী যে কথা ভুলে গিয়েছিল সহস্রাধিক বৎসর পরে তাই উচ্চারণ করে সে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিল। এই তাম্রপট্ট দ্বারা গৌড়েশ্বর দেবপালের রাজ্যাভিষেকের ৩৮ বর্ষে ২১শে কার্তিক তারিখে যবদ্বীপের শ্রীবিজয় সম্রাট বালপুত্রদেব মগধের শ্রীনগরভুক্তির অধীনস্থ রাজগৃহ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নন্দীবনাক, মনিবটিক, নারিকা ও হস্তীগ্রাম এবং গয়া বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত পালামক এই পাঁচখানি গ্রাম নালন্দা মহাবিহারে বুদ্ধসেবা; ভিক্ষুসঙ্ঘের বলি, চরু, চীবর প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ; ধর্মগ্রন্থ লিখন ও বিহার সংস্কারের জন্য দান করেন।[৭] সংশ্লিষ্ট অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হোল—

১

যবভূমিতে সর্ব-ভূপ-শিরোমণি মৌলিমালা-বিভূষিত এক রাজা ছিলেন যাঁহার নাম পর্য্যন্ত বীর-বৈরী-মথন অরাতিকুলের হৃদয় স্নিগ্ধকারী ছিল।

২

সেই রাজার যশোগীতি সদাসর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইয়া হর্ম্ম্যে-স্থলে-কুমুদে-পদ্মে-শঙ্খে-শশধরে-তুহিনে-পুষ্পে-তুষারে ছড়াইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৪

তাঁহার এক জ্ঞানী বীর্য্যবান পরাক্রমশালী সমরকুশলী সুদর্শন সুশীল শত-রাজেন্দ্র-বিজয়ী পুত্রের যশোরাশি যুধিষ্ঠির পরাশর ভীমসেন অর্জ্জুনের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৭

পৌলমি যেমন সুরগণের প্রভু রতি যেমন মদনের পার্ব্বতী যেমন শিবের এবং লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী সোমবংশোদ্ভব মহারাজ ধর্ম্মসেতুর দুহিতা তারা তেমনি সেই রাজার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং জগদ্ধাত্রী তারার অবতার-স্বরূপা।

৮

কামদেবজয়ী শুদ্ধোদন-তনয় যেমন মায়াদেবীর গর্ভে জন্মাইয়াছিলেন নন্দিত-হৃদয় স্কন্দ যেমন শিব-ঔরসে উমার গর্ভে জন্মাইয়াছিলেন তেমনি সেই নৃপতির ঔরসে তাঁহার গর্ভে সর্বনরেন্দ্র-গর্ব-খর্বকারী বালপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৯

নালন্দা-গুণবৃন্দ-লুব্ধ মনে শুদ্ধোদন-পুত্রের প্রতি ভক্তিপ্লুত চিত্তে ঐশ্বর্য্যবৈভব সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় অনিত্যজ্ঞানে সেই রাজা নানা সদ্‌গুণশালী ভিক্ষুসঙ্ঘের নিমিত্ত একটি বিহার নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করেন।

১০

ভক্তিপ্লুত-চিত্তে তিনি দূতমুখে* সমস্ত-শত্রুবনিতা-বৈধব্য-দীক্ষাগুরু মহারাজ দেবপালদেবের নিকট নিজ অভিলাষের কথা জ্ঞাপন করাইলে তিনি তাঁহার পিতৃ-লোকহিতের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিলেন।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ খননের সময়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হীরানন্দ শাস্ত্রী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বালপুত্র বিহারের এক বৈঠকখানার ভিতর তাম্রশাসনটির সন্ধান পান। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট পাথরের

* এই দূতের নাম বলবর্ম্মণ—বালপুত্রদেবের অন্যতম সামন্ত।

মধ্যে সুদূর অতীতে অনুষ্ঠিত অগ্নিদাহের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান ছিল। অগ্নিদাহ! সাত শ' বৎসর পূর্বে শেষ পালরাজ গোবিন্দপালের কাছ থেকে মগধ জয়ের পর বখ্‌তিয়ার খিলজীর তুর্কী সৈনিকগণ যে নালন্দাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল এ বোধ হয় তার চিহ্ন। সে সময়ে হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থ পুড়ে ছাই হোলেও তাম্রপট্টটি অবিকৃত থাকে। অতীত যুগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এটি যেন দীর্ঘ দিন মাটির নীচে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করছিল!

বালপুত্র বিহার

বালপুত্রদেব ছিলেন শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। একনিষ্ঠ বৌদ্ধ হিসাবে নালন্দার উন্নয়নের জন্য তিনি এই যে বিহারটির প্রতিষ্ঠা করেন তার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর হোলেও নালন্দা ছিল পাল রাজ্যে অবস্থিত। সেই কারণে তাম্রশাসনে তাঁর ও তাঁর অজ্ঞাতনামা পিতার স্তুতি যথেষ্ট থাকলেও সেটি সম্পাদিত হয় গৌড়েশ্বর দেবপালের নামে। আবিষ্কর্তা হীরানন্দ শাস্ত্রী হিসাব করে দেখেছেন, দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন ও এটির মধ্যে ব্যবধানকাল ছয় বৎসর।

নালন্দার বালপুত্র বিহার যখন আবিষ্কৃত হয় ইন্দোনেশিয়া তখন হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত। সেই কারণে বস, মুস, বারনেট-কেম্‌পার প্রমুখ ওলন্দাজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতে থাকেন। বালপুত্র বিহারে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানকার্য্য চালিয়ে বারনেট-কেম্‌পার[৮] যে পুস্তকখানি লেখেন তাতে দেখা যায় যে বিহারটি ছিল দ্বিতল; দক্ষিণ প্রান্তের সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ দেখে তাঁর মনে হয়েছে ত্রিতলও হতে পারে। সকল বিহারে যেমন শ্রমণদের জন্য অনেকগুলি স্বতন্ত্র কুঠুরী থাকত এখানেও তাই ছিল। প্রধান তোরণদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কিছুটা পূর্ব দিকে অগ্রসর হোলে মন্দিরে পৌঁছান যেত। ওই তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে যে সব মূর্তি খোদিত ছিল অগ্নিদাহে সেগুলি

এরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছিল যে ধ্বংসস্তূপ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। দরদালানের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের কুলুঙ্গিগুলি থেকে কয়েকটি মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। আলোচ্য তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে দরদালান সংলগ্ন বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে।

অগ্নিদাহে সকল দাহ্য পদার্থ ধ্বংস হোলেও তাম্রপট্টটির ন্যায় প্রস্তর ও ধাতুমূর্তিগুলি অবিকৃত ছিল। বারনেট-কেম্পারের হিসাব অনুসারে ধাতুমূর্তির সংখ্যা ২০৩; সেগুলি ব্রোঞ্জ নির্মিত। অথচ নালন্দার আর কোথাও ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া যায় নি। বস আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন, উত্তর ভারতের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে ব্রোঞ্জের স্থান নেই বললেও চলে; সর্বত্র প্রস্তর বা পিতল ব্যবহৃত হয়েছে। সেই কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, বালপুত্র বিহারের মূর্তিগুলি হয় যবভূমিতে নির্মিত হয়েছিল, নতুবা যব শিল্পীরা নালন্দায় এসে সেগুলি নির্মাণ করেছিল। ব্রোঞ্জের মূর্তি সে সময়ে যবদ্বীপে নির্মিত হোত—পালরাজ্যে নয়।

মূর্তিগুলির স্বাতন্ত্র্যও ওলন্দাজ গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। নালন্দার অন্যান্য মূর্তি অপেক্ষা জাকার্তা ও হল্যাণ্ডের লাইদেন মিউজিয়মে রক্ষিত বিগ্রহগুলির সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য বেশী। সে যুগে ইন্দোনেশিয়ায় যে সব বিগ্রহ বেশী পূজা পেতেন সেগুলি বালপুত্র বিহারে স্থাপন করা হয়েছিল। এই থেকেও তাঁরা অনুমান করেন, হয় বিগ্রহ নতুবা ভাস্কর যবদ্বীপ থেকে জাহাজে চড়ে পালরাজ্যে এসেছিল।

নালন্দার সুবর্ণ যুগ

নালন্দা যে কবে প্রথম নির্মিত হয়েছিল কেউ তা বলতে পারে না। ভারতে বৌদ্ধ শক্তির উত্থান-পতনের সঙ্গে এই মহাবিহারটির ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বহু বিদেশী বৌদ্ধ এখানে এসে শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন, আবার এখান থেকে বহু বৌদ্ধাচার্য্য দেশ বিদেশে গিয়ে জ্ঞানের





নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

আলো জ্বালাতেন। দেবপালের রাজত্ব নালন্দার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তখন এখানকার প্রধান সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য্য সর্বজ্ঞশান্তির নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত নগরহারবাসী ব্রাহ্মণ বীরদেব। সেই সময়ে বালপুত্র বিহারের নির্মাণ গৌড় ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্যের সূচনা করে।

1 Eliot C. *Hinduism and Budhism, Vol. III, p. 182*
2 Cœdes G. *Les etate Hindouises d'Indochine et Indonesie, p. 152-61*
3 Stutterheim W. F. *Javanese Period in Sumatran History, p. 9-12*
4 Ibid. *Studies in Indonesian Archeology, p. 7*
5 Mus P. *Review of Stutterheim's Javanese Period and Bosch's Een Oorkonde etc. p. 115-28*
6 Zimmer H. *Art of Indian Asia, Vol. 1, p. 154*
7 Sastri H. *Epigraphia Indica, Vol. XVII, p. 310-27*
8 Bernet-Kempers A. J. *Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art, p. 6-11*

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রাহুগ্রস্ত পাল বংশ

মন্ত্রী বংশের শাসনে গৌড়

সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। চলমান জগতের কোলাহল পরিহার করে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় দিন কাটাতেন। এরূপ বৈচিত্র্যহীন জীবন তাঁর পুত্র বপ্যটের মনঃপূত হয় নি। উপযুক্ত গুরুর কাছে রণবিদ্যা শিক্ষা করে বপ্যট রাজকীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন; রাজদরবারে কিছু প্রতিপত্তি লাভও হয়। তাঁর পুত্র গোপালের উচ্চাকাঙ্খা ছিল গগনস্পর্শী। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৈনিক জীবন সুরু করলেও গোপালের উদ্যম ভিন্ন পথে সার্থকতার অন্বেষণ করতে থাকে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজা জয়ন্তের মৃত্যু হোলে সর্বত্র যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই সময়ে বা তার কিছু কাল পরে এই ভাগ্যান্বেষী যুবক নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করবার সুযোগ পান। বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির আশীর্বাদ তাঁর শিরে বর্ষিত হয়। শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের মনে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তাতে ইন্ধন জুগিয়ে তিনি নিজস্ব একটি রাজ্য স্থাপন করেন।

গোপাল প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র রাজ্য সম্প্রসারিত হোতে হোতে ধর্মপালের সময়ে আর্য্যাবর্তের পূর্বার্দ্ধ ছেয়ে ফেলে এবং দেবপালের সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আলোকের নীচেই ছিল সূচীভেদ্য অন্ধকার। সকল কার্য্যে গোপাল বা ধর্মপালের যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখা যেত তাঁদের বংশধরদের মধ্যে তা ছিল না। তার

ফলে দেবপাল শাসনের শেষ দিক থেকে পাল শক্তির পূর্ব প্রসার বন্ধ হয়, সর্বত্র ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব গিয়ে পড়ে দেবপালের পিতৃব্যপুত্র জয়পালের হাতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের একছত্র অধিকারী হয়ে বসেন মহামন্ত্রী দর্ভপাণি।

যার প্রসার নেই তার ক্ষয় হয়। দেবপালের সময় থেকে পাল শক্তির প্রসার রুদ্ধ হওয়ায় তার অন্দরে কন্দরে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। রাজা লোকান্তরিত হোলে রাজপুত্র যেমন রাজা হন মন্ত্রীর তিরোধানের পর মন্ত্রীপুত্র তেমনি হোতে লাগলেন মন্ত্রী, সেনাপতিপুত্র সেনাপতি। উত্তরাধিকারের এই ধারায় যোগ্যতার কোন স্থান নেই, কর্মশক্তি ও উদ্যমশীলতার কথা কেউ তোলে না। পিতার পদমর্য্যাদা জন্মসূত্রে পুত্রে বর্তাতে লাগল। এই অপরূপ ব্যবস্থায় রাজা হয়ে পড়লেন সিংহাসনে তোলা শালগ্রাম শিলা, মন্ত্রী হলেন শাসনযন্ত্রের একচ্ছত্র নায়ক। রাজ্য অবশ্য রাজার নামেই শাসিত হোত, কিন্তু একজন তুচ্ছ কর্মচারীর নিয়োগ বা বিনিয়োগের অধিকার পর্য্যন্ত তাঁর রইল না। সমগ্র দেশ মহামন্ত্রীর নির্দেশে চলে, সবাই জানে তিনি সব। তিনি রাখলে রাজা থাকেন, মারলে তিনি মরেন।

কোন অজ্ঞাত কারণে দেবপালের পুত্র রাজ্যপাল মহামন্ত্রী দর্ভপাণির বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁর তিরোধানের পর সিংহাসনে বসান হয় পিতৃব্য-পুত্র বিগ্রহপালকে। কিন্তু তাঁর পক্ষেও চার বৎসরের বেশী সিংহাসনে আরূঢ় থাকা সম্ভব হয় নি; পুত্র নারায়ণপালের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি অবসর নেন।[১] মন্ত্রীবংশ কিন্তু অনড় থাকে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পাঞ্চালের পুত্র গর্গকে ধর্মপাল মহামন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। গর্গের তিরোধানের পর তাঁর পত্নী ইচ্ছাদেবীর গর্ভজাত দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রীত্ব করেন। এত বেশী ক্ষমতা এই ব্রাহ্মণের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে মন্ত্রীপদ ধীরে ধীরে রাজপদকে ছাড়িয়ে যায়। দেবপালের পুত্র রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন, কিন্তু দর্ভপাণির পুত্র

সোমেশ্বরের মন্ত্রীত্ব লাভ কেউ রোধ করতে পারে নি। সোমেশ্বরের পর তাঁর পুত্র কেদারমিশ্র ও পৌত্র গুরবমিশ্র অক্লেশে মন্ত্রীপাট লাভ করেন।[২]

এতখানি ক্ষমতা যে মন্ত্রীর করায়ত্ত তিনি প্রভুকে প্রাপ্য মর্য্যাদা দেবেন কেন? গুরবমিশ্রের এক লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর বংশের বীজপুরুষ গর্গ পূর্বদিকের অধিপতি ধর্মপালকে অখিল ভুবনের অধীশ্বর করেছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ দর্ভপাণির নীতিকৌশলে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্যগিরি এবং পূর্ব সমূদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। নিজ শক্তিবলে নয়, মহামন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করে গৌড়েশ্বর উৎকলকুল ধ্বংস, হুণগর্ব খর্ব এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণ করে সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন!

আড়ালে রাজার মাকে ডাইন বললে কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্বদেশে রাষ্ট্রপ্রধান সম্বন্ধে এরূপ হীনোক্তি করলে কারও গর্দান থাকে না। অথচ গুরবমিশ্রের গর্দান যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি যখন অনুগ্রহ করে গৌড়েশ্বরকে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকে সম্মান পাবার অধিকারী বই কি! তাই তিনি লিখেছেন, গৌড়েশ্বর দেবপাল দর্ভপানির অপেক্ষায় নিজ প্রাসাদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং রাজসভায় সেই মহামন্ত্রীকে মূল্যবান আসন দিয়ে পরে নিজে সিংহাসনে উপবেশন করতেন। বিগ্রহপাল আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর মহামন্ত্রী সোমেশ্বর যখন বৈদিকাচারে যজ্ঞ করতেন তখন সেই বৌদ্ধ ভূপতিকে ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাবনত শিরে শান্তিবারি গ্রহণ করতে হোত![৩]

দেবপালের পর থেকে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় জীবনে এই যে মন্ত্রীবংশের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় শতাব্দীকাল তা অব্যাহত থাকে। এই বিষাদময় যুগে গৌড়েশ্বরকে পাশ কাটিয়ে মন্ত্রীবংশ নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী রাজদণ্ড পরিচালনা করে। একের পর এক রাজা সিংহাসনে

আরোহণ করেছেন, রাজ্য তাঁদের নামে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের অস্তিত্ব বিশেষ অনুভব করে নি। নিজেদের সময়ে তাঁরা পর্দার আড়ালে বাস করে অশন বসনে দিন কাটাতেন, আজও তাঁরা এক পর্দার আবরণে আচ্ছাদিত রয়েছেন। তাঁদের কাহিনী লেখবার মত উপাদান ঐতিহাসিকের হাতে বেশী নেই।

যে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্বীয় প্রভুবংশ সম্বন্ধে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ্য স্থানে ক্ষোদিত করাতে পারেন সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে ভিতর থেকে ঘুণ ধরেছিল একথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেবার জন্য বিভিন্ন শক্তি পালরাজ্যের উপর লুব্ধ দৃষ্টি হানতে থাকে। বিগ্রহপাল তাদের দেখেও দেখেন নি। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু—কাউকে বৈরীজ্ঞান করতেন না। প্রধানমন্ত্রীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে মহিষী লজ্জাদেবীসহ বিলাস ব্যসনে ডুবে থাকতেন। এ অবস্থা বেশী দিন চলল না। চার বৎসর রাজত্বের পর পুত্র নারায়ণপালের (৯১৫-৪০)*অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়।

নারায়ণপাল পরম ধার্মিক হোলেও পিতারই ন্যায় ছিলেন উদ্যমহীন। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ গৌড়গণকে বারবার বিনয়ব্রতে দীক্ষা দেন—কর প্রদানে বাধ্য করেন। গৌড়ের দ্বিতীয় বহিঃশত্রু গুর্জর-প্রতিহারগণ নিস্তব্ধ ছিল না। রাজা ভোজের পুত্র মহেন্দ্র অবলীলাক্রমে পাল রাজ্যের একাংশ অধিকার করে পূর্ব দিকে অভিযানের আয়োজন করেন। পরম ধার্মিক, পরম দয়ালু গৌড়েশ্বর নারায়ণপাল কিন্তু নিশ্চল। শত্রু যখন গৌড়ের দ্বারদেশে এসে আঘাত হানছে তখনও তিনি তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার দায়িত্ব মহামন্ত্রী গুরবমিশ্রের হাতে তুলে দিয়ে প্রাসাদাভ্যন্তরে নির্বিকারভাবে

* পালরাজগণের সময় তালিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। কানিংহামের মত এখানে উদ্ধৃত করা হোল।

বসে থাকতেন। মন্ত্রীর কিন্তু প্রভুবংশের উপর বিশেষ আস্থা ছিল না; আবার আক্রমণকারীদের প্রতি ছিল সমান ঔদাসীন্য। বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করবার পরিবর্তে পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা বর্ণনায় তিনি এত বেশী সময় অতিবাহিত করতেন যে সাধারণ রাজকার্য্য দেখবার সময়ও মিলত না। অথচ এরূপ এক মেরুদণ্ডহীন মন্ত্রীকে অপসারিত করে রাজদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি দানের ব্যবস্থা নারায়ণপাল করেন নি। তেমন ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না।

অভিভাবকহীন রাষ্ট্র

এমনিভাবে পালরাজগণকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে গর্গবংশ দীর্ঘ দিন ধরে গৌড়ের শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল (৯৪০-৬৫) ছিলেন অতি ধার্মিক নরপতি। রাজপদের বেতন হিসাবে মহামন্ত্রী তাঁকে যে অর্থ দিতেন তাই দিয়ে তিনি সমুদ্রের ন্যায় গভীর জলাশয় ও পর্বতপ্রমাণ উচ্চ কয়েকটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত সাহস দেখাতে পারেন নি। তাঁর মহিষী ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র রাজ্যপাল এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালও সমান অকর্মণ্য ছিলেন।

মন্ত্রীবংশও যে শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল এমন নয়। পুরুষানুক্রমে রাজদণ্ড পরিচালনার ফলে এত বিপুল বিত্ত তাঁদের হাতে সঞ্চিত হয়েছিল যে কোন কাজে উদ্যম দেখাবার প্রয়োজন হয় নি। তাঁরা রাজবংশেরই ন্যায় হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের এই অধঃপতনের ফলে গৌড় অভিভাবক-শূন্য হয়; অভূতপূর্ব শ্লথতায় জনজীবন অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। সেই সময়ে পূর্বদিকে কামরূপ ও দক্ষিণে উড়িষ্যায় নূতন দুইটি শক্তির উদ্ভব হয়ে পালরাজগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এদের চেয়েও ভয়ের কারণ ছিল মধ্য-ভারতের নবোত্থিত চান্দেল্ল শক্তি। চান্দেল্লরাজ

যশোবর্মা কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে পূর্ব ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তাঁর পুত্র ধঙ্গ গৌড়গণকে উদ্যানলতার ন্যায় অবলীলাক্রমে ছেদন করেন। রাঢ়ের রাণী তাঁর হস্তে বন্দিনী হন। বহিঃশত্রু আরও ছিল। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও তাঁর পুত্র লক্ষণরাজ গৌড় আক্রমণ করে বঙ্গালদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই সব নূতন শক্তির সম্মুখীন হবার জন্য যে শৌর্য্যের প্রয়োজন গৌড়ের রাজবংশ বা মন্ত্রীবংশের তা ছিল না।

এইভাবে বার বার বহিরাক্রমণের ফলে পাল শক্তি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও লোপ পায় নি। ঐতিহ্যশালী এক রাজবংশ এত সহজে বিলুপ্ত হয় না। নারায়ণপালের পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল নির্বায়মান দীপশিখা কায়ক্লেশে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের যে দুর্বলতা এই সব আক্রমণের ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিভিন্ন সামন্তরাজ্য তাই থেকে লাভবান হবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকে। হারিকেলরাজ কান্তিদেব স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, বঙ্গে চন্দ্র বংশের উদ্ভব হয় এবং কম্বোজগণ বরেন্দ্রে এক নিজস্ব রাজ্য স্থাপন করে।

রহস্যময় কম্বোজ রাজ্য

গৌড়ের এই কম্বোজ রাজ্য ঐতিহাসিকের কাছে এক রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কম্বোজ নামে একটি জনপদ ছিল। কিন্তু আলোচ্য সময়ের বহু পূর্বে তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্য পার হয়ে সেখান থেকে এসে কারও পক্ষে গৌড় জয় সম্ভবও ছিল না। সেই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, তিব্বতীগণ এই কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেউ বা অনুমান করেন লুসাই পাহাড়ের ওপারে ব্রহ্ম সীমান্ত কম্বোজদের আদি বাসভূমি। কিন্তু গঙ্গাকে গঙ্গা

বলতে দোষ কোথায়? এদের কাউকে কম্বোজ বলে গ্রহণ করবার পক্ষে যুক্তি কিছুই নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কম্বোজ এক সুপরিচিত সার্বভৌম রাজ্য। এই কম্বোজ পালযুগে ছিল—এখনও আছে। ভারতের বাহিরে অবস্থিত হোলেও গৌড়ের পালরাজগণের সঙ্গে এই কম্বোজের সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। বৌদ্ধমত উভয় রাজ্যকে এক অদৃশ্য সূত্রে গেঁথে ফেলেছিল। কম্বোজরাজ ইন্দ্রবর্মণ ও তাঁর পুত্র যশোবর্মণ গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক। কম্বোজে তখন নির্মিত হয়েছে অঙ্কর-বটের মহামন্দির, গৌড়ে নির্মিত হয়েছে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও সোমপুরী মহাবিহার। দলে দলে কম্বোজ ছাত্র এসে এই সব মহাবিহারে অধ্যয়ন করত; তীর্থযাত্রীরাও আসত। অনুমান হয়, এই সব যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন কম্বোজ বণিক বা যোদ্ধা ধর্মপাল অথবা দেবপালের অনুগ্রহ-ভাজন হয়ে গৌড়ের এক প্রান্তে এক সামন্তরাজ্য লাভ করেন। এখন পাল শক্তির দুর্বলতায় উৎসাহিত হয়ে তাঁদের বংশধরগণ আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলে পরিচয় দিতে থাকেন।

এমনি দুর্যোগের ভিতর দিয়ে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহীপাল (১০১৫-৪০) যখন গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন পালশক্তির তখন ছায়া আছে, কায়া নেই। তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যহারা হয়ে মলয় পর্বতে, রাজস্থানের মরুভূমিতে এবং হিমালয়ের গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মহীপাল আলোকের সন্ধান করতে লাগলেন!

1 *Journ. Asiat. Soc. Beng., Vol XLVII, p. 585*

2 *Asiatic Researches, Vol. 1 p. 133-44*

3 Kielhorn F. *Epigraphia Indica, Vol II, p. 160-67*

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বৈদিক-বৌদ্ধের সমন্বয়

বৌদ্ধমত ও রাজশক্তি

গৌড়ে যখন পালবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরে কোরিয়া থেকে দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্বে জাপান থেকে পশ্চিমে ইউরাল পর্বত-মালা ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তখন অমিতাভের জ্যোতিতে ভাস্বর। অথচ বৌদ্ধমতের এই বিরাট প্রসারের পশ্চাতে ভারতীয়দের অবদান খুব বেশী নেই। ভারতের কোন রাজশক্তি এই মতকে রাজনৈতিক আয়ুধরূপে ব্যবহার করে নি। এক হাতে ত্রিপিটক ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কখনও ভিন্ন দেশকে দীক্ষিত করতে যায় নি। আবার আর্তসেবার ছদ্মাবরণে নিকৃষ্ট ধরণের উৎকোচ প্রদান করে দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে দলভুক্ত করা হয় নি। অশোক দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা বা ধর্মপাল দুহিতা তারা তথাগতের বাণী বহন করে যখন সাগরপারে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে একজন দেহরক্ষী পর্য্যন্ত ছিল না। চীনের লোইয়াং মন্দিরে তপস্যারত বোধিধর্মের কাছে দলে দলে নরনারী দীক্ষা গ্রহণের জন্য এলেও তিনি সবাইকে বিমুখ করেন; তরুণ যুবক সান-কোয়াং নিষ্ঠার দ্বারা তাঁর হৃদয় জয় করে তবে শিষ্যত্ব অর্জন করেন। বৌদ্ধ ধর্মাচার্য্যরা জানতেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অবিশ্বাসীগণকে দলভুক্ত করলে তাদের বা সঙ্ঘের কল্যাণ হয় না।

সম্রাট মিং-তির সেই ঐতিহাসিক স্বপ্ন! কনিষ্কের উদ্যোগে যখন চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অনুষ্ঠান হচ্ছিল তার কাছাকাছি কোনও সময়ে ৬১ খৃষ্টাব্দে বোধিসত্ত্ব স্বর্ণঘোটকে আরোহণ করে সেই ধর্মপ্রাণ নরপতির

সম্মুখে আবির্ভূত হন। স্বপ্নের মধ্যে তাঁর অস্ফুট আহ্বান সম্রাটের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। কে এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ? কি বা তাঁর আদেশ ? সেই আদেশকে রূপদান করবার জন্য সম্রাটের দূতগণ দিকে দিকে ছুটল। তাদের আমন্ত্রণে স্থবির কশ্যপ মাতঙ্গ গেলেন চীনে ; বৌদ্ধধর্মের বন্যায় ওই দেশ প্লাবিত হোল। ঠিক এমনি করে জাপান, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, তিব্বত, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের শাসকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বৌদ্ধমতকে স্বদেশে প্রবর্তিত করেন। ভারতের কোন রাজশক্তি বা ধর্মসঙ্ঘ নিজেরা অগ্রণী হয়ে কাউকে দীক্ষিত করে নি। দেশগুলি তখন বৌদ্ধ ছিল, এখনও বৌদ্ধ।

বিদেশে এই সাফল্য সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম যে পিতৃভূমিতে সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি তার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদের বিরোধীতা। ব্রাহ্মণ সব পারে, স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করতে পারে না। বৌদ্ধমতের মধ্যে সেই সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল বলে সুরু থেকেই তারা এর বিরোধীতা করতে থাকে। বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অশোক, কনিষ্ক প্রমুখ বৌদ্ধ নরপতিগণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বরাবর উদার ব্যবহার করেছেন, অথচ ভারতের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজদণ্ড হাতে নিয়েই বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করতে থাকেন এবং শ্রমণদের জন্য মস্তকমূল্য ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হূণরাজ তোরমান ও মিহিরকুল বৌদ্ধদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন চালান। পাল বা অন্য কোন বৌদ্ধ রাজবংশ ব্রাহ্মণদের প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করে নি। বুদ্ধের পথ শান্তির পথ!

বৈদিক ধর্মের নূতন রূপ

এই সব প্রত্যক্ষ বিরোধীতার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয় ব্রাহ্মণদের ধর্ম সংস্কার। এক দিকে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি

ধর্মনেতাগণ আবির্ভূত হয়ে বেদ-বেদান্তের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করতে থাকেন এবং অন্যদিকে অধ্যাপক ও পুরোহিতগণ বৌদ্ধদের অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য প্রথার মধ্যে নূতন নূতন রীতিনীতির প্রবর্তন করেন। যে মতকে নির্মূল করা সম্ভব নয় তাকে গ্রাস করা বিজ্ঞোচিত কাজ!

এই সব সংস্কারের ফলে বিষ্ণু তাঁর অনন্তশয্যা ত্যাগ করে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সবার অলক্ষ্যে গীতায় কৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তিনি প্রেমের দেবতা, তাই তাঁর স্থান হোল ভক্তের হৃদয়ে—গৃহস্থের আবাসগৃহে। গৃহে গৃহে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোতে লাগল। মহেশ্বর ধ্বংসের দেবতা—জটাজুটধারী শ্মশানচারী সন্ন্যাসী। তাই তাঁকে ভক্তি করতে হয়, ভালোবাসা যায় না। তাঁর মন্দির নির্মিত হোল বাড়ীর বাহিরে; গ্রামের শেষ প্রান্তে পুরাতন গাছতলায় বুড়াশিবের বিগ্রহও স্থাপিত হোল। বিষ্ণু যেমন কৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়েছিলেন তিনিও তেমনি বিলীন হলেন সেই লিঙ্গের মাঝখানে। জটাজুট, ব্যাঘ্রছাল, সর্প সব অন্তর্হিত হয়ে গেল—তিনি শিব হয়ে দেখা দিলেন!

কৃষ্ণের যেমন রাধা হরের তেমনি পার্বতী। রাধা লক্ষ্মী, রাধা বিষ্ণুপ্রিয়া। পার্বতী কিন্তু শক্তির আধার। তিনি পিতার আদরিণী কন্যা উমা, আবার শক্তিস্বরূপিণী দৈত্যবিনাশিনী দুর্গা। ভিন্ন রূপে তিনি কালী, করালবদনী, মুক্তকেশী, ঘোরা, মুণ্ডমালিনী, ভয়ঙ্করী। তিনিই আবার জগন্মাতা তারা—বৌদ্ধদের আরাধ্যা দেবী তারা। এই তারাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে যে যোগসূত্র রচিত হোল তাতে উভয় মত পরস্পরের সঙ্গে মিলনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারাকে স্বীকৃতি দিয়ে বুদ্ধকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন বলেই তো তারার আবির্ভাব! নারায়ণ যেমন প্রেমের দেবতা, শিব ধ্বংসের, বুদ্ধ তেমনি অহিংসার দেবতা হয়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলেন। দশাবতারের মধ্যে তাঁর স্থান মিলল। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সজ্ঞানে বুদ্ধকে পূজা করতে পারে না! তাই তিনি

স্বীকৃতি পেয়েও পূজা পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইলেন। কোন অবতারই পূজা পেলেন না!

বৈদিক বৌদ্ধের মিশ্রণ—হিন্দুধর্ম

বৈদিক ধর্মের এই বিবর্তন সমস্ত গুপ্তযুগ ধরে চলে। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বৌদ্ধমতের সঙ্গে এই ধর্মের পার্থক্য ছিল, কিন্তু সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম। পাল যুগে এসে দেখি একদিকে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদের কাছে নতি স্বীকার করেছে, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম নূতন রূপ পরিগ্রহ করছে। আগেকার বৈদিক আর্য্য সমাজ আর নেই, স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সমাজও লোপ পেয়েছে। উভয়ে পরস্পরের মাঝে বিলীন হয়ে নূতন এক সমাজে পরিণত হচ্ছে। যে হিন্দু সমাজের সঙ্গে এখন আমরা পরিচিত উভয় ধর্মমত তার ভিতর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই সমাজের উপর বেদের প্রভাব আছে, কিন্তু বুদ্ধের প্রভাব কম নয়।

বৌদ্ধ ও বৈদিক মতের এই মন্থর মিশ্রণের ফলে কনিষ্কের পর ভারতে আর কখনও বিশুদ্ধ বৌদ্ধ রাজবংশের উদ্ভব হয় নি। যে সব রাজা বৌদ্ধমতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বৈদিক ধর্মও তাঁদের কাছ থেকে আনুগত্য পেয়েছে। সম্রাট বালাদিত্য ছিলেন তথাগতের উপাসক, আবার বিষ্ণুরও ভক্ত। চালুক্য সম্রাটগণ শৈব হোলেও বৌদ্ধ ধর্মকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতেন। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হর্ষবর্দ্ধন সূর্য্যেরও উপাসনা করতেন। রাণী রাজ্যশ্রী ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। ললিতাদিত্য বিষ্ণু ও বুদ্ধের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির-গুলিতে শিব ও বিষ্ণুর ন্যায় বুদ্ধও স্থান পেয়েছেন। পুরীর মহামন্দিরে ভগবান বুদ্ধদেব জগন্নাথরূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে পূজা পাচ্ছেন। অন্যান্য বহু বৌদ্ধ মন্দিরে এইভাবে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাংস্য পাত্রের আঘাতে মৃৎপাত্রে ফাটল ধরল। ব্রাহ্মণদের

প্রভাবের মধ্যে আসায় বুদ্ধদেব জনসাধারণের কাছে ব্রহ্মার ন্যায় অপূজ্য দেবতায় পরিণত হোলেন। বৌদ্ধ বিহারগুলি আর পূর্বের মত তরুণ মনকে আকর্ষণ করতে পারল না, ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে যেত লাগল। হিউয়েন-সাং ভারতে এসে দেখেন, প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ বিহারের তুলনায় দেবমন্দিরের সংখ্যা বেশী; বিহারগুলিতে আবার শ্রমণের অভাব যথেষ্ট। শতাব্দীকাল পরে পাল যুগের প্রারম্ভে গৌড় ও মগধের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশেষ নেই। এই রহস্যের হেতু খুঁজে না পেয়ে কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টকে দিগ্বিজয়ী ধর্মযোদ্ধায় পরিণত করেছেন, বিদেশীরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লোমহর্ষক সংগ্রামের কল্পনা করেছেন। দুই অনুমানই ভ্রান্তিপূর্ণ। শঙ্করাচার্য্য শক্তিমান ধর্মনেতা হোলেও বৌদ্ধমতকে পিতৃভূমি থেকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। হিন্দুর জীবনযাত্রায় সেই মত আজও প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার ক্রমবিকাশ

বুদ্ধের পঞ্চ রূপ

বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণ যেমন শুধু দেবকীনন্দন নন বৌদ্ধদের কাছে শাক্যমুনিও তেমনি কেবলমাত্র শুদ্ধোধনতনয় নন। তাঁর এই লৌকিক রূপ একেবারেই আকস্মিক। এই রূপে ধরাবক্ষে আবির্ভূত হোলেও তিনি মানব নন। দেবতাও নন। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব কিছুই নন। তিনি বুদ্ধ। তিনি নিজেকে চেনেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানেন। বিশ্বের সকল জ্ঞান তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

বুদ্ধ তথাগত। যুগ যুগ ধরে তিনি নানা রূপে ধরাবক্ষে এসেছেন, অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে তবে বুদ্ধত্বে পৌঁছেছেন। মহাযান মতানুসারে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত যে অসংখ্য দিকচক্রবাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে শাক্য-বুদ্ধের পূর্বে চব্বিশ জন বুদ্ধ তার কোন না কোন স্থানে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধের পাঁচ রূপ—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি ও অমিতাভ। বুদ্ধ বৈরোচন সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন; কোটী সূর্য্যের রশ্মি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়; বিশ্বসংসার বৈরোচন-রশ্মি-প্রতিমণ্ডিতা। বুদ্ধ অক্ষোভ্য সকল চাঞ্চল্যের অতীত; স্বয়ং মার যখন তাঁকে ক্ষোভিত করতে পারে নি তখন কেউ পারবে না। বুদ্ধ রত্নসম্ভব সমস্ত জড়জগতের নিয়ন্তা; সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহে যত জড়বস্তু ও ধনরত্ন আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি

চলমান জগৎকে পরিচালিত করেন ; তাঁর কাজে কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি নেই। বুদ্ধ অমিতাভ অন্তহীন জ্যোতিতে ভাস্বর। শিল্পীর তুলিতে বুদ্ধের এই পাঁচ রূপ মূর্ত হয়ে উঠলেও তিনি সকল রূপের অতীত। কোন রূপেই তাঁকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নররূপে বুদ্ধ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হোলেও তাঁকে ঘিরে যে ধর্মমত গড়ে উঠেছে তার ক্রমবিকাশে অভারতীয়দের দান বড় কম নয়। প্রধান তিনজন বোধিসত্ত্বের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব হয় তিব্বতের পোতালায়। পদ্মপাণি ত্রিশূলধারী এই বোধিসত্ত্ব সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ হস্তে ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর দুই চক্ষু থেকে চন্দ্রসূর্য্য, মুখমণ্ডল থেকে বায়ু এবং পদযুগল থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর প্রতি লোমকূপে এক একটি গ্রহ নক্ষত্র বিরাজ করছে। এরূপ অমিত শক্তির আধার, অথচ তাঁর করুণার কোন অন্ত নেই। করুণার্দ্র আঁখি দিয়ে তিনি বিশ্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন।

মঞ্জুশ্রী ধরাধামে অবতীর্ণ হন আরও পূর্বে—চীনের সান-সি প্রদেশের উ-তাই-সান বা পঞ্চশির পাহাড়ের উপর। সেখানকার রাজবাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়। অনন্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তিনি জীবজগতের সকল অজ্ঞতা দূর করে সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেন। তাই তিনি এক হস্তে তরবারী ও অন্য হস্তে পুস্তক শোভিত।

বোধিসত্ত্ব আরও আছেন। শেষ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এখন তুষিত-লোকে অবস্থান করছেন, অনাগত ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। আবার কয়েকজন অসাধারণ শক্তিশালী নরনারী অনুরূপ সম্মান পেয়েছেন। কম্বোজরাজ দ্বিতীয় জয়বর্মণের মাতা তাঁর মহান হৃদয়বৃত্তির জন্য বৌদ্ধদের চক্ষে প্রজ্ঞাপারমিতা। বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খাঁ পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। স্বয়ং অশোক, কনিষ্ক, তাই-সুং, স্রোন-ৎসন্-গম্পো বা সম্রাজ্ঞী উ এই সম্মান পান নি। তার কারণ এই

যে ইসলামের দুষমন চেঙ্গিস খাঁর প্রচণ্ড আঘাতের ফলে মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম রক্ষা পায়।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার উদ্ভব

বৌদ্ধমতকে অবলম্বন করে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে এই যে কৃষ্টির আদান প্রদান চলতে থাকে তার ফলে অমৃতের সঙ্গে হলাহল বড় কম ওঠে নি। বুদ্ধের বিধি গ্রহণ করে দেশগুলি তমসামুক্ত হয়; তাই তাদের অধিবাসীগণ ভারতকে দেবভূমি বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রাচীন রীতিনীতির সংস্পর্শে এসে সদ্ধর্ম স্থানে স্থানে কলুষিত হয়। উদয়ন ও সম্ভলে* বিকৃত তান্ত্রিকতা ধর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

লামা তারানাথের মতে মহাযানপন্থা প্রবর্তনের সময়ে নাগার্জুনের উদ্যোগে যে শক্তিপূজা পদ্ধতি প্রচলিত হয় তন্ত্রের বীজ তার মধ্যে নিহিত ছিল। বিজ্ঞানবিশ্বাসী যোগাচারগণ শক্তিপূজার প্রতি ঔদাসীন্য দেখায়, কিন্তু মধ্যাস্তিকরা মহাশক্তিকে তাদের আরাধ্যা দেবী বলে গ্রহণ করে। সম্ভলে সেই শক্তিপূজা বিবর্তিত হতে হতে মহাযান মতের এক নূতন শাখায় পরিণত হয়।[২] শক্তিপূজার রন্ধ্রপথ ধরে সাধক সমাজে নারী প্রবেশ করতে থাকে।

বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মতে পুরাকালে সম্ভলরাজ সুচন্দ্র তথাগতের মুখে কালচক্রের বর্ণনা শুনে তার ভিত্তিতে ১২ হাজার শ্লোক সম্বলিত মূলতন্ত্র রচনা করেন। সেই কারণে সুচন্দ্র তান্ত্রিকদের চক্ষে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মূলতন্ত্র অতি সঙ্গোপনে সম্ভল রাজপ্রাসাদে রক্ষিত ছিল, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ সমরখন্দ

* অধুনালুপ্ত বৌদ্ধ রাজ্য। সুম্পা-খাম্পোর মতে অবস্থান বাহ্লিক, মতান্তরে তারিম উপত্যকা।

অধিকার করায় বহু তান্ত্রিক সম্ভল ছেড়ে শাস্ত্রগ্রন্থসহ উদয়নের রাজধানী গজনীতে চলে আসে। সেখানকার করবির বিহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহা-তান্ত্রিক পদ্মসম্ভবের কথা পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় মুসলমানাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোলে অসংখ্য বৌদ্ধ শরণার্থীর সঙ্গে কয়েকজন তান্ত্রিক চলে আসেন তিব্বতে এবং সেখান থেকে গৌড়ে।* ধর্মপাল তখন গৌড়েশ্বর। তিনি তাদের আশ্রয় দিলেও তাদের অভিনব সাধনপদ্ধতি রক্ষণশীল বৌদ্ধদের মনে বিক্ষোভের তরঙ্গ তোলে। শক্তি-পূজা যে এতদূর গড়িয়েছে তারা তা জানত না! শরণার্থীগণ ওদন্ত-পুরীতে যে রৌপ্যনির্মিত হেরুকের মূর্ত্তি স্থাপন করেছিল কয়েকজন সৈন্ধব শ্রাবক ও সিংহলী ভিক্ষু সেটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সংবাদটি যথারীতি গৌড়েশ্বরের গোচরে এলে তিনি আদেশ পাঠান, অপরাধীগণ যেন তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে এবং ভবিষ্যতে অন্যের ধর্মসাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে বিরত থাকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না, রাজাদেশ সত্ত্বেও তন্ত্রবিরোধীরা শরণার্থীগণকে নানাভাবে বিব্রত করে। তখন গৌড়েশ্বর বাধ্য হয়ে সিংহলী ভিক্ষুগণকে তাদের পূর্ব অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেন। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ আচার্য্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞানের অনুগ্রহে তারা অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পায়।[৩]

তান্ত্রিকদের বাহ্যিক রূপ লোককে স্তম্ভিত করলেও তাদের শাস্ত্রগুলি পাঠ করে সুধীসমাজ চমৎকৃত হন। তন্ত্রের যে এক উজ্জ্বল দিকও আছে সেকথা বুঝতে পেরে এই নূতন শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের মনে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দেয়। রাজশক্তির সমর্থনও মেলে। কন্‌জ বলেন গৌড়ের পালরাজগণের সমর্থন পাওয়ার পর থেকে অবহেলিত তন্ত্রবাদ ফলেফুলে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য পালরাজ্যের সকল মহাবিহারে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয় এবং সেখানে

* গৌড়ে মধ্য-এশিয়ার শরণার্থী—অধ্যায় ২২, পৃঃ ২২২-২৩

শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু তান্ত্রিক নূতন মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে চলে যান।[৪]

দেশে দেশে তান্ত্রিকতা

কিছু দিন পরে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে মহাযান মত প্রবর্তিত হোলে সেখানকার রাজধানী তন্ত্রশিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বোধ হয় তার কিছু কাল পূর্বে ভারত থেকে বজ্রবোধি চীনে গিয়ে তন্ত্রবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান মো-লাই-ইয়ের সঠিক অবস্থান অজ্ঞাত, কিন্তু তিনি যে গৌড় বা মগধের কোনও মহাবিহারে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর শিষ্য অমোঘবজ্র ও প্রশিষ্য হুই-কুয়ো চীনা বৌদ্ধদের তান্ত্রিক শাখা মি-ৎসুংয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

কোরিয়ার পুরাতন রাজধানী শিলা এতদিন মহাযান মতের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। নগরীর বিহারে বিহারে অমিতাভের মূর্তি শোভা পেত, সঙ্ঘারামগুলিতে শতশত শ্রমণ বাস করতেন। কোনও পিতার তিন বা ততোধিক পুত্র বর্তমান থাকলে রাজাদেশে তাদের একজন হোত শ্রমণ। নবম শতাব্দীর শেষে বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবের পর সমগ্র দেশের উপর যখন ওয়াং বা কোরিয়ে বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে বা তার কিছু কাল পূর্বে চীন থেকে শক্তিসাধকগণ গিয়ে সেখানে তান্ত্রিকতা প্রচার করেন।

জাপান চিরদিন বুদ্ধ অমিতাভের উপাসক। নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওই দ্বীপে তান্ত্রিকবাদ প্রথম পৌঁছালে কোবো দাইসির নেতৃত্বে জাপানী বৌদ্ধদের তান্ত্রিক শাখা সিন্-গণের প্রতিষ্ঠা হয়। তার পর সহস্রাধিক বৎসর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু জাপানে তান্ত্রিকতা আজও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। কন্‌জের হিসাবানুসারে এই দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকের সংখ্যা ৮০ লক্ষ এবং তান্ত্রিক পুরোহিত ১১ হাজার। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় সামুরাইগণ এই শক্তিবাদকে কখনও সুনজরে

দেখে নি! তারা বরাবর জেন বা ধ্যানপন্থায় বিশ্বাসী।

গুহ্য সমাজ

এই প্রাচ্য তান্ত্রিকরা ছিল বুদ্ধ বৈরোচনার উপাসক। গৌড় তান্ত্রিকগণ বৈরোচনার সঙ্গে তারারও উপাসনা করত। পালযুগের শেষ ভাগে আদ্যাশক্তি তারাই তাদের প্রধান উপাস্যা দেবী হয়ে দেখা দেন। তাতে সাধকের মনে শক্তি বাড়ে, সাধনায় মাধুর্য্য আসে। কিন্তু কালচক্রতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে তান্ত্রিকদের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দেয়। অথচ কালচক্রের সময়গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এই গণনানুসারে ২৩২৭ খৃষ্টাব্দে তথাগত পুনরায় সম্ভলে অবতীর্ণ হয়ে বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিধর্মীদের নিধন করবেন।

সুম্পা-খাম্পো বলেন, মহীপালের রাজত্বকালে (১০১৫-১০৪০) কালচক্রতন্ত্র ভিক্ষু শিলুপা কর্তৃক সম্ভল থেকে গৌড়ে আনীত হয়। স্থবির নরতপা তখন নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ। কালচক্রকে তিনি প্রথমে আমল দেন নি, কিন্তু একদিন শিলুপার কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে এই নূতন তন্ত্র গ্রহণ করেন। সেই থেকে নালন্দা ও বিক্রমশীলায় কালচক্রতন্ত্রের অধ্যাপনা সুরু হয়। দীপঙ্কর অতীশ এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এরই ভিত্তিতে তিব্বতের ধর্ম সংস্কার সম্পন্ন করেন। গৌড় ও মগধের বিভিন্ন মহাবিহার থেকে তারাতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

তান্ত্রিকতার এক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দিকও আছে। কিন্তু সেগুলি বিহার ও বিদ্যালয়ের প্রাচীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকায় গুরু-পুরোহিতগণ একে বিকৃত রূপ দিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। তাদের হাতে পড়ে তন্ত্র এক বীভৎস যৌন সাধনায় পরিণত হয়। তারা বলতে থাকে, জগৎ যখন বামোদ্ভব তখন নারীকে বাদ দিয়ে ধর্ম সাধনা সম্ভব নয়। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে শৈবতান্ত্রিকরাও বলে

ওঠে—না, সম্ভব নয় !

নারীর সঙ্গে মদ্য এবং মাংসও এল। এই পঞ্চমকারের সাধনা অতি গুহ্য বিষয়—গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয়। অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে একমাত্র গুরুই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা জ্বালাতে পারেন! তিনি এগিয়ে এলেন শিষ্যকে দীক্ষা দিতে; পশুবলি ও যৌনসম্ভোগ ধর্মসাধনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

অন্তরীক্ষে বসে বুদ্ধ হাসলেন !

শিবও হাসলেন !

1 Sumpa Khan-po Yece Pal-Jor *Pag Sam Jon Zang, p. 134, 147*

2 Waddell L. A. *Budhism in Tibet, p. 56-57*

3 Datta B. N. *Mystic Tales of Lama Taranath, p. 59*

4 Conz E. *Budhism, its essence and development, p. 179*

সপ্তবিংশ অধ্যায়

রামাই পণ্ডিত ও শূন্য পুরাণ

তান্ত্রিকতার বীভৎস রূপ দেখে জনসাধারণ যখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে সেই সময়ে গৌড়ের এক প্রান্ত থেকে নূতন বাণী ধ্বনিত হোল—তন্ত্র নয় মন্ত্র নয়, বজ্রডাক নয় বজ্রডাকিনী নয়, গুরু নয় শিষ্য নয়; সব শূন্য—মহাশূন্য। সৃষ্টির আদিতে সবই ছিল শূন্য, তার মাঝে নিরাকার আদ্যাশক্তি মায়ার আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তিনিই তারা—সকল বুদ্ধের জননী। তিনি স্বরূপে ভক্তের সমুখে আত্মপ্রকাশ করলে যখন তাঁকে ঘিরে পৈশাচিক উল্লাস সুরু হয় তখন তাঁকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দাও। যে শূন্য থেকে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যের আরাধনা করো।

বৌদ্ধদর্শনে শূন্যবাদ কিছু নূতন নয়। মহাযানমত প্রবর্তনের পূর্বেও সৌত্রান্তিকগণ বলত, কিছুই সত্য নয়—সবই শূন্য। চতুর্থ মহাসঙ্গীতির পর বৌদ্ধরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেও শূন্যবাদ পরিত্যক্ত হয় নি। নবীনদের এক শাখা বৈদান্তিকদের অনুকরণ করে বলতে থাকে, সর্বম্ অনিত্যম্—সবই অনিত্য। পরে তারা মাধ্যমিক নামে পরিচিত হয়। আসঙ্গ, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশ্বাসী যোগাচাররা তাদের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তারা স্বমতে অটল থেকে বলে—অনাকার রূপং শূন্যং শূন্য মধ্যে নিরঞ্জন।

এই শূন্যবাদের ভিত্তিতে বোধিধর্ম চীনে গিয়ে চ্যান মতের প্রবর্তন করেন। জাপানের জেন মত চ্যানের নামান্তর। পালযুগের শেষদিকে তান্ত্রিকতার বীভৎসতায় গৌড়ের জনমত যখন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই সময়ে অনুরূপ এক শূন্যবাদী আবির্ভূত হয়ে বলেন,

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই মায়া—সবই শূন্য। অন্তহীন শূন্য থেকে ললিতাবতার বুদ্ধ, তাঁর থেকে আদ্যাশক্তি পার্বতী এবং তাঁর থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে।

বিস্মৃত শূন্যবাদকে যিনি নূতন করে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেন সেই মহাবৌদ্ধ রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষভাগে এখনকার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ৭ ক্রোশ পূর্বে দ্বারকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ, স্ত্রীর নাম কেশবতী। তাঁর চক্ষে বুদ্ধই ধর্ম; বুদ্ধ শিবেরও উপাস্য দেবতা। একদিকে তান্ত্রিকদের পঞ্চমকারের সাধনা এবং অন্যদিকে বৈদিকদের গোঁড়ামীতে জনসাধারণ যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সেই সময়ে তাঁর নূতন বাণী তাদের মনে অভূতপূর্ব তরঙ্গ তোলে; তাঁকে অনুসরণ করে অসংখ্য নরনারী ধর্মঠাকুরের পূজা সুরু করে। এখনও যে গৌড়ের স্থানে স্থানে ধর্মপূজার প্রচলন রয়েছে এই রামাই পণ্ডিত তার আদি উদ্যোক্তা। শ্রেষ্ঠতম ধর্মগুরুদের মধ্যে আসন পাবার অধিকারী তিনি, অথচ গৌড়বাসী তাঁর নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছে! গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী সহ অসংখ্য নরনারী তাঁর কাছে দীক্ষা নেয়। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গল থেকে কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হোল—

শ্রীশ্রীধর্মায় নমঃ। অথ শূন্যপুরাণ লিখ্যতে

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল ন ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার নহি ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহারা নহি পুজিবার দেহু।
মহাশূন্য মাঝ পরভুর আর অছি কেউ॥
রিষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি থাবর জঙ্গম।

পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্ণু নহি ছিল নহি মহেশ্বর॥
বার বত্ত নহি ছিল ঋষি যে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গআ বরানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
স্বগ্গ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্দুকার॥
দস দিগ্পাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমের তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধম্ম পদারবিন্দ করিবার নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী॥১

১ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পালশক্তির পুনর্জীবন লাভ

চান্দেল্লরাজের ব্যর্থ অভিযান

—কে তুমি ?

—কাঞ্চীরাজপত্নী

—তুমি কে ?

—অন্ধ্রাধিপতির মহিষী

—আর তুমি ?

—রাঢ়াধীশের সহধর্মিণী

—তুমি ? তুমি কে ভগ্নি ?

—অঙ্গাধিপতির হৃদয়েশ্বরী।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে একদিন বুন্দেলখণ্ডের কারাগারে চার রাজ্যের চার রাণীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হয়েছিল। এই সেদিন পর্য্যন্ত যাঁদের কণ্ঠহারের দ্যুতিতে অর্দ্ধেক ভারত উদ্ভাসিত হোত আজ তাঁরা চান্দেল্লরাজ ধঙ্গের কারাগারে বন্দিনী! কেউ কাউকে চেনেন না; তাই সজল নয়নে পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন।

গৌড় কায়স্থ জগ্ধ ও জয়পাল রচিত এই যে প্রশস্তি ১০০২ খৃষ্টাব্দে খাজুরাহোর এক মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হয় তার মধ্যে সে যুগের বহু কাহিনী লুক্কায়িত রয়েছে। ভারতের সর্বত্র জাতীয় জীবন তখন শোচনীয়ভাবে অবসাদগ্রস্ত, সর্বত্র সামন্ততন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গৌড়ের চন্দ্র ও কম্বোজ বংশের কথা পূর্বে বলেছি। তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয় বুন্দেলখণ্ডের চন্দ্রাত্রেয় বা

চান্দেল্ল বংশ। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন ও তাঁর পুত্র ধঙ্গদেব সমগ্র ভারতের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে চারিদিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁদের রাজধানী খাজুরাহো মন্দিরশোভিত এক সুরম্য নগরীতে পরিণত হয়। পিতাপুত্র নির্মিত কালিঞ্জর দুর্গের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়ে চান্দেল্ল বাহিনী গান্ধারে গিয়ে সাহীরাজ জয়পালের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। সেই সৈন্যবাহিনীসহ ধঙ্গ যখন ঝড়ের মত পূর্বভারতে এসে এখানকার বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলির মূলোৎপাটন করে চলে যান তখন কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারে নি। যে অঙ্গ-রাণী তাঁর হাতে বন্দিনী হয়েছিলেন বলে খাজুরাহো শিলালিপিতে দাবী করা হয়েছে তিনি বোধ হয় কম্বোজান্বয় গৌড়েশ্বরের মহিষী।

এই সাফল্য সত্ত্বেও চান্দেল্ল বাহিনীকে গৌড় ছেড়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে হয়। কারণ, তাদের গৃহসীমান্তে তখন কালো মেঘ জমা হচ্ছিল। তারা যেমন পূর্বদিকে পালরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল, রাষ্ট্রকূটরাজের বিরুদ্ধে তেমনি অভিযান চালাচ্ছিলেন তাঁরই এক সামন্ত তৈলপ। শেষ রাষ্ট্রকূটরাজকে পরাজিত করে তৈলপ তখন সবেমাত্র এক নূতন চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতিগতি ভাল নয়। তার উপর সুলতান মামুদ বার বার ভারতের অভ্যন্তরভাগে বহু দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসছেন। কখন কি হয় বলা যায় না! এই সব বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য চান্দেল্ল বাহিনী পূর্বভারত অরক্ষিত রেখে দেশে ফিরে যায়। বন্দিনী চার রাণী তাদের কারাগারে বাস করতে থাকেন।[১]

ষাঁড়ের শত্রু বাঘের পেটে গেল! ধঙ্গের দিগ্বিজয়ে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল (১০১৫-৪০) আশার আলোক দেখতে পেলেন। রাজ্যহারা মহীপাল এত দিন মগধ বা মিথিলার কোন নিভৃত কোণে আত্মগোপন করে সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলেন, বিদ্রোহী সামন্তদের

ভয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারছিলেন না। চান্দেল্ল বাহিনী এসে সেই বিশ্বাসঘাতকদের নিষ্পিষ্ট করে দেওয়ায় কম্বোজদের হাত থেকে স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়। তাদের নিষ্ক্রমণের পর অন্য যে সব সামন্তবংশ এতদিন প্রায়-স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিল তারা মহীপালের প্রাধান্য মেনে নেয়। এইভাবে বিভিন্ন বিরুদ্ধ স্রোতের আঘাতে পালশক্তি পুনর্জীবন লাভ করে। দেবপালের তিরোধানের শতাব্দীকাল পরে নূতন সূর্য্যের আভায় পূর্ব গগন আবার উদ্ভাসিত হয়!

ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে মহীপালের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমতের মধ্যে আর একবার প্রাণসঞ্চার হয়। বৌদ্ধবিহারগুলিরও সুদিন ফিরে আসে।[২] কালচক্রতন্ত্র যে এই সময়ে সম্ভল থেকে গৌড়ে এসেছিল সেকথা পূর্বে বলেছি। তিব্বতরাজ ইসেসোদের সঙ্গে মহীপালের সদ্ভাব ছিল। রিন্-চেন জাং-পো প্রমুখ কয়েকজন তিব্বতী বিদ্যার্থী তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন বিহারে শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন; আবার পালরাজ্য থেকে ধর্মপাল, শ্রদ্ধাকরবর্মণ, রত্নাকরশান্তি প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন। আচার্য্য কুশল গিয়েছিলেন সুবর্ণদ্বীপে—শ্রীবিজয় মহাবিহারে অধ্যাপনা করতে। তাঁর শিষ্য চন্দ্রকীর্তি অতীশের গুরু।

সারনাথে মহীপাল ধর্মরাজিকা ও সাঙ্গধর্মচক্রের জীর্ণ সংস্কার এবং অষ্টমহাস্থান ও মূলগন্ধকুটি বিহার নূতন করে নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের এক মন্দির অগ্নিদাহে ধ্বংস হোলে কৌশাম্বী নিবাসী মহাযান মতাবলম্বী গুরুদত্তের পুত্র বালাদিত্য সেটির পুনর্নির্মাণ করেন।[৩] এমনিভাবে সঙ্ঘের সেবা পালরাজ্যের সর্বত্র চলতে থাকে।

রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়

চান্দেল্ল সৈন্যদের পরোক্ষ সহায়তায় মহীপাল যখন অনধিকারীর হাত থেকে সবেমাত্র পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেছেন সেই সময়ে উত্তর থেকে সুলতান মামুদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর অতর্কিত আক্রমণ

চালাচ্ছিলেন এবং দক্ষিণে সম্রাট রাজেন্দ্র চোল বঙ্গোপসাগরকে চোল সরোবরে পরিণত করেছিলেন। রাজেন্দ্রের প্রপিতামহ বিজয়ালয়ের পরিকল্পনা ছিল সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা ; কিন্তু প্রতিবেশী পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের সামরিক বলের জন্য সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে উভয় শক্তি হীনবল হয়ে পড়লে রাজারাজ চোল (৯৮৫-১০১৪) কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করে ইলাম্ মণ্ডলমে—সিংহলে—উপনীত হন। উত্তর সিংহল চোল বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয় এবং ওই দ্বীপের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর ধূলিসাৎ হয়ে যায় (৯৯৩)।

সাগরপারের শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজারাজের সম্পর্ক মধুর ছিল। তাঁর অনুমতি নিয়ে সেখানকার শৈলেন্দ্র বংশের জনৈক সামন্ত নেগাপট্টমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করেন।[৪] তিনি নিজেও সেই বিহারে বুদ্ধসেবার জন্য একখানি গ্রাম দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রের সিংহাসনারোহণের পর এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে ; উভয় শক্তির অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় পূর্ব সমুদ্রের শান্ত আবহাওয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। জলে ও স্থলে অভিযান চালিয়ে চোল নৌবহর শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য থেকে মালয়, কটাহ ও সুমাত্রার একাংশ অধিকার করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধ সেখানে শেষ হয় নি—দীর্ঘ কাল ধরে চলতে থাকে।

পরকেশরীবর্মা রাজেন্দ্র ছিলেন শৈব। তাঞ্জোরের বিরাট রাজ-রাজেশ্বর মন্দির তাঁর পিতা রাজারাজের অক্ষয় কীর্তি। পিতাপুত্রের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভারত ও সাগরপারের বিজিত রাজ্যগুলিতে বহু শিবমন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সব মন্দিরে পূজার জন্য যথেষ্ট গঙ্গাজলের প্রয়োজন। তার উপর বৌদ্ধমতের আবিলতা থেকে বিজিত রাজ্যগুলি শুদ্ধ করবার জন্যও প্রচুর গঙ্গাজল চাই। কিন্তু গঙ্গা বহু দূরে! ভগীরথ ওই নদীকে তপস্যাবলে ভূতলে এনেছিলেন, সূর্য্যবংশীয় সম্রাট রাজেন্দ্র নিজ বাহুবলে স্বরাজ্যে আনবার আয়োজন করতে লাগলেন।

গঙ্গাজলের যুদ্ধ

এরূপ পুণ্য কাজে রক্তপাতের ইচ্ছা রাজেন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তাঁর জলবাহীগণকে সবাই সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল। সেই ধর্ম-হীনদের শিক্ষা দেবার জন্য সেনাপতি বিক্রমের অধীনে তিনি এক অভিযাত্রী বাহিনী উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে পাঠিয়ে দেন। যাত্রাপথের উপর যে সব ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তারা তাঁর পুরাতন শত্রু চালুক্যরাজের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে অভিযাত্রী বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত করতে লাগল। প্রথম বাধা আসে চন্দ্রবংশীয় রাজা ইন্দ্ররথের কাছ থেকে। তাঁকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সম্রাট রাজেন্দ্রের সৈনিকগণ দুর্গম ওড্রবিষয় ও মনোরম কোশলনাড়ু পার হয়ে দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ এখনকার মেদিনীপুর জেলায় গৌড় সীমান্ত ভেদ করে।[৫]

কি করবেন ক্ষুদ্র দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্মপাল? তাঁর প্রতিরোধ চূর্ণ করে চোলসৈন্যগণ চলে আসে সকল-দিক-প্রসিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ে। এখানকার পাপিষ্ঠ রাজা রণশূরের অধিকারের ভিতর দিয়ে মা গঙ্গা প্রবাহিতা হচ্ছিলেন। রাঢ়পতি অবশ্য অভিযাত্রী বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারেন নি। তাঁর পরাজয়ের ফলে গঙ্গার পবিত্র বারিরাশির উপর রাজেন্দ্র চোলের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাগীরথীর জলধারা চোল সম্রাটের আশু লক্ষ্য হোলেও যে শেষ লক্ষ্য ছিল না এবার তা বোঝা গেল। দক্ষিণ-রাঢ় জয়ের পর তাঁর সৈন্যবাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে অবিরাম-বর্ষাবারি-সিঞ্চিত বঙ্গাল দেশে গিয়ে উপনীত হয়। বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র সসৈন্যে তাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু সাগর তরঙ্গের ন্যায় চোল সৈন্যের সম্মুখে স্থির থাকতে পারেন নি; ভীতসন্ত্রস্ত মনে গজপৃষ্ঠ থেকে নেমে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। শক্তিশালী সামন্তদের এই দুর্গতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর মহীপাল তখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।



গঙ্গাইকোণ্ডা-চোলপুরম মন্দিরের বিগ্রহ

এই মন্দির সংলগ্ন চোলগঙ্গা সরোবর ভাগীরথী সলিলে পূত করা হয়েছিল

কর্ণভূষণ চর্মপাদুকা বলয়বিভূষিত মহীপালকে সম্মুখে পেয়ে চোল সৈন্যগণ দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ সুরু করল। মহীপাল বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাবহুলতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হোলেন। সাগরের ন্যায় রত্নশালী উত্তর-রাঢ় সম্রাট রাজেন্দ্রের অধিকার-ভুক্ত হোল; অদ্ভুত বলশালী করীসমূহ এবং রত্নোপমা নারীদের নিয়ে তাঁর সৈন্যগণ তাঁবুতে ফিরল।

বালুকাময় তীর্থধৌতকারিণী গঙ্গা এখন সম্রাট রাজেন্দ্রের করতল-গত। এখান থেকে খাল খনন করে ওই পবিত্র স্রোতস্বিনীকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; তাই তাঁর রাজ্য থেকে দলে দলে জলবাহী এসে কালীঘাট, নবদ্বীপ বা অনুরূপ কোনও স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ গঙ্গাজল আহরণ করে দেশে ফিরল। তাঞ্জোর মহামন্দির সংলগ্ন শিবগঙ্গা সরোবর সেই জলে পূর্ণ করা হয়। আবার সেই গঙ্গাজলে কাবেরী নদী এবং সম্রাট রাজেন্দ্র নির্মিত গঙ্গাইকোণ্ডা-চোলপুরমের চোলগঙ্গাও পবিত্র করা হয়।[৮]

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর হিসাব অনুসারে গঙ্গাজলের যুদ্ধ দুই বৎসর ধরে চলেছিল। একই সময়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনুরূপ এক ধর্মযোদ্ধা সুলতান মামুদ হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে পুণ্য সঞ্চয় করছিলেন! মামুদের আক্রমণে অসংখ্য নিরস্ত্র পূজকের জীবনাবসান হয়, রাজেন্দ্রের আক্রমণে হাজার হাজার গৌড়সৈন্য ইহলীলা ত্যাগ করে। মামুদ ভারতময় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু দেশ জয় করতে পারেন নি, রাজেন্দ্রও যুদ্ধজয় করেছিলেন কিন্তু পূর্ব-ভারতের কোন জনপদ স্থায়ী-ভাবে অধিকার করতে পারলেন না।

চোল বাহিনী যখন স্বদেশ ছেড়ে সুদূর গৌড়ে এসে যুদ্ধ করছিল সেই সময়ে তুঙ্গভদ্রার ওপারে চালুক্যরাজ তাদের বিরুদ্ধে নূতন করে আক্রমণের আয়োজন করতে থাকেন। বিজিত পাণ্ড্য রাজ্যেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। সিংহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় নি। কয়েকটি

জলযুদ্ধে পরাজয়ের পর শ্রীবিজয়ের নৌবাহিনী আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল ; মাঝে মাঝে সাময়িক বিরাম সত্বেও সে যুদ্ধ প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলে।[৭] এত সমস্যা মাথায় নিয়ে গৌড়ে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার সামর্থ সম্রাট রাজেন্দ্রের ছিল না। তাই তাঁর আদেশে সেনাপতি বিক্রম মহীপাল ও তাঁর সামন্তদের দিয়ে নিজ শিরে গঙ্গাজল বহন করিয়ে সসৈন্যে দেশে ফিরে যান। পিছনে পড়ে থাকে হাজার হাজার বিধবার করুণ ক্রন্দন—অসংখ্য পিতৃহীনের হাহাকার !

1 *Epigraphia Indica, Vol. I, p. 137-45*

2 Smith A. Vincent, *Early History of India, p. 415*

3 *Arch. Surv. Rep., Vol, IX, p. 182*

4 Krishnaswami Aiyangar S. *Contribution of South India to Indian Culture, p. 383*

5 Nilkantha Sastri K. A. *The Cholas, Vol. I, p. 172, 185, 206.*

6 Krishnaswami Aiyangar S. *Ancient India and South Indian History, p. 611*

7 Panikkar K. M. *India and the Indian Ocean, p. 34*

উনত্রিংশ অধ্যায়

পাল যুগের অবসান

রামচরিতম্

মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল (১০৪০-৫৫) এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৫-৮৫) অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে গৌড় শাসন করেন। নয়পালের সময়ে কলচুরিরাজ* কর্ণ পালরাজ্য আক্রমণ করে মগধের অভ্যন্তরভাগে বেশ কিছু দূর এগিয়ে আসেন। দীপঙ্কর অতীশ তখন বিক্রমশীলায় উপস্থিত। তাঁর মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় কর্ণ স্বরাজ্যে ফিরে গেলেও সে সন্ধি স্থায়ী হয় নি। বৎসরাধিক পরে কলচুরিগণ পুনরার পূর্ব ভারতে এসে আত্মপ্রকাশ করে দ্রুতগতিকে আরও পূব দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু এবারও উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় সম্পুর্ণ ভিন্ন পন্থায়—তুই রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে কর্ণ তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়ে দেশে ফেরেন। রণক্ষেত্রে রক্তদানের পরিবর্তে তাঁর সৈন্যরা ভুরিভোজনে আপ্যায়িত হয়!

তৃতীয় বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল যখন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৮৫) রাজপ্রাসাদ তখন চক্রান্তের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় মহীপাল তুই কনিষ্ঠ সহোদর শূরপাল ও রামপালকে বন্দী করতে বাধ্য হন। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচরিতম্ কাব্যের বর্ণনানুসারে, খলস্বভাব ব্যক্তিরা মহীপালকে বলিতে

* কলচুরি বংশ—কর্ণাটক ও দাহলে এই বংশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে।

লাগিল, এই রামপাল ক্ষমতাশালী সুযোগ্য সর্বসম্মত; সুতরাং মহারাজের রাজ্য গ্রহণ করিবে। এই কথা শুনিয়া বিচিত্র কূটবুদ্ধিসম্পন্ন শিলা-কুট্টিবৎ কর্কশ মহীপাল দুই ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্দৈববশতঃ উহাই তাঁহাদের ভীষণ আশ্রয়স্থল হইল। দূর হইতে আসিয়া লতা যেমন তরুকে বেষ্টন করে নূতন শৃঙ্খল তেমনি রামপালের জঙ্ঘাদেশ বেষ্টন করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার স্কন্ধ, কটিদেশ ও জানু সঙ্কুচিত হইত না। উপদিষ্টা অশুভদর্শন দারুণকর্মা রক্ষীগণ সরল উৎকৃষ্ট পঞ্চতন্ত্রী রজ্জু্দ্বারা বীভৎসভাবে রামপালকে বন্ধন করিয়াছিল। বিগতভক্ষ্য রামপালের মাংস শোণিত সামর্থ বিদূরিত হইয়াছিল। দুঃসহ নিগ্রহে তিনি কায়িক বায়িক মানসিক দোষত্রয় রাগদ্বেষমোহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।*

বরেন্দ্র বিদ্রোহ

যে চক্রান্তের ফলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যগ্রহণপূর্বক অনীনিত কার্য্যে রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয়কে এইভাবে কারারুদ্ধ করিতে বাধ্য হন সেই অনন্তসামন্তচক্র এইবার প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। রণচতুর চতুরঙ্গ সৈন্যদলসহ তাহারা মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়। তাহাদের সঙ্গে অনেক সুশিক্ষিত মদমত্ত হস্তী তুরঙ্গ রণতরী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। সে তুলনায় মহীপালের আয়োজন খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার সৈন্যগণ অতিশয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে অস্ত্রচ্যুত অত্যন্তভীত ও রিক্তকুন্তল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ষড়গুণশালী মন্ত্রীর উপদেশ অবহেলা করিয়া বলবিপর্য্যয় অবস্থায় এই কষ্টকর সমরসাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে শত্রুর শরাঘাতে প্রাণ দিতে হইল।†

দ্বিতীয় মহীপালের তিরোধানের ফলে রামপাল কারামুক্ত হোলেন,

* রামচরিতম্ ১।৩২-৩৯ † ১।৩১

কিন্তু তাঁর স্বপক্ষীয় সামন্তদের উদ্দেশ্য সার্থক হোল না। তাঁরা শূন্য সিংহাসনে রামপালকে বসাবার পূর্বে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অতিশয় উন্নতপদে আরূঢ় রাজপুরুষ দিব্যোক বা দিব্য অবশ্য-কর্তব্যবোধে শক্রতার ছদ্ম আবরণে বরেন্দ্রীর শাসনভার গ্রহণ করেন। দিব্য ছিলেন জাতিতে মাহিষ্য—অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। রামচরিতমের বর্ণনা পড়ে মনে হয়, দ্বিতীয় মহীপাল রণক্ষেত্রে নিহত হোলে এই প্রভুভক্ত মাহিষ্য বীর তাঁর বংশধরগণের প্রতিভূ হয়ে বরেন্দ্র শাসন করতে থাকেন। ভীতা বরেন্দ্রী যথাক্রমে দিব্যোক এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রুদোকতনয় ভীমের সম্যক রক্ষণাধীন হয়। দিব্যোক কেনই বা রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন এবং কেনই বা নানা সদ্‌গুণশালী ভীম সেখানে এসে অভিনয় করতে লাগলেন তার কারণ গ্রন্থকার লেখেন নি।

এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে পীঠির সামন্ত দেবরক্ষিত মগধ অধিকার করে বসেন। নিরালম্ব রামপাল তখন তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূটরাজ মহন বা মথনের গৃহে আশ্রয় নিলে তিনি মগধ পুনরুদ্ধারে ভাগিনেয়কে প্রভূতভাবে সাহায্য প্রদান করেন। অতঃপর মাতুলের পরামর্শ অনুসারে রামপাল সামন্তবর্গের দ্বারস্থ হোলে দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ, কোটাটবিরাজ বীরগুণ, দেবগ্রামের বিক্রমসিংহ, অপার-মন্দারের লক্ষ্মীশূর, কুজবটির শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, ঢেক্করির প্রতাপসিংহ, সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্দ্ধন প্রভৃতি মগধ ও রাঢ়ের সামন্তগণ তাঁকে ভীমের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।*

মাতুল মহনের পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র মহামাণ্ডলিক কহ্নুর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র-পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজ নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ রামপালের পাশে এসে উপস্থিত হোলেন। প্রভু রামপালের আদেশে শস্ত্রপাণি শিবরাজ মহাতটিনী গঙ্গা লঙ্ঘন করে খড়্গাঘাতে বরেন্দ্র ব্যস্ত করতে

† ২।৪-৬

লাগলেন। ভীমের রক্ষাব্যূহ সর্বত্র ভগ্ন হোল, তিনি উন্মনা হয়ে পড়লেন। সেই অবসরে রামপাল সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীসহ গোপনে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে ব্যূহবিন্যাস সুরু করলেন। বরেন্দ্রের আকাশে প্রলয়ের বিশান বেজে উঠল !

ভীম অপ্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যদলে হয়হস্তী, রথরথী, পদাতিক ছাড়াও এক মহিষবাহিনী ছিল। উভয় পক্ষের অতিবিশ্বস্ত সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রতি বাণ ও শল্যসমূহ নিক্ষেপ করতে লাগল—রক্তের নদী বইল। কিন্তু বিধিবিড়ম্বনা বশতঃ শত্রুশ্রেষ্ঠ ভীম জীবিতাবস্থাতেই বলপূর্বক ধৃত হোলেন। তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী পরিচ্ছিন্ন হোল ; মহিষবাহিনী হোল দূরীভূত।*

বীরগণের বাঞ্ছিত ইন্দ্রের উপভোগ্য সেই ধর্মযুদ্ধ কিন্তু এখানে শেষ হয় নি। রামপালের সুবিন্যস্ত ব্যূহ আক্রমণের জন্য ভীমের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হরি অমিতশক্তিশালী ভীমসৈন্য একত্রীভূত করলেন। আরণ্য সৈন্যসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তিনি জয়লাভের আকাঙ্ক্ষাও করতে লাগলেন। কারারক্ষীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে বন্দীকৃত ভীম এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে রামপালের রাজ্য বিপুল অশ্ববাহিনীর দ্বারা বিদীর্ণ হোল। তথাপি যুদ্ধে হরি পরাজিত হোলেন। কাহ্নুরের অধিনায়কত্বে রামপালের সম্মিলিত বাহিনী তাঁর সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কারামুক্ত ভীম সেই সুচতুর অরিকে শমন সদনে প্রেরণ করলেন বটে, কিন্তু নিহতকুটুম্ব রামপাল ভীমের বধ সাধন করে সেই যুদ্ধের উপসংহার করেন।†

বরেন্দ্রের উপর পালবংশের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় !

সন্ধ্যাকরনন্দী

আর্য্যাছন্দে রচিত দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রামচরিতম্ থেকে বরেন্দ্র বিদ্রোহের এই যে কাহিনী সঙ্কলিত করা হয়েছে অন্য সূত্রেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেই কারণে পুস্তকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

* ২।১০-৩০ †২।৪৭

অনুরূপ আরও বহু পুস্তক পালরাজ্যের বিভিন্ন মহাবিহারে রক্ষিত ছিল, তুর্কী আক্রমণের সময় সেগুলি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তালপত্রে লিখিত রামচরিতমের একখানি মাত্র কপি নেপাল থেকে আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পুস্তকটির লেখক সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা পিনাকীনন্দী ছিলেন রামপালের পুত্র মদনপালের সান্ধিবিগ্রহিক। সেই কারণে সমকালীন ফার্দৌসি রচিত শাহ্নামার ন্যায় রামচরিতম্ ফরমায়েসী পুস্তক। উভয় গ্রন্থেই পক্ষপাতিত্ব দোষ যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু রামচরিতমে প্রতিপক্ষের দুই নেতা দিব্যোক ও ভীমকে সন্ধ্যাকরনন্দী যে ভাবে প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

সন্ধ্যাকরনন্দীর পৃষ্ঠপোষক মদনপাল নিজেও ছিলেন ঐতিহাসিক। তাঁর মহিষী চিত্রমতিকা দেবী স্বামীর বিজয়রাজ্যের অষ্টম বৎসরে জনৈক ব্রাহ্মণকে একখণ্ড ভূমি দান করেন। তাম্রপটে লিখিত সেই দানপত্রে ধর্মপাল থেকে সুরু করে পরপর সকল পালরাজের কাহিনী যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে এটিকে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পালরাজগণের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন আছে, কিন্তু মদনপালের মন্‌হলি লিপির ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুসম্পন্ন কোনটিই নয়।

অভয়ঙ্করগুপ্ত

সন্ধ্যাকরনন্দী ছিলেন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। শ্রীবুদ্ধকে নমস্কার ও জটাজুটধারী মহেশ্বরকে বন্দনা করে তিনি রামচরিতমের মুখবন্ধ রচনা করেছেন। মদনপালও বুদ্ধকে স্মরণ করে ভূমি দান করেছেন। অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে বুদ্ধ বন্দনা সুরু হয়েছিল চার শ' বৎসর পরে তা শেষ দিন পর্য্যন্ত চলে। এরূপ ধর্মনিষ্ঠ রাজবংশের আশ্রয়ে যে সব বৌদ্ধ মনীষীর প্রতিভা বিকশিত

হয়েছিল অভয়ঙ্করগুপ্ত তাঁদের অন্যতম—শেষও বটে।

সুম্পা-খাম্পো অভয়ঙ্করের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে দেখা যায় যে উড়িষ্যার জারিখণ্ড নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা ব্রাহ্মণী। শৈশবে সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়নের পর তারুণ্যে উপনীত হয়ে অভয়ঙ্কর বেদবেদান্তে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তারপর বিভিন্ন বৌদ্ধ অর্হতের সাহচর্য্যে এসে তিনি বুঝে নেন, বুদ্ধের পথ সত্যের পথ। এই মতে দীক্ষা গ্রহণের পর কয়েক বৎসর নালন্দায় অবস্থান করে তিনি বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে শবসাধনা করতে থাকেন। ঘটনাচক্রে গৌড়েশ্বর রামপাল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে তাঁর সাধন ভজনের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিহার নির্মাণ করে দেন। কিছু দিন পরে তিনি বিক্রমশীলার আচার্য্য নিযুক্ত হন। রামপালের পর পালশক্তি যখন বরেন্দ্র ত্যাগ করে মগধে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন তিনি বিক্রমশীলায় উপস্থিত ছিলেন।

তন্ত্রে অভয়ঙ্করের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। বিক্রমশীলায় অধ্যাপনার সময়ে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি মূল্যবান টীকা রচনা করেন। এই কার্য্যে বহু বিদ্যার্থী অবশ্য তাঁকে সাহায্য করেছিল। প্রজ্ঞাপারমিতার জন্য তিনি শাক্যমতালঙ্কার, অভিধর্মের জন্য লোকসংক্ষেপ, বিনয়ের জন্য ভিক্ষুবিদ্যাতিলক এবং মধ্যমিকার জন্য মধ্যমামঞ্জরী রচনা করেন। আরও বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁকে মহাযানপন্থীদের এক দিকপাল বলে মনে করা হোত। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে তিনি তাসি লামার অবতার।[২]

দীপ নির্বাণ

মাতুলবংশের সহায়তা ও মন্ত্রী বোধিদেবের কর্মদক্ষতার গুণে রামপাল গৌড় ও মগধের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে রামাবতী নগরীতে তাঁর নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গের রাজমহিষী

বেদশ্রী ছিলেন তাঁর মাতৃস্বসা, আবার তাঁর মাতুলবংশের এক তরুণীকে বিবাহ করেছিলেন কনৌজের নূতন অধীশ্বর বিজয়চন্দ্র। এই সব প্রভাবশালী আত্মীয়দের সাহায্য পেয়েও তিনি পাল বংশের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। উড়িষ্যার নূতন অধিপতি দক্ষিণ রাঢ়ে প্রবেশ করে অপার-মন্দার পাশে রেখে ভাগীরথী পর্য্যন্ত এগিয়ে আসেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য অক্লেশে সমগ্র গৌড় অতিক্রম করে কামরূপ সীমান্তে উপনীত হন।[৩] রাজ্যের অভ্যন্তরভাগেও ছোটখাট বিদ্রোহ দেখা দেয়।

মাতুল মহনের সামরিক বল ছিল রামপালের প্রধান অবলম্বন। সেই বহিরাগত সৈনিকদের সাহায্য নিয়ে তিনি বরেন্দ্র বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, আবার তাদের সাহায্যেই সিংহাসন আপদমুক্ত রাখেন। কিছু কাল পরে মাতুল আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করলে রামপাল প্রমাদ গণেন। রাজ্যাভ্যন্তরে অসংখ্য বিদেশী সৈনিক, অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি তাঁর নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রামপাল মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গাগর্ভে জীবনাহুতি দিয়ে সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটান!

এর পর পালবংশের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। রামপালের পুত্র কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করবার অনতিকাল পরে কামরূপের সামন্ত তিম্যগ্‌দেব বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেবকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠান পাঠান হয়। সাক্ষাৎ মার্তণ্ডবিক্রম বিজয়শীল সেই সৈন্যাধ্যক্ষ তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞা মাল্যদামের ন্যায় মস্তকে ধারণ করে নিজ ভুজবলে তিম্যগ্‌দেবকে পরাভূত করেন। কিন্তু কামরূপ কুমারপালের হাতে ফিরে আসে না, বৈদ্যদেব সেখানকার অধীশ্বর হয়ে বসেন![৪]

একই সময়ে রাঢ়ে এক নূতন শক্তির অভ্যুদয় হয়ে কুমারপালের অস্তিত্ব এমনভাবে বিপন্ন করে তোলে যে তাঁকে জনকভূ বরেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়ে মগধে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিক্রমশীলায় স্থাপিত

হয় তাঁর অস্থায়ী রাজধানী। অভয়ঙ্করগুপ্ত তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। তিনি গৌড়েশ্বরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু শক্তি যোগাতে পারেন নি। শেষ পর্য্যন্ত সেখানেও বেশী দিন অবস্থান করা সম্ভব হোল না, আরও পশ্চিমে সরে গিয়ে কুমারপাল সঙ্কুচিত মগধের উপর রাজত্ব করতে লাগলেন।

স্বস্তি কোথাও নেই। গৌড়ের নূতন অধিপতি বিজয়সেন মাঝে মাঝে মগধের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাচ্ছেন, আবার কনৌজরাজ বিজয়-চন্দ্র পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন। দুই সীমান্তের এই চাপ অসহ্য হোলেও পালরাজগণ ভেঙে পড়েন নি; যুযুধমান দুই প্রতিবেশীর মাঝখানে এক ক্ষুদ্র বাফার ষ্টেটের উপর অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন। পরিশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী সৈন্যগণ যখন পূর্ব ভারতে এসে আবির্ভূত হয় তখন কনৌজের জয়চন্দ্র ও গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের ন্যায় গোবিন্দপালও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিদায় নেন। দীর্ঘ চার শত বৎসর পরে পালবংশের দীপশিখা চিরতরে নির্বাপিত হয়!

১ সন্ধ্যাকরনন্দী, রামচরিতম্, সম্পাদনা অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

2 Sumpa Khan-po Yese Pal Jor *Pag Sam Jon Zang, p. 63, 112, 120, 121*

3 Bhandarkar R. G. *Early History of Deccan, p. 39*

4 *Epigraphia Indica, Vol. 11, p. 319*

ত্রিংশ অধ্যায়

সেন বংশের অভ্যুদয়

কর্ণাটকীর সন্ধানে

যে সেনরাজ বিজয়সেন কুমারপালকে গৌড় থেকে দূরীভূত করেন তাঁর আদি নিবাস কর্ণাটক। সুদূর কর্ণাটক থেকে এসে তিনি গৌড়ের রাজদণ্ড গ্রহণ করলেন, অথচ এর পশ্চাতে কোন সামরিক অভিযানের কাহিনী নেই। তাই সেই দূরাগত বিদেশীর রাজ্যলাভ ঐতিহাসিকদের কাছে বরাবর এক রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে চান্দেল্লরাজ ধঙ্গদেব (৯৫০-৯৯) এবং চোল সম্রাট রাজেন্দ্র (১০১২-৪০) যেক্ষেত্রে সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও কোন ভূভাগ স্থায়ীভাবে অধিকার করতে পারেন নি, সেক্ষেত্রে কর্ণাটাগত বিজয়সেন বিনা রক্তপাতে এক শক্তিশালী রাজ্য কেমন করে স্থাপন করলেন এই প্রশ্নের জবাব নানা সুধী নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধারণা এই যে রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সেনবংশের বীজপুরুষ লুকায়িত ছিলেন। গঙ্গাজলের যুদ্ধের পর চোল সৈন্যগণ দেশে ফিরে গেলেও তাদের জনৈক কর্ণাটকী সৈন্যাধ্যক্ষ ভাগীরথীতীরে তীর্থবাসের জন্য রাঢ়ে থেকে যান; তাঁর বংশধরগণ সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা।[১]

ভূগোল কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করে না। কর্ণাটক বা কুন্তল দেশের উত্তর সীমা নর্মদা এবং দক্ষিণ সীমা তুঙ্গভদ্রা।[২] শেষোক্ত সীমান্তের পশ্চিমদিকে রাজত্ব করত চালুক্যগণ এবং পূর্বদিকে চোল। তুঙ্গভদ্রা ছিল রাজ্য দুটির সঙ্গে সাধারণ সীমান্ত। এই সীমান্ত পার হয়ে

উভয় শক্তি মাঝে মাঝে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাত। এত বড় ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করে চোল বাহিনীতে কর্ণাটকী সৈন্যের উপস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না।

চোলদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কিছু কাল পরে কলচুরিরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়। তাদের উত্তরে চান্দেল্লগণ তখন সুলতান মামুদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামের ফলে রণক্লান্ত; দক্ষিণে চালুক্য ও চোলগণ পরস্পরের প্রতি অসি নিষ্কাশিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব (১০১৫-৪০) তাঁর সকল সীমান্ত আপদশূন্য দেখে বারাণসী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ এবং বৌদ্ধ বিহারের সংস্কার করেন। তাঁর পুত্র কর্ণদেব (১০৪০-৭০) দুইবার সসৈন্যে পূর্বভারতে এসে দেশ জয় করতে না পারলেও দুই কন্যাকে গৌড়েশ্বর ও বঙ্গাধিপতির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পূর্ব ভারতের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেন। পিতাপুত্রের সকল যুদ্ধোদ্যমে কর্ণাটকী সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছিলেন দক্ষিণ হস্ত।[৩]

কলচুরিদের এই রাজ্য গঠিত হয়েছিল নর্মদা উপত্যকায় চেদি বা দাহল-মণ্ডল ও কর্ণাটকের উত্তরাংশ নিয়ে। কিছু দিন পূর্বেও রাষ্ট্রকূটগণ এখানে রাজত্ব করত বলে আলোচ্য সময়ে গৌড়ে রচিত তারাতন্ত্র ও রামচরিতমে কলচুরিগণকে রাষ্ট্রকূট বলা হয়েছে। বরেন্দ্র বিদ্রোহের সময়ে যে সব সৈনিক রামপালের সাহায্যার্থে গৌড়ে এসেছিল সন্ধ্যাকর-নন্দীর মতে তারা রাষ্ট্রকূট। কিন্তু কর্ণাটকীও যথেষ্ট ছিল। সেই মিশ্র বাহিনীর দুইজন অধিনায়কের মধ্যে শিবরাজ ছিলেন মহাপ্রতিহার এবং কাহ্নুর মহামাণ্ডলিক—কয়েকটি সামন্ত বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। যে সব সামন্ত কাহ্নুরের সঙ্গে এসেছিলেন বিদ্রোহ দমনের পর তাঁদের অনেকে এখানে অবস্থান করে রামপালকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন। তাঁদের একজন যে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্তসেন এরূপ অনুমান আমরা করতে পারি।

হেমন্তসেনের পরিচয়

স্বদেশে অবস্থানের সময়ে হেমন্তসেনের পিতা সামন্তসেন ছিলেন কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব অথবা কর্ণদেবের সামন্ত। কর্ণাটকের এক অখ্যাত অঞ্চলে তিনি রাজত্ব করতেন এবং যুদ্ধের সময়ে সসৈন্যে অধিরাজের পাশে এসে দাঁড়াতেন। বরেন্দ্র বিজয়ের পর তাঁর পৌত্র বিজয়সেন রাজসাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামে যে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তার শিলালিপি থেকে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন এই বংশের বীজপুরুষ। রণনৈপুণ্যের জন্য তাঁর বংশধর শতশত্রুধ্বংসকারী সামন্তসেনের খ্যাতি সমগ্র কর্ণাটকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। যে দুর্বৃত্ত শত্রুগণ কর্ণাটলক্ষ্মীকে লুণ্ঠন করতে এসেছিল তিনি তাদের এরূপভাবে কদন বিধান করেছিলেন যে তাদের মজ্জা, মাংস ও অস্থি এখনও সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সেই কারণে যম আজও দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ করতে পারেন নি।

বৃদ্ধ বয়সে সামন্তসেন ধর্মসাধনার জন্য কর্ণাটক পরিত্যাগ করে পার্বত্য জঙ্গলময় গঙ্গাতীরবর্তী কুঞ্জবনের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে পূজার ধূপগন্ধ আকাশ স্পর্শ করত, মৃগশিশুরা মুনিপত্নীদের স্তন্যপান করত, শুকপক্ষী বেদ পাঠ করত এবং মৃত্যু সময় উপস্থিত হোলে ঋষিগণ পর্বতগাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। স্থানটি যে হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশ এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ গঙ্গার সুদীর্ঘ তটরেখার মধ্যে পার্বত্য জঙ্গলময় স্থান আর কোথাও নেই। ধর্মসাধনার জন্য সামন্তসেন নবদ্বীপে এসে বাস করেছিলেন বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের এই কথাটি বিবেচনা করা উচিত। পালরাজ্যে তিনি আসেন নি—এসেছিলেন তাঁর পুত্র হেমন্তসেন।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে আরও লেখা আছে যে সেই রাজা সামন্তসেন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও যখন ঈশ্বরোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন নি সেই সময়ে তাঁর ঔরসে নিজভুজমদমত্ত অরাতিগণের মারাঙ্করীর

হেমন্তসেন নামক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাবলশালী হেমন্তসেন বলগর্বী শত্রুগণকে নিধন করে বংশগৌরব রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী যশোদেবী থেকে পৃথিবীপতি বিজয়সেনের জন্ম হয়। যৌবনে তিনি অরাতিকুল ধ্বংস এবং পৃথিবীবলয় চার সমুদ্র পর্য্যন্ত নিজ অধিকার প্রসারিত করেন।[১]

এই প্রসার পিতৃভূমি কর্ণাটকে সম্ভব হয় নি—গৌড়ে হয়েছিল। সেনবংশের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিকদের আদিপুরুষ শুনক যশোধর ১০০১ শকাব্দে বঙ্গেশ্বর শ্যামলবর্মার আহ্বানে তাঁর রাজ্যে আগমন করেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলজীগ্রন্থে সেনবংশের পরিচয়-দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পরমধর্মজ্ঞ সেনবংশীয় ত্রিবিক্রম মহারাজ সুবর্ণরেখা বিধৌত অঞ্চলে কাশীপুরীর নিকটে রাজত্ব করতেন। গঙ্গা-সলিলে পূত সজ্জনতারিণী এই নদীতীরে অবস্থান করে সেই মহীপাল তাঁর স্ত্রী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেন সেই পুরে রাজা হন। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিময়ী বিলোলা তাঁর পত্নী—

ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশসমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্মজ্ঞঃ কাশীপুরী সমীপতঃ॥

স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্ণাঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতারিণী॥

অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতাং স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং॥

আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥

সেনবংশ সমুদ্ভূত ত্রিবিক্রম মহারাজ যে হেমন্তসেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কিন্তু বিবরণ দুটির মধ্যে অসংলগ্নতা যথেষ্ট

রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে বিজয়সেনের মায়ের নাম যশোদেবী, অন্যটিতে বলা হয়েছে মালতী। আরও লক্ষণীয় এই যে কুলজীগ্রন্থের লেখক ঈশ্বর বৈদিক হেমন্তসেনকে মহারাজ বলেছেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী মালতী বা পুত্রবধূ বিলোলাকে রাণীর মর্য্যাদা দেন নি। কারণ, হেমন্ত-সেনের রাজ্য এখনকার মেদিনীপুর জেলার এক বৃহৎ জমিদারী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পরে কোন সময়ে রাঢ়ের শূরবংশীয়া রাজকন্যা বিলখ বা বিলাসদেবীর সঙ্গে তাঁর পুত্র বিজয়সেনের বিবাহ হওয়ায় রাজ সংস্রব ঘটে।

বিজয়সেন

অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থ থেকে সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঢাকুর নামক কুলজীগ্রন্থের রচয়িতা যদু-নন্দন লিখেছেন, অপার-মন্দারের নূতন অধীশ্বর নিত্যশূর পুত্রদের আচরণে উত্যক্ত হয়ে তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করেন, কিন্তু তাতে ফল হয় বিপরীত! রাজকুমারগণ পালিয়ে গিয়ে কাশীপুরীর সেন পরিবারে আশ্রয় নেন; যুবরাজ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিছুকাল পরে নিত্যশূর পুত্রশোকে ইহলোক ত্যাগ করলে রাঢ় অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে—সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়।[৫] হেমন্তসেন তখনও জীবিত। কিছু দিন বৈবাহিক পরিবারের অভিভাবকত্ব করবার পর এক সময়ে তিনি পুত্র বিজয়সেনকে নিঃশব্দে অপার-মন্দারের সিংহাসনে বসিয়ে দেন। পত্নী বিলাসদেবীর প্রতিভূ হয়ে তিনি রাঢ় শাসন করতে থাকেন এবং এখানকার সম্পদ দিয়ে সন্নিহিত জনপদগুলি জয় করেন।

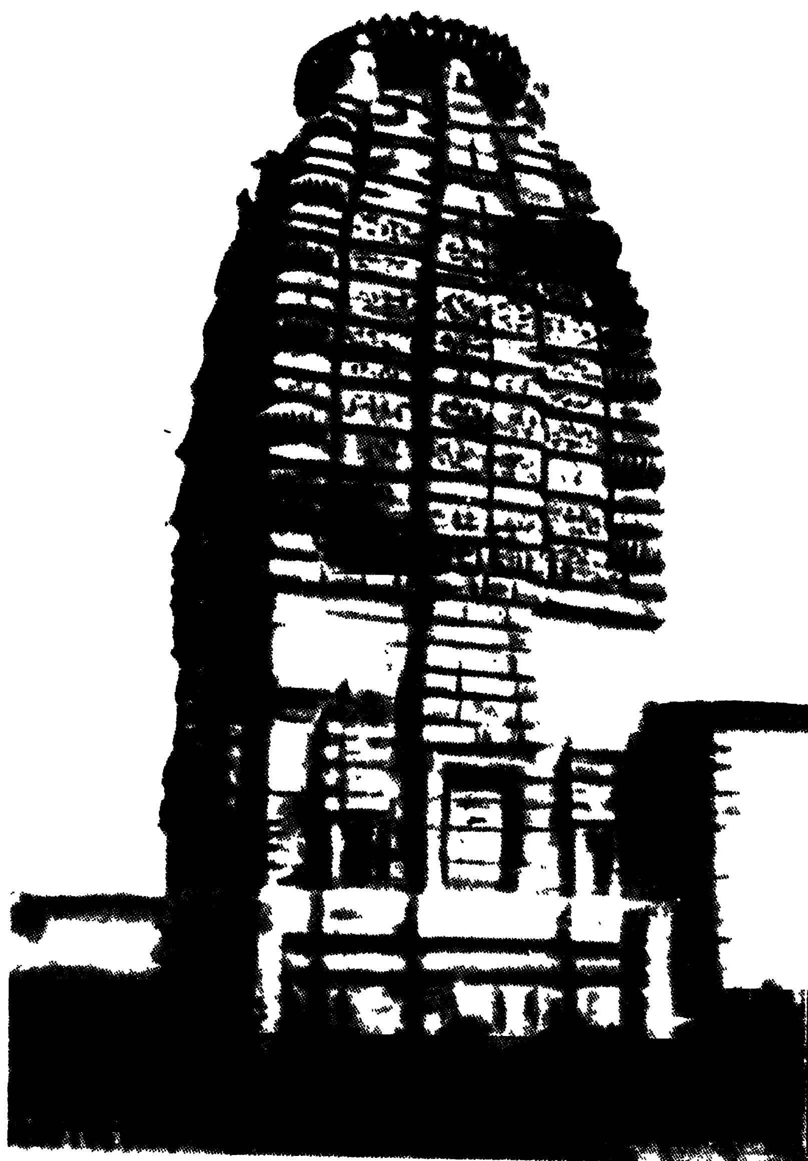
পালরাজ্যে আগের শ্লথতা চলছিল। সেই কারণে রাঢ়ে আক্রমণের ঘাঁটী স্থাপন করে বরেন্দ্র অধিকার করা বিজয়সেনের পক্ষে শক্ত হয় নি। দানসাগরে বল্লালসেন লিখেছেন, তাঁর পিতা বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন।[৬] তাঁর চাপে কুমারপাল মগধে সরে গিয়ে এক সঙ্কুচিত

রাজ্যের উপর রাজত্ব করতে থাকেন। বরেন্দ্র জয় স্মরণীয় করবার জন্য যে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির নির্মিত হয় তাতে আরও লেখা আছে যে বিজয়সেনের হস্তে বন্দী তিনজন রাজা কারাগারের মধ্যে পরস্পরকে বলছেন—নান্য! তুমি এইরূপ শূরকে কি মনে কর? রাঘব! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘা করছ? বীর! অদ্যাপি কি তোমার দর্প চূর্ণ হোল না?

নান্য, রাঘব ও বীর যে কে বা বিজয়সেনের নৌবিতান ভাগীরথীর উপর দিয়ে কোথায় গিয়েছিল তার কোন সন্ধান আমরা রাখি না। বর্ণনা আছে, কিন্তু বিবরণ নেই। তবে সে সময়কার ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে মনে হয় যে অতি ক্ষিপ্রগতিতে অভিযান চালিয়ে বিজয়সেন সমগ্র গৌড় ও বঙ্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী বিজয়পুর।

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর

সেন বংশের অভ্যুদয়ের সময় থেকে বহু সাহিত্যিক, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, শিল্পী প্রভৃতি গৌড়ে আবির্ভূত হন। তাঁদের রচনাবলী থেকে সে সময়কার বহু তথ্য জানা গেলেও আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিজয়সেন কেমন করে সমগ্র গৌড়-বঙ্গের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত কোথাও নেই। তাঁর সাফল্যের পশ্চাতে যদি বড় রকমের কোন যুদ্ধজয়ের কাহিনী থাকত তা হোলে আর কেউ না হোক লক্ষ্মণসেনের সভাকবি উমাপতিধর পল্লবিত ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করে যেতেন। সে লেখার মধ্যে দেখতাম, বিজয়সেনের যুদ্ধে স্বর্গমর্ত্ত কেঁপে উঠছে এবং অন্তরীক্ষে বসে দেবতা ও গান্ধর্বগণ তা দেখছেন! হয় তো বা স্বয়ং মহেশ্বর মর্ত্তে নেমে এসে অস্ত্র সম্বরণের জন্য বিজয়সেনকে অনুরোধ জানাচ্ছেন! তেমন কোন লেখা যখন কোথাও নেই তখন যুদ্ধজয়ের ফলে যে সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি একথা নিশ্চয়ভাবে বলা যায়। পরবর্তীকালে রবার্ট ক্লাইভ যেমন



বরাকর মন্দির

অনুমান—সেন যুগে নির্মিত

নামমাত্র যুদ্ধের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন বিজয়সেনও তেমনি অলিখিত এক তুচ্ছ যুদ্ধের ফলে সমগ্র গৌড় ও বঙ্গের অধীশ্বর হয়ে বসেন।

বিজয়সেনের অভিষেকের পর থেকে গৌড়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এক শক্তিশালী রাজবংশের শাসনাধীনে এসে জনসাধারণ নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করে। তাদের জীবনে জোয়ার দেখা দেয়, সর্বত্র উদ্দাম প্রাণের স্রোত বইতে থাকে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়ের রাঢ় বিষয়ে এমন সব শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যে সাত শত বৎসর পরে ইংরাজ আগমনের পূর্বে তেমনটি আর কোন দিন হয় নি। রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিজয়সেন এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে জাগালেন। গাছের শাখায় পাখী জাগল, অশ্বশালে অশ্ব জাগল, হাতীশালে হাতী জাগল। রাজাধিরাজ জাগলেন, রাজমাতা জাগলেন, রাজভ্রাতা জাগলেন, সমস্ত জাতি জেগে উঠল—

> ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলস্বর।
> গাছের শাখে জাগিল পাখি, কুসুমে মধুকর।
> অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া, হস্তীশালে হাতি।
> মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।
> জাগিল পথে প্রহরীদল, দুয়ারে জাগে দ্বারী,
> আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা—জাগিল নরনারী।
> উঠিল জাগি রাজাধিরাজ, জাগিল রাণীমাতা।
> কচালি আঁখি কুমারসাথে জাগিল রাজভ্রাতা।
> নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা,
> জাগিয়া উঠি শয্যাতলে শুধাল রাজবালা—
> 'কে পরালে মালা!'

1 Banerjee R. D. *Palas of Bengal, p. 73, 99*

2 Dey N. L. *Geographical Dictionery of Ancient and Mediaeval India p. 94, 109*

৩ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, পৃঃ ৩০২

4 Metcalf C. T. *Journ. Asiat. Soc. Beng., Vol. 34, p. 128-54*

৫ যদুনন্দন মিশ্র, ঢাকুর, পৃঃ ৬২

৬ বল্লালসেন, দানসাগর, ভূমিকা

একত্রিংশ অধ্যায়

মধ্যযুগের মনু জীমূতবাহন

বিজয়সেনের উত্তরাধিকার আইন—দায়ভাগ

অষ্টম শতাব্দীতে রাঢ়াধীশ আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের স্বরাজ্যে এনেছিলেন উত্তরকালে তাঁদের বংশধরগণ সমগ্র পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করে। আজও করছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ বংশ বিশেষ প্রতিভাবান। এই বংশীয় দর্ভপাণি ও তাঁর পুত্রপৌত্রগণ বিভিন্ন পাল-রাজের অধীনে মহামন্ত্রীর কাজ করেন। এই বংশের আর এক উজ্জ্বল রত্ন জীমূতবাহন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইন রচয়িতা। আবার আমাদের সময়কার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ভট্টনারায়ণ বংশের সন্তান!

কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র জীমূতবাহনের যে বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে দেখা যায় যে ভট্টনারায়ণের অধস্তন নবম পুরুষে তাঁর জন্ম হয়। গোত্র শাণ্ডিল্য, গাঞী পারিহাল। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের যে শাখা ক্ষীতিশূরের কাছ থেকে পারিহাল গ্রামখানি* লাভ করে তিনি সেই শাখার অন্তর্ভুক্ত। পিতামহের নাম হলধর; পিতা চতুর্ভুজ; ভ্রাতা বিল্বমঙ্গল। ১০১৪ শকে—১০৯২ খৃষ্টাব্দে—তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর বিস্বকসেন বা বিজয়সেন তাঁকে অমাত্য ও প্রাড়্‌বিবাক পদে নিযুক্ত করে যে দায়ভাগ আইন রচনায় প্রবুদ্ধ করেন গৌড়-বঙ্গের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা গত নয় শত বৎসর ধরে সেই আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়েছে।

* পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য।

দায়ভাগ প্রণয়নে প্রাড়্‌বিবাক জীমূতবাহন মনু, পরাশর, যাগ্যবল্ক নারদ প্রভৃতি পূর্বতন ন্যায়াধীশদের বিধানগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করে যে সব ধারা সন্নিবেশিত করেছেন তাতে তাঁর প্রগাঢ় বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ব্যবহার-মাতৃকা সে যুগের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কাল-বিবেকে তিনি জনসাধারণ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আচারের কাল নির্ণয় করে গেছেন। আরও কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু দায়ভাগ সমধিক প্রসিদ্ধ।

দায়ভাগ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জীমূতবাহন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলছেন, পুত্রগণ পিতৃধনের যে বিভাগ করে তার নাম দায়ভাগ এবং যে ধন বিভক্ত হয় তা বিবাদপাদ। এই ধন নিয়ে নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। পিতা ও পুত্র এই ধনবিভাগে উপলক্ষ মাত্র—জননী, ভগ্নি প্রভৃতিরও এতে সুনির্দিষ্ট অংশ আছে।

পূর্ব স্বামীর মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার সত্ত্বের কারণ। জন্মই অর্জন। পুত্রগণ জন্মসূত্রে পিতৃধন অর্জন করে। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর তারা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে সেই ধন বণ্টন করে নেবে। তাঁদের জীবদ্দশায় পুত্রেরা অনীশ—অপ্রভু। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। নারদবচন এই যে জীবিতাবস্থায় পিতা যদি পতিত বা গৃহস্থাশ্রমরহিত হন তা হোলে মাতার রজোনিবৃত্তি ও ভগ্নিগণ পাত্রস্থ হওয়ার পর পুত্রেরা পিতৃধন প্রাপ্ত হয়—

মাতুর্নিবৃত্তে রজসি দত্তাসু ভগিনীষু চ।
বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে॥ ১৭

সকল পুত্র পিতৃধনে সমান অধিকারী হোলেও পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ সেই ধন গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট ভ্রাতাগণ তার অনুজীবি হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার ন্যায় সকল অনুগত ভ্রাতাকে প্রতিপালন করবেন; কিন্তু তিনি অক্ষম হোলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি শক্ত হয় তা হোলে সে পিতৃধন ও একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা হবে—

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণাম ঋণশ্চৈব স তস্মাল্লব্ধুমর্হতি ॥

বিভৃয়াদ্বেচ্ছতঃ সর্ব্বান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যথা পিতা।
ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা শক্ত্যপেক্ষা কুলে স্থিতিঃ ॥ ১৯

আদর্শ যাই হোক পরিবার চিরদিন একান্নবর্তী থাকে না। আবার ভ্রাতাগণ পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিছু পৃথগান্ন হয় না—বিশেষ করে মাতা বর্তমানে। সেই কারণে যাগ্যবল্ক বলেন, পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা পৈত্রিক ধন এবং ঋণ ভাগ করে নেবে। ঋণ শোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই বন্টিত হবে ; পিতা যেন ঋণগ্রস্ত না থাকেন—

যাচ্ছিষ্টং পিতৃদায়েভ্যো দত্বর্ণং পৈত্রিকং ততঃ।
ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যমৃণী ন স্যাদ্যথা পিতা ॥ ২২

শকুনি যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষের আশ্রয় আশা করে সেইরূপ পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহও আশা করেন যে জাত সন্তান বর্ষায় ও মঘায় মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা তাঁদের শ্রাদ্ধ করবে। সেই কারণে দেবলবচন অনুসারে এই শ্রাদ্ধাধিকারীগণ পিতামহ ও প্রপিতামহের ধনের তুল্য অধিকারী—

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাস্যতে সুতং জাতং শকুন্তাইব পিপ্পলং ॥

মধুমাংসৈশ্চ পয়সা পায়সেন চ।
এষ নো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥ ৪৭

পিতা জীবিত থাকতে পুত্র ও পৌত্রগণ পিতামহাদির ধনের অধিকারী হয় না। তাঁদের পরিত্যক্ত নগদ অর্থ বা মণিমুক্তাপ্রবালাদি অস্থাবর ধনের অধিকারীও পিতা। তিনি স্বোপার্জিত অর্থের ন্যায় এগুলি বিভাগ করে দিতে পারেন, কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিভাগে তাঁর কোন অধিকার নেই—

মণিমুক্তাপ্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ।
স্থাবরস্য তু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ॥ ২৭

পিতৃধনে মাতারও অধিকার আছে। তাঁর বর্তমানে পুত্রগণ যদি তাঁর মৃত স্বামীর ধন বণ্টন করতে উদ্যোগী হয় তা হোলে তিনি পুত্রদের সমান অংশ পাবার অধিকারী। পুত্রহীনা বিমাতাও এইরূপ অংশ পাবেন। তবে তাঁদের মধ্যে কারও যদি স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি প্রদত্ত স্ত্রীধন থাকে তা হোলে তিনি অর্দ্ধাংশ পাবার অধিকারিণী। পিতামহের ধন বণ্টনের সময় পৌত্রেরা পিতামহীকেও এইভাবে মাতার ন্যায় অংশ দিবে—

মাতা চ পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশভাগিণী।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং দত্তেত্বর্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ॥ ১২

পুত্র পিতার আত্মার সমান, আবার দুহিতা পুত্রের সমান। সেই হেতু কন্যাও পিতৃধনের অধিকারিণী। পুত্রহীন মৃত ব্যক্তির ধন কুমারী কন্যা, তদভাবে বিবাহিতা কন্যায় বর্তাবে। ভ্রাতা বিদ্যমান থাকলেও অবিবাহিতা কন্যার পিতৃধনে অধিকার আছে; তবে সে অধিকার অনির্দিষ্ট। তাকে ভ্রাতাদের চতুর্থাংশ দেওয়া সঙ্গত, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সব সময়ে তা সম্ভব হয় না। সেই কারণে পুত্রগণ পিতৃধন থেকে কুমারী কন্যাকে বিবাহ দিবে—কোন নির্দিষ্ট অংশ দিবার প্রয়োজন নেই। তাকে পাত্রস্থ করা ভ্রাতাদের বিশেষ দায়িত্ব—

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি জীবন্ত্যাং কথমন্যো হরেদ্ধনং॥

পুত্রাভাবে চ দুহিতা তুল্য সন্তানদর্শনাৎ।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভে পিতুঃ সন্তানকারিকে॥ ১৩৫

স্ত্রীধনে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার। বিবাহের সময় তার উদ্দেশ্যে বরপক্ষের হস্তে যা কিছু দেওয়া হয় তা বধূর স্ত্রীধন। বিবাহের পর পতি, পিতৃ বা মাতৃকুল থেকে সে যে অন্বাধেয় ধন পায় এবং স্বামী

দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করবার সময় তাকে যে আধিবেদনিক ধন দেন এই দুই ধনসহ যৌতুক, শুল্ক প্রভৃতি নিম্নবর্ণিত ছয় প্রকারের ধনকে স্ত্রীধন বলে।

বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রীয়া।
অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধুং কুলাত্তথা॥
অধ্যাগ্নধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রীয়ৈ।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়িধং স্ত্রীধনং স্মৃতঃ॥ ৫৩

এই ছয় প্রকারের স্ত্রীধন রমণীগণ স্বামীর মতামতের অপেক্ষা না করে দানবিক্রয় ও ভোগ করতে পারে। গ্রাসাচ্ছাদনের উদ্বৃত্ত ধন এবং শুল্ক ও সুদ স্ত্রীধন হোলেও দুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ আপৎকালে স্বামী এই ধন-গুলি গ্রহণ করবার অধিকারী। শিল্পকর্ম করে স্ত্রীলোক যা উপার্জন করে এবং পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুরকুল ব্যতীত অন্য সূত্র থেকে যে অর্থ পায় সেগুলি স্ত্রীধন হোলেও স্বামীর তাতে অধিকার আছে। আপৎকাল ব্যতিরেকেও তিনি এই দুই প্রকারের স্ত্রীধন গ্রহণ করতে পারেন। অন্যান্য স্ত্রীধনে তাঁর অধিকার নেই। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বা অপর কেহ কোন অবস্থাতেই নারীর স্ত্রীধন আত্মসাৎ করতে পারে না।

জননী পরলোকগতা হোলে পুত্রের ও অবিবাহিতা কন্যার, একের অভাবে অন্যের, দুইয়ের অভাবে পুত্রবতী ও গর্ভবতী কন্যার, এই দুইয়ের অভাবে পৌত্রের, তার অভাবে দৌহিত্রের, তারও অভাবে বন্ধ্যা বিধবা কন্যার স্ত্রীধনে অধিকার জন্মে। মাতার বিবাহকালে লব্ধ স্ত্রীধনে পুত্র থাকলেও অবিবাহিত কন্যা, তদভাবে পুত্রবতী বিবাহিতা কন্যা, তদভাবে পুত্র অধিকারী হবে।

মৃত পতির ধনে পত্নীর অধিকার আছে। যদি পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকে তা হোলে পত্নী পতির ধন ভোগ করবে, কিন্তু দান-বিক্রয় বা বন্ধক দানের অধিকার পাবে না। তবে সে ধন যদি তার জীবন ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয় তা হোলে বিষয় বন্ধক দিতে,

তাতেও না হোলে বিক্রয় করতে পারবে। পতির ঋণ শোধ, কন্যার বিবাহ, অবশ্য-প্রতিপাল্য পোষ্য পালন, অত্যাবশ্যক ধর্মকার্য্য কিংবা পতির পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য দানবিক্রয়াদির আশ্রয় গ্রহণ করলে তা অসিদ্ধ হবে না।

বিলাসী বা ব্যভিচারিণী বিধবার পতির ধনে অধিকার নেই। ভর্তার মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে প্রতি প্রাতঃকালে স্নানের পর স্বামী, শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুরের তিলতর্পণ এবং ভক্তিপূর্বক পতিবোধে বিষ্ণুর আরাধনা করবেন। বিলাসবিমুক্ত হয়ে শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাসও তাঁকে পালন করতে হবে—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
স্নাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ সভর্ত্তে সতিলাঞ্জলীন ॥
কুর্য্যাচ্চ্যানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং।
বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা ॥ ১২৬

অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন ধনের অধিকারী হবে না। পঞ্চদশ বৎসরের শেষ অবধি অপ্রাপ্তকাল। ধনাধিকারী এই বয়সে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তার ধন বিনা ব্যয়ে রাজ মনোনীত উপযুক্ত আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে গচ্ছিত থাকবে। কেবলমাত্র রাজা এইরূপ অক্ষম ব্যক্তিদের ধনের সর্বাধ্যক্ষ। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তার ধন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

সকল ধন যে বিভাজ্য তা নয়। শৌর্য্যলব্ধ, বিদ্যার্জিত বা স্নেহপ্রাপ্ত ধনের বিভাগ হয় না। বস্ত্র, অলঙ্কার, অশ্বাদি বাহন, উদক বাদ্য, দেবস্থান, যাগস্থান, গরুর পথ, গাড়ীর পথ, নির্মিত গৃহ বা উদ্যানের উপকরণ, ব্যক্তিগত দ্রব্য প্রভৃতির বিভাগ নাই। মূর্খের সঙ্গে পুস্তকাদির বিভাগ নাই—

বস্ত্রংপত্রমলঙ্কারং কৃতান্ন মুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রবক্ষ্যতে ॥

ন বিভাজ্যং স্বগোত্রানাং মাসসহস্র কুলাদপি।
যাজ্যংক্ষেত্রঞ্চ পত্রঞ্চ কৃতান্ন মুদকং স্ত্রিয়ঃ॥

দায়ভাগ থেকে প্রক্ষিপ্ত এই যে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উপরে উদ্ধৃত করা হোল তাতে জীমূতবাহনের বিজ্ঞতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়সেন যখন সবেমাত্র গৌড়-বঙ্গ জয় সম্পন্ন করেছেন সেই সময়ে তাঁর নির্দেশে পুস্তকখানি রচিত হয়। সেই কারণে দায়ভাগের বিধানগুলি এই দুই জনপদে সীমাবদ্ধ থাকে; অন্যত্র মিতাক্ষরা আইন দ্বারা উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হোত।

দায়ভাগের বহু টীকা রচিত হয়েছে। ইংরাজ শাসনের সুরুতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশে ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়-ভাগের যে ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তুত করেন তা প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিশের উদ্যোগে মিথিলাবাসী স্মার্ত সর্বোরু মিশ্র এবং ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আরও দুইখানি মূল্যবান টীকা প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন রচনার পর দায়ভাগের আয়ু শেষ হয়েছে। কিন্তু এই নূতন আইন যেক্ষেত্রে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে দায়ভাগ সেক্ষেত্রে অসংখ্য সম্ভাব্য সমস্যার হাত থেকে নয় শত বৎসর ধরে সমাজকে বাঁচিয়ে গেছে।

ভবদেব ভট্ট

জীমূতবাহনের সমসাময়িক ভবদেব ভট্ট ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী। তাঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বশিষ্ট ক্ষিতীশূরের কাছ থেকে ওই গ্রামখানি লাভ করেছিলেন; পরে হস্তিনী নামে আরও একখানি গ্রাম এই বংশের হস্তগত হয়। পিতামহ আদিদেব বঙ্গাধিপের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্রামসচিব, সান্ধি-বিগ্রহীক ও মহামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই থেকে বঙ্গের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলেও ভবদেবের কর্মজীবন সুরু হয় রাঢ়ের

শূররাজগণের অধীনে এক নিম্নস্তরের কর্মচারীরূপে। বঙ্গেশ্বর হরিবর্মদেব তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মন্ত্রসচিবের পদে উন্নীত হন।

তন্ত্র, সিদ্ধান্ত, গণিত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদে ভবদেবের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর রচিত মীমাংসা ও স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত রয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সংস্কারাদি আজও সম্পন্ন হয়। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের বিধান অনুসারে চণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শুদ্রের কাছ থেকে কন্দুপক্ক, তৈলপক্ক, পায়স, দধি প্রভৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু অন্ন বর্জনীয়। আপৎকালে যদি ব্রাহ্মণ শুদ্রের অন্ন ভোজন করে তবে কেবল মনস্তাপ দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়। অন্য সময়ে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যকর্তব্য।

সে সময়ে বঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ভবদেবের শাস্ত্রীয় যুক্তি ও হরিবর্মদেবের কঠোর শাসনের ফলে বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বোধ হয় এই কারণে তিনি বালবলভিভুজঙ্গ উপাধি লাভ করেন।

হলায়ুধ মিশ্র

হলায়ুধের পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং দুই ভ্রাতার নাম ঈশান ও পশুপতি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বল্লালসেনের সভাপণ্ডিত, পরে মহামন্ত্রী। লক্ষ্মণসেনের অধীনেও তিনি পূর্বপদে বহাল থাকেন এবং শেষ জীবনে প্রধান ধর্মাধিকারীর কাজ করেন। শাসন-কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য তিনি সেনরাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। বল্লালসেনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থাপন এবং ওই নগরীর রক্ষাদুর্গ একডালা নির্মাণে হলায়ুধের অবদান বড় কম নয়। বিক্রমপুর ও

সপ্তগ্রামে দুইটি প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা নগরীর ভিত্তিস্থাপন বল্লালসেন-হলায়ুধের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল।

দুর্গোৎসববিবেক, ব্রহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে হলায়ুধ যশস্বী হয়েছেন। ব্রাহ্মণসর্বস্ব বা কর্মোপদেশিনীর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৈদিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে পড়ায় পুস্তকখানি রচিত হচ্ছে। পারস্করসূত্র থেকে এবং সর্বপ্রকার স্মৃতি আলোড়ন ও ব্যাসবচন ও মুনিদের সংহিতাসমূহ আলোচনা করে তিনি এই যে সম্যক কর্মোপদেশিনী রচনা করলেন তাতে সন্ধ্যা, স্নান প্রভৃতি লেখ্য, সকল প্রকার শ্রাদ্ধ, অন্য সকল প্রকার বাচ্য এবং যজুর্ব্বেদসম্মত আহ্নিকের বিধি উল্লিখিত হোল—

দৃষ্টা পারস্করং সূত্রং স্মৃতিমালোক্য সর্ব্বশঃ।
ব্যাসস্য বচনং দৃষ্টা মুনীনাং সংহিতাং তথা॥

যুক্ত্যা স্বয়মালোক্য বৃদ্ধানাং সর্ব্বসম্মতা।
হলায়ুধেন রচিতা সম্যক কর্ম্মোপদেশিনী॥

সন্ধ্যাস্নানাদিকং লেখ্যং শ্রাদ্ধাং সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং।
অন্যচ্চ সকলং বাচ্যং যজুষামাহ্নিকং ময়া॥

কর্মোপদেশিনী রচিত হবার পর থেকে উচ্চবর্ণীয় বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সামাজিক জীবন এর দ্বারা পরিচালিত হয়। রঘুনন্দনের স্মৃতি পরে সে স্থান গ্রহণ করলেও হলায়ুধের প্রভাব আজও লোপ পায় নি। শৈবতান্ত্রিকতার সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা করায় হলায়ুধের মৎস্যসূক্তে প্রজ্ঞাপারমিতার স্তবও স্থান পেয়েছে। অবশ্য স্মৃতি, শ্রুতি এবং পুরাণোক্ত আচার ও বারব্রতাদির নিয়মে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। পানাভ্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—নারিকেল, খর্জুর, পনস, ইক্ষু ও মধুজাত পানীয়, টঙ্ক, তাল, মাক্ষি ও দ্রাক্ষা এই দশটি এবং গৌড়ীকে একাদশ বলে জানবে। দ্বাদশ পানরস

পৈষ্ঠি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, মধুজাত এবং গৌড়ীকে মধ্যম এবং অবশিষ্টকে উত্তম বলে জ্ঞান করে দ্বিজগণ কখনও মদ্যপান করবে না—

নারিকেলঞ্চ খর্জ্জুরং পনসঞ্চ তথৈব চ।
ঐক্ষবং মধুকং টঙ্কং তালঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্॥

দ্রাক্ষান্তু দশমং জ্ঞেয়ং গৌড়ীং বৈকাদশং স্মৃতং।
পৈষ্টিন্তু দ্বাদশং প্রোক্তং সর্ব্বেসা মাধবং স্মৃতং॥

মধ্যমং মধুজং গৌড়ীং শেষঞ্চোত্তমামিষ্যতে।
এতদ্দাদশকং মদ্যং ন পাতব্যংদ্বৈজেঃ ক্কচিৎ॥

অনিরুদ্ধ ভট্ট

বল্লালসেনের শিক্ষাগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগের সময়ে চম্পাহাটি গ্রামখানি তাঁকে দেওয়া হয়। তবে তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিহারপট্টক নামক গ্রামে বাস করতেন। তাঁর দুখানি পুস্তক হারলতা ও পিতৃদায়িত এখনও রয়েছে। হারলতায় অশৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার কোন মৌলিকত্ব দাবী করেন নি; শ্রীগণেশকে স্মরণ করে পাঠকগণকে জানিয়েছেন যে ব্যাস, মনু প্রভৃতি মুনিদের নির্দেশগুলি সবার সম্মুখে তুলে ধরা তাঁর উদ্দেশ্য।

তাঁর সম্বন্ধে বল্লালসেন লিখেছেন, বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের গুরু অনিরুদ্ধ তেমনি তাঁর গুরু ছিলেন। তিনি বেদার্থ ও স্মৃতির কথায় আদিপুরুষ ও বরেন্দ্রভূমির প্রশংসনীয়।*

* দানসাগর ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শক্তিপূজার প্রবর্তন

তান্ত্রিকতা ও শক্তিবাদ

যে কলচুরি শক্তিকে আশ্রয় করে কর্ণাটকীগণ গৌড়ে এসেছিল তারা ছিল শিব ও শক্তির উপাসক। কলচুরিরাজ কর্ণদেবের অনুশাসনে সুবর্ণ বৃষধ্বজ ও কমলে কামিনী মূর্ত্তি খোদিত থাকত। তাঁর কন্যা যৌবনশ্রী বৌদ্ধ ভূপতি তৃতীয় বিগ্রহপালের মহিষী হয়েও পূর্বের ধর্মমত ত্যাগ করেন নি। তার প্রয়োজনও হয় নি। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই ধর্মমতের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত। নালন্দা-বিক্রমশীলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু বৈদিকপন্থী তরুণ তখন বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে পৌরাণিক ভাবধারা সংমিশ্রিত করে যে শৈবতন্ত্রের সৃষ্টি করছিল তার সুরু হয় পালযুগের শেষ দিকে এবং সেনবংশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত চলতে থাকে। সেই যুগসন্ধিক্ষণে যে কয়খানি তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয় তার মধ্যে শৈবতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। কমলাকরের পুত্র শঙ্কর রচিত তারাতন্ত্রে বৌদ্ধদের মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে বেদে তন্ত্রের স্থান নেই; বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাশক্তির আবাহন করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ সেরূপ চেষ্টা করায় দেবী স্বশরীরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে মহাচীনে যেতে আদেশ দেন। হিমালয় পার হয়ে সেখানে গিয়ে বশিষ্ঠ দেখেন, বুদ্ধ তন্ত্র সাধনায় রত রয়েছেন। বুদ্ধই আদি তান্ত্রিক।[১]

কেমন করে বুদ্ধ অমিত শক্তির অধিকারী হোলেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে শিব ভৈরবীকে বলছেন, মহাশক্তির আরাধনা সকল

শক্তির উৎস। তাঁর সাধনা ব্যতীত কোন উচ্চ মার্গে পৌঁছান সম্ভব নয় ; বুদ্ধও তাঁকে বাদ দিয়ে সীমাহীন শক্তি লাভ করতে পারতেন না। এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্রের জঠর থেকে শৈবতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেই সঙ্গে এক প্রাণবন্ত সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে। সে সাহিত্য যেমন বিশাল তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভাষাও অধিকাংশ স্থানে যথেষ্ট মার্জিত ও মধুর। প্রায় সকল তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও তাঁদের চিন্তা-ধারা আজও আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। গৌড়-বঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আসলে তারা সবাই শাক্ত। তান্ত্রিকতার ভিত্তিতে রচিত এই শক্তিবাদের প্রথম উদ্ভব হয় সেন যুগে।

সৃষ্টি রহস্য

মহাশক্তি কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধদের শূন্যবাদের অনুকরণ করে বলা হয়েছে, সত্যলোকে নিরাকার মহাজ্যোতি স্বরূপিণী মহাশক্তি মায়ার আবরণে আত্মাকে আচ্ছাদিত করে অবস্থান করছিলেন। এক সময়ে তিনি উন্মুখী হয়ে মায়াবল্কল পরিত্যাগ করে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করেন। সেই সময়ে শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথম সৃষ্টির কল্পনা করা হয়। সেই দ্বিধাবিভক্ত মহাশক্তি থেকে প্রথমে ব্রহ্মা এবং পরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণু জন্ম লাভ করে সৃষ্টিস্থিতি চালিয়ে যেতে থাকেন। উভয়ের প্রকৃতি সাবিত্রী ও শ্রীবিদ্যাও অনুরূপভাবে ভূমিষ্ঠা হন। তৃতীয় পুত্র সদাশিবকে সৃষ্টি করে মহাকালী বলেন,

—হে পুত্র ! তুমি বিবাহ কর।

—কিন্তু মাতঃ, আমি ব্যতীত পুরুষ এবং তুমি ব্যতীত নারী কোথায় ?

—আমাকে বিবাহ কর।

—হে জগজ্জননী ! তোমার ওই দেহ থাকতে আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি না। আমার প্রতি যদি তোমার করুণা থাকে তা

হোলে তুমি দেহান্তরিতা হও।

মহাকালী তখন ভুবনসুন্দরী রূপ ধারণ করে শিবের সম্মুখে আবির্ভূতা হন; তাঁকে আশ্রয় করে সেই মহাযোগী অখিল জগৎ সংহার করতে থাকেন। তিনিই মহাদেবী দুর্গা। প্রথম সৃষ্টিকালে তাঁর উদ্ভব এবং সৃষ্টি সংহারের সময় বিলয় ঘটবে।

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
মায়াবাচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥

হস্তপদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিধারিণী।
মায়াবল্কলসংত্যাজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টি কল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি॥

... ...

তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ।
তং দৃষ্টা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু॥

ত্বাং বিনা পুরুষো কো বা মাং বিনা কাপি মোহিনী।
অতস্ত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিবে॥

শিব উবাচ—যদুক্তং ময়ি হে মাতস্তাং বিনা নাস্তি মোহিনী।
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্॥

কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্॥

তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরিষ্টবিভাগশ্চ শক্তিচাষ্টবিধা ভবেৎ॥

তন্ত্রবর্ণিত এই সৃষ্টিরহস্য বৌদ্ধদের শূন্যবাদের কার্বন কপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এত দিন ব্রাহ্মণগণ শূন্যবাদকে উপহাস করত, কিন্তু

শৈবতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারই ভিত্তিতে রচিত হয় তাদেব নূতন সৃষ্টিরহস্য। এই তন্ত্রে বুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়ে বেদকে অস্বীকার করা হয়েছে। কলিতে বেদমন্ত্র বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্জীব!

দুর্গার আবির্ভাব

শিব পূর্বে ছিলেন, দুর্গাও ছিলেন। তাঁদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। শিব সর্বত্র পূজা পেতেন, কিন্তু দুর্গা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা থাকেন। সেনযুগের পূর্বে সারা ভারতে মাত্র একটি দুর্গা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি কর্ণাটকের যে অংশ থেকে সেন-রাজগণ গৌড়ে এসেছিলেন সেখানকার ধারওয়ার জেলায় আইহোলের দুর্গামন্দির। সে মন্দির আজও আছে; দেবী প্রতিমাও আছে।[২] চণ্ডী কর্ণাটকের ঘরে ঘরে দেখা যেত; আজও দেখা যায়। দশেরার সময়ে সেখানকার সর্বত্র উৎসবের বন্যা বইত; আজও বয়। আজও কানাড়ী অক্ষরে মুদ্রিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ কর্ণাটকীরা প্রতিনিয়ত পাঠ করে।

আইহোলের এই দুর্গামন্দির কোনও চালুক্য সম্রাট ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে বল্লালবংশ কর্ণাটকের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করে চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর যে প্রস্তরনির্মিত অষ্টভূজা মহিষ-মর্দিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এখনও নিয়মিতভাবে তাঁর পূজা হয়। তিনি মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শারদীয়া শুক্লপক্ষে এই চামুণ্ডা মন্দিরে যখন দেবীর অর্চনা চলে মহীশূররাজ তখন সপরিবারে সেখানে গিয়ে নবমীর দিন পর্য্যন্ত তাঁর সম্মুখে অঞ্জলি দেন। এই নবরাত্রের পর দশেরা! অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহণে, কামানের গর্জনে, জনগণের কলরোলে তখন সমস্ত মহীশূর কেঁপে ওঠে।

এই কর্ণাটকী শক্তিসাধনা সেনরাজগণের সঙ্গে গৌড়ে আসে এবং এখানকার তন্ত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নূতন শক্তিপূজা পদ্ধতিতে পরিণত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভিত্তিতে অজ্ঞাতনামা কোনও গৌড়তান্ত্রিক

সে সময়ে যে কালিকা পুরাণ রচনা করেন দুর্গোৎসবের ব্লু-প্রিণ্ট তার পাতার মধ্যে মুদ্রিত রয়েছে। এই পুস্তকের বর্ণনানুসারে ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হয়ে উঠলে সকল দেবতা নিজ নিজ দেহ থেকে যে তেজ উৎপন্ন করেন তা একত্রীভূত হয়ে এক নারীমূর্তির সৃষ্টি হয়। তিনিই দুর্গা। মহিষমর্দিনীরূপে তিনি পূর্বে কর্ণাটকে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, গৌড়ভূমিতে সেই রূপে দেখা দেন সেন যুগের প্রারম্ভে।

দেবীর প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে তন্ত্র ও পুরাণের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁকে যে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্চনা করতে হবে এরূপ নির্দেশ কালিকা পুরাণে দেওয়া আছে। পূজার উপকরণগুলি গৌড়ের নিজস্ব। নৈবেদ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ফলসহ পৃথুক ও পিণ্ডখর্জুর পর্য্যন্ত বাদ যায় নি। বলি হিসাবে নিজ রুধির, নররুধির ও বিভিন্ন পশুর মাংস, কচ্ছপ এবং রোহিত মৎস্যের বিধান আছে।৩ মহানির্বাণতন্ত্রের মতে শোল, শাল এবং বোয়াল মাছও দেবীকে দেওয়া যেতে পারে! বৌদ্ধতন্ত্রের জঠর থেকে শৈবতন্ত্র তখন সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছিল বলে দেবীর নৈবেদ্যে সুরা দেওয়াও শাস্ত্রসম্মত! কর্ণাটকে এরূপ কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল না। সেখানকার দেবী প্রস্তরময়ী; কিন্তু এখানকার মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির পরিকল্পনা যেভাবে রচনা করা হয়েছে তাতে তাঁর মুখ নির্মিত হয় বৌদ্ধদেবী আর্য্যতারার ছাঁচে, দেহ রঞ্জিত হয় পর্ণশবরীর গায়ের রঙে। ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন এই প্রতিমাকে বিল্বশাখা, অষ্টমীর দিন বিশেষ উপচার এবং ভক্তের নিজস্ব বলিদান এবং নবমীর দিন প্রচুর বলিদান দিয়ে পূজা করা বিধি। দশমীতে শবরোৎসবপূর্বক বিসর্জন। শবরোৎসব মূলে বৌদ্ধদের উৎসব।

দুর্গাপূজা রাজসূয় যজ্ঞ। কালিকা পুরাণের নির্দেশ অনুসারে রাজা-রাজড়ারা শরৎকালে তান্ত্রিকাচারে এই উৎসব পালন করবে। সেনবংশ যখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সময়ে জীকন ও বালক নামে দুইজন তান্ত্রিক রাজাদেশে শারদীয়া পূজার প্রথম আয়োজন করেন। সমসাময়িক



আইহোলের দুর্গা প্রতিমা

এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা মূর্তি থেকে প্রেরণা লাভ করে সেনরাজগণ
গৌড়ে দুর্গা পূজার প্রবর্তন করেন

সাহিত্যে তাঁদের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোন বিবরণ নেই। এই সময়ে রচিত জীমূতবাহনের দুর্গোৎসব-নির্ণয় এবং শূলপাণির দুর্গোৎসব-বিবেক, বাসন্তী-বিবেক, দুর্গোৎসব-প্রয়োগ নামক পুস্তিকাগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে।[৪] দুর্গোৎসব-নির্ণয়ের রচয়িতা জীমূতবাহন যে বিজয়-সেনের প্রাড়্বিবাক ছিলেন সে কথা পূর্বে বলেছি। শূলপাণি ছিলেন বোধ হয় রাজপুরোহিত।

রাজার দেখাদেখি সামন্ত, ভূস্বামী ও বণিকশ্রেণী নিজ নিজ গৃহে দুর্গোৎসব সুরু করেন। যে সব পটুয়া পূর্বে বৌদ্ধমূর্তি তৈরী করত তারা দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ করতে থাকে। শারদীয়া পূজা সেন রাজ্যের সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

মিথিলা ও নেপালে দুর্গাপূজা

গৌড়-বঙ্গ ব্যতীত মিথিলা ও নেপালে মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির পূজাবিধি প্রচলিত আছে। উভয় ভূভাগে প্রতিমার গঠনপদ্ধতি ও পূজার রীতি গৌড়ের অনুরূপ। এই সাদৃশ্যের পিছনেও রয়েছে একটি কর্ণাটকী রাজ-বংশের গোপন হস্ত। হেমন্তসেন যখন রাঢ়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছিলেন সেই সময়ে তাঁরই ন্যায় কলচুরিরাজের অপর একজন কর্ণাটকী সৈন্যাধ্যক্ষ নান্যদেব মিথিলা জয় করে এক স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে পূজার ঢেউ নেপালে গিয়ে লাগে। উভয় ভূভাগে তখন গৌড়ের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর শৈবতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; সেই কারণে দুর্গাপূজা জনপ্রিয় হতে খুব বেশী সময় লাগে নি।

মিথিলায় বাচস্পতি মিশ্র ও সর্বোরু মিশ্র এ বিষয়ে জনসাধারণকে পথের নির্দেশ দেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতের দুর্গোৎসব-প্রকরণম্ ও দ্বিতীয়ের ক্রিয়াচিন্তামনি দুর্গাপূজা সম্বন্ধে দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কয়েক শতাব্দী পরে মহাকবি বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করে পূজা-

বিধির মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য্য আনেন এবং নেপালে জগৎপ্রকাশ মল্ল, রণজিত মল্ল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ মহাশক্তি সম্বন্ধে বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন।

তারার নূতন রূপ—কালী

দুর্গাপূজা দিয়ে শরৎকালে এই যে শক্তি আরাধনা সুরু হয় বসন্ত কাল পর্য্যন্ত তা চলতে থাকে। মহিষাসুর বধের কিছু কাল পরে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করতে উদ্যত হোলে সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ড তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। দেবীর মুখ তখন ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে; তাই তিনি কালী। মুক্তকেশী, মুণ্ডমালিনী, শ্মশানমাঝে শিবাকুল পরিবেষ্টিতা এই দেবী খড়্গাঘাতে চণ্ড-মুণ্ডের শিরচ্ছেদ করে ভগবতী চণ্ডিকাকে উপহার দেন এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। পরে রক্তবীজ বধের সময়ে দেবী যখন দেখেন সেই দৈত্যের দেহনিঃসৃত রক্তধারা ভূতলে পড়বামাত্র অসংখ্য রক্তবীজের সৃষ্টি হচ্ছে তখন জিহ্বা প্রসারিত করে তিনি তার উপর সমস্ত রুধির ধারণ করেন। সেই মূর্তিতে তাঁকে পূজা করা বিধি।

চণ্ডীতে কালিকার উৎপত্তি বিবরণ থাকলেও পূজার নির্দেশ নেই। কালিকা পুরাণেও নেই। এই রূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয় ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে—কেরলে। সেখানে তিনি কালী, কাশ্মীরে ত্রিপুরা ও গৌড়ে তারা। কিন্তু চতুঃশঙ্কর যোগে তিনি অবচ্ছিন্না হন বলে বিভিন্ন রূপে পূজা পান—

> কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা।
> গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব কালোত্তরা ভবেৎ॥
>
> অবচ্ছিন্না যদা সা বৈ চতুঃশঙ্করঃ যোগতঃ।
> কেরলশ্চৈব কাশ্মীরগৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ॥

দশম শতাব্দীতে তন্ত্রের বিবর্তনের সময়ে বৌদ্ধ দেবী তারাকে এই-ভাবে ব্রাহ্মণদের উপাস্যা দেবী কালী ও দুর্গার মাঝে বিলীন করা হয়। মহা-

নির্বাণতন্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে শিব ভৈরবকে বলছেন, তিনি মহাকালকে গ্রাস করে কালিকা নামে পরিচিতা হয়েছেন। তিনি সাকার হয়েও নিরাকারা, কিন্তু মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তিনি সবার আদি, তাঁর আদি কেউ নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিধনকর্তা; সর্ব ভূত তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং সবাই তাঁতে বিলীন হয়।৫ এরূপ অন্তহীন শক্তির জন্য আদ্যাশক্তিজ্ঞানে তাঁর নিত্যপূজার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। বার্ষিকী পূজাও হয়। জনজীবনে তিনি যতখানি প্রেরণা জুগিয়েছেন অন্য কোন দেবী তা পারেন নি।

এই মূর্তিপূজা সত্য !

কালী দুর্গার রূপান্তর হোলেও আদ্যাশক্তি যে পঞ্চরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদের অন্যতমা নন। তাঁদের মধ্যে রাধা কৃষ্ণের প্রাণাধিকা, তাঁর সঙ্গে পূজা পান। লক্ষ্মী সমুদ্রমন্থনের সময় উদ্ভূত হয়ে নারায়ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তা হয়ে রয়েছেন। বিজয়া দশমীর পাঁচ দিন পরে কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তিকে স্বতন্ত্রভাবে অর্ঘ্য দিয়ে শারদীয়া উৎসব সম্পন্ন করা হয়। কার্তিকী অমাবস্যায় তাঁর উদ্দেশ্যে সর্বত্র দীপমালা জ্বলে ওঠে। বিদ্যাদেবী সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা। লক্ষ্মীর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে তাঁরও মৃন্ময়ী মূর্তি পূজার প্রথা আছে। তন্ত্র প্রভাবিত অঞ্চলের বাইরে সেদিন বসন্ত পঞ্চমী।

এইভাবে শরতের স্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সুরু হয়ে চৈত্রমাসে ধরাবক্ষ উত্তপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন মূর্তিতে মহাশক্তির পূজা চলে। বাসন্তী পূজার পর অর্দ্ধ বৎসরব্যাপী বিরতি। এই মূর্তিপূজার মধ্যে যেরূপ প্রাণশক্তি আছে ঈশ্বরোপাসনার অন্য কোন পদ্ধতিতে তা নেই। পূজার মন্ত্রে, পুষ্পচন্দনের গন্ধে, ঢাকের বাদ্যে ও ভক্তদের উল্লাসে পূজা-মণ্ডপে যে স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় নীরস কোন প্রার্থনাকক্ষে তা হয় না। প্রত্যেক পূজার্থী অনুভব করে, তার আরাধনায় সাড়া দিয়ে

মহাশক্তি সবার অলক্ষ্যে পূজামণ্ডপের মধ্যে এসে অবস্থান করছেন। এই আরাধনা সত্য! এই পূজামণ্ডপ সত্য! এই উৎসব সত্য! বিগ্রহহীন প্রার্থনাগৃহ নিরস শিলাস্তূপের ন্যায় শুষ্ক। সেই সৌধের মধ্যে দেবতা বিরাজ করেন না। সেখানে বসে প্রার্থনা করলে তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া মেলে না। যে নিরাকার ব্রহ্মকে জানি না জীবন ভোর তাঁকে অর্চনা করলেও তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারব না। চক্ষু বুজে তোতাপাখীর মত তাঁর নাম যতই আওড়াই না কেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করব না। তাই বলছিলাম, শক্তিপূজায় প্রাণ আছে; তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেবীকে পূজা করলে তাঁর অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। মৃন্ময়ী মূর্তি সজীব হয়ে ভক্তের দিকে করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বুদ্ধকে আমরা বিদায় দিয়েছি, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে বৈদিক আচার মিশ্রিত হয়ে গৌড়ে এই যে শক্তিসাধনা পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে তার কোন তুলনা নেই। এই পূজায় তন্ত্রের মাধুর্য্য আছে, কিন্তু আবিলতা নেই। গৌড়ের সমাজ জীবনের উপর এর প্রভাব অসীম। আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য, শিল্পকলা; আমাদের বেশভূষা, আচারব্যবহার, আহার্য্যদ্রব্য, জীবনযাত্রা এমন কি চিন্তাধারা পর্য্যন্ত এই তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তান্ত্রিকতার প্রথম প্রচলনের পর থেকে প্রায় সহস্র বৎসর সময় অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু ভক্তদের মনে কোন ক্লান্তি আসে নি। বরং দেবী এখন ধনীর প্রাসাদ ছেড়ে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। গৌড় সীমান্তের ওপারে সারা ভারত এখন তাঁর লীলাক্ষেত্র। সাগর পার থেকেও মাঝে মাঝে তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়!

১ তারাতন্ত্রম্, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সঙ্কলিত, ষষ্ঠ পঠল

2 Zimmer H. *Art of Indian Asia, Vol. I, p. 249. 270. 272.*

৩ কালিকা পুরাণ, অধ্যায় ৬০, ৬১, ৭০

৪ দুর্গোৎসব বিবেক-বাসন্তী বিবেকচ, পৃঃ ২, ৯, ১৬

৫ মহানির্বাণতন্ত্রম্, চতুর্থোল্লাস ৩০-৬৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বল্লালসেন

ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্মের অপূর্ব সমাবেশ

রাজকুমারী বিলখ্ একে শূর বংশের দুহিতা তায় পরিণত বয়সের পত্নী। সেই কারণে অধিবিন্না বিলোলাকে কাশীপুরীতে রেখে বিজয়সেন এই মহিষীসহ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। সমরাভিযান হোক বা প্রমোদ-ভ্রমণ হোক তিনি যখন যেখানে যেতেন বিলখ্ হোতেন তাঁর সঙ্গের সাথী। অনুরূপ এক অভিযানের সময়ে ব্রহ্মপুত্রতীরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বল্লালসেনের জন্ম হয়।১ সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার প্রশ্ন এক দুরূহ সমস্যা হয়ে বিজয়সেনের সম্মুখে দেখা দেয়। সেই শিশু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হোলেও মায়ের একমাত্র সন্তান। রাঢ় তার মাতামহ রাজ্য; সেই হেতু অপার-মন্দার সিংহাসনে তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের কোন দাবী থাকতে পারে না। আবার রাঢ়ের সম্পদ দিয়ে যে সব ভূভাগ জয় করা হয়েছে সেগুলিতেই বা তাদের অধিকার কতটুকু? প্রাড্‌বিবাক জীমূতবাহন তখনও জীবিত। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে বিজয়সেন প্রকাশ্য রাজসভায় নবজাত শিশুকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন।

শিশু বল্লালের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এক সুপরিচিত নাম গৌড় ইতিহাসে স্থান পায়। সেনরাজগণ কর্ণাটকের যে অংশ থেকে গৌড়ে এসেছিলেন সেখানে তখন হয়শালা-বল্লাল বংশের অভ্যুদয় হয়েছে, কলচুরি ও চালুক্যদের তারকা নীচের দিকে নেমে গেছে। তাদের সবার সঙ্গেই সেন বংশের সৌহার্দ্য ছিল। চালুক্য-রাজবংশের

দুহিতা রামদেবীর সঙ্গে বল্লালসেনের বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁর পট্টমহিষী ছিলেন পিতৃ-সামন্ত বটেশ্বর মিত্রের কন্যা লক্ষ্মণা। সুন্দরী লক্ষ্মণা বল্লাল জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন।

বৈদিক বিবরণ যদি সত্য হয় তা হোলে ত্রিবিক্রম মহারাজ বিজয়-সেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলকে বঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বল্লালসেন যখন সিংহাসনারোহণ করেন শ্যামল তখন পরলোকে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বল্লালের প্রতি আনুগত্য দেখাতে ইতস্ততঃ করায় রাজধানী থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তাঁদের দমন করা হয় এবং তাঁরা রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলে বল্লালসেন তাঁর পিতৃব্য সুখসেনকে বঙ্গের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করেন। পরে যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদটি দেওয়া হয়।

বল্লাল ছিলেন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি অধিকার করবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে দিগ্বিজয়ে বার হোতেন। উৎকল ও কামরূপ থেকে রিক্ত হস্তে ফিরলেও মিথিলার কতকাংশ যে তিনি অধিকার করেছিলেন এরূপ অনুমান করবার কারণ আছে। অবশ্য, সেখানকার লক্ষ্মণাব্দ তাঁর পুত্রের জন্মকে স্মরণীয় করছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের হিসাব নির্ভুল নাও হতে পারে। বল্লালের অভিযাত্রী বাহিনী একবার মণিপুরেও গিয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি।[২]

এক সময়ে বল্লালসেনের কাছে সংবাদ আসে যে ওদন্তপুরীতে পাল রাজের প্রাসাদে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মন্ত্রীর প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর মদনপালের মহিষী আহার্য্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে স্বামীকে হত্যা করেছেন এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য সেনাপতি সুরসেন উভয়কে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মেরেছেন। বল্লালসেনের সম্মুখে মহা সুযোগ। এক ঝটিকাবাহিনী পাঠিয়ে অরক্ষিত মগধের পূর্বাংশ অধিকার করে তিনি লক্ষ্মণার পিতা বটেশ্বর মিত্রকে সেখানকার ক্ষত্রপ

নিযুক্ত করেন। এই জয়ের পর মহামর্য্যাদার প্রতীক নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। গৌড় নগরীতে নির্মিত হয় তাঁর নূতন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী।

পাল বংশের তখন যা শোচনীয় অবস্থা তাতে মগধের অবশিষ্টাংশ জয় করা সেন বাহিনীর পক্ষে শক্ত হোত না, কিন্তু কনৌজের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হোত। সেই কারণে পূর্ব-মগধ জয়ের পর বৃহত্তর সংঘর্ষ পরিহারের জন্য বল্লালসেন নিজেকে সংযত করে প্রজাদের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নয়নের জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন।

বল্লালসেন গৌড় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম নরপতি। এই রাজ্যে বহু রাজা এসেছেন ও গেছেন, কিন্তু একাধারে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্মের এরূপ অপূর্ব সমাবেশ আর কারও মধ্যে দেখা যায় নি। তাঁর প্রবর্তিত শক্তিসাধনা গৌড়-বঙ্গের সমাজ জীবনকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। যে সমাজ সংস্কারের ধারা তিনি প্রবর্তিত করেছিলেন আজও তা স্তিমিত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাদ এই যে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার পর তিনি এক অচ্ছুৎ কন্যার পাণি গ্রহণ করায় চারিদিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তখন বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এ কথা সত্য কিনা তা বলা যায় না, তবে অদ্ভুতসাগরের বিবরণ অনুসারে গঙ্গাতীর হয় তাঁর বার্দ্ধক্যের বাসস্থান। সেই সময়ে একদিন গৌড়বাসী সবিস্ময়ে শুনল তাদের মহান নৃপতি সস্ত্রীক নির্জ্জরপুরে গমন করেছেন![৩]

দানসাগর

শৈশবে গোপালভট্ট নামক এক দাক্ষিণাত্য বৈদিকের কাছে বল্লালের শিক্ষাজীবন সুরু হয়েছিল। বালকের তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ও উগ্র অনুসন্ধিৎসা গুরুকে বিস্মিত করে। অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন

হন। পরবর্তী জীবনে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য যে গুরুকে অতিক্রম করেছিল দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দানসাগর* একাধারে আত্মচরিত ও দর্শন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে বল্লালসেন লিখেছেন, পৃথিবীভূষণ সেন বংশে হেমন্তসেন এবং সেই গতিশীল কল্পতরু থেকে বিজয়সেন উৎপন্ন হয়ে সকল উন্নত রাজকুলকে বশীভূত করেন। তারপর সকলের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবার জন্য শ্রীবল্লাল নৃপতির জন্ম হয়। পূর্বজন্মের বিবিধ পুণ্য প্রভাবে গর্ভাবস্থাতেই তাঁর রাজ্যলাভ ঘটে। দারিদ্র-সন্তাপ-পীড়িত জনগণের পক্ষে তিনি অসময়ে উৎপন্ন জলধরস্বরূপ। তিনি মনে করেন, যেহেতু জীবন অনিত্য এবং ধন অতি চঞ্চল সেই হেতু মৃত্যু যেন কেশে ধরেছে এরূপ জ্ঞান করে সকলের দানধর্ম পালন করা উচিত—

অনিত্যং জীবনং যস্মাদ্ বসু চাতীব চঞ্চলম্।
কেশেষ্বিব গৃহীতঃ সন্ মৃত্যুনা দানমাচরেৎ॥ দা. সা. ৪৬৯

সৎপাত্রে যা দান করো এবং প্রতিদিন যা ভোগ করো তাই তোমার ধন বলে আমি মনে করি। অবশিষ্ট ধন অপর কারও ভোগের জন্য রক্ষা করছো। দেখছো না ধনী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর কি হয়? অন্য লোক এসে তার স্ত্রী ও ধন নিয়ে খেলা করে। তাই বলি, বহু কষ্টে উপার্জিত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে ধন দানই তার একমাত্র সদগতি। দেহ যখন এত ভঙ্গুর তখন ধন নিয়ে করবে কি? যার জন্য ধন সেই শরীরই তো অনিত্য—

কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনো ভঙ্গুরাশ্রয়াঃ।
যদর্থে ধনমিচ্ছন্তি তচ্ছরীরমশাশতম্॥ ৬৯

আমি রাজা বল্লাল সংসারের অনিত্যতা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করেছি। যদি ধর্ম বা ভোগের জন্য না হয় সে ধন আমি কামনা করি না। আমার কোন্ উপকার সাধন করবে সেই ধন? যে জিনিষ

* প্রথম প্রকাশ—১০৯১ শকাব্দ

তালপত্রে লিখিত গৌড়েশ্বরের দুইখানি অনুশাসন

দ্বাদশ শতাব্দী

একদিন না একদিন পরিত্যাগ করে যেতে হবে লোকে কেন যে তা দান করে না তা আমি বুঝি না।

দক্ষিণে মহাসমুদ্র থেকে উত্তরে হিমালয় পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই যে ভারতবর্ষ এখানকার লোককে দানের কথা আর কি শেখাব? জীব সহস্র সহস্র জন্মের পুণ্যফলে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। আবার যে সকল মনুষ্য স্বর্গ ও মোক্ষ পথ লাভের সোপানস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করে তারা দেবতা অপেক্ষা ধন্য। দানের কথা তাদের বলতে হবে? অবস্থায় না কুলালে অল্পবিত্তগণ নিজেদের গ্রাস থেকে অর্দ্ধ গ্রাসও ভিক্ষুককে দান করবে। ইচ্ছানুরূপ ধন কোন কালে কার হয়?—

গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যং কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি॥ ৭৩

একত্র বাস করলে শীল জানা যায়; সদ্ব্যবহারে শৌচ জানা যায়; আলাপ দ্বারা বুদ্ধিমত্তা জানা যায়। এই তিন প্রকারে দানের পাত্র পরীক্ষা করতে হয়। যোগ্য পাত্র না পেলে তো দান করা চলে না। বৈড়ালব্রতী ও বকধর্মী ব্যক্তিকে এবং বেদার্থানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে জল পর্য্যন্ত দিবে না। কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, চর্মনির্মিত মৃগ ও বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ কেবল নামই ধারণ করে।

দান ১৩৭৫ প্রকার। সেগুলি সম্যকভাবে জেনে নিজ বিত্তের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে তবে দান করতে হয়। দানের ছয়টি অঙ্গ— দাতা, গ্রহীতা, শ্রদ্ধা, ধর্মার্জ্জিত দেয় দ্রব্য, দেশ ও কাল। এইগুলি ঠিকভাবে বিবেচনা করে তবে দান করবে—

দাতা প্রতিগৃহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্মযুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্ বিদুঃ॥ ২১০

দান ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। দাতা অভুক্ত থেকে শুদ্ধ চিত্তে দান করবে। দানের স্থান পবিত্র ও পূতিগন্ধবর্জ্জিত

হওয়া চাই। সন্ধ্যাগমে দান নিষিদ্ধ। সকল ধন দানের উপযুক্ত নয়। যে ধন অন্যকে কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করা হয়েছে অল্প হোক বা অধিক হোক তা দানের যোগ্য—

অপরাবাধম ক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
অল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যাভি দীয়তে॥

অদ্ভুতসাগর

অদ্ভুতসাগর বিজ্ঞান পুস্তক। এই মহাগ্রন্থে বিজ্ঞানবিদ বল্লাল-সেন ভূলোক, দ্যুলোক ও গোলোক সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্তঃ দিব্যাশ্রয়, অন্তরীক্ষাশ্রয় ও ভৌমাশ্রয়। প্রথমভাগে সূর্য্য, চন্দ্র, রাহোড়া, মঙ্গল, বৃহস্পতি, ভার্গব, শনৈশ্চর্য্য, কেতু প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহের অদ্ভুত আবর্ত এবং বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে কৌতুহলোদ্দীপক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে প্রতিসূর্য্য, পরিবেশ, ইন্দ্রধনু, রশ্মিদস্ত, গন্ধর্বনগর, সন্ধ্যা, ছায়া, উল্কা, বিদ্যুৎ, বায়ু, মেঘ প্রভৃতির অদ্ভুত আবর্ত সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেভাবে আলোচনা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তৃতীয়-ভাগে ভূমিকম্প, জলাশয়, অগ্নি, দীপ, বৃক্ষ, গৃহ প্রভৃতির আবর্তের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বল্লালসেনের আরও দুইখানি পুস্তক আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর লোপ পেয়েছে। হস্তলিখিত অদ্ভুতসাগরও সেই দশা পেতে বসেছিল। মিথিলাবাসী জ্যোতিষাচার্য্য মুরলীধর ঝা সেখানির সঙ্কলন এবং বারাণসীর প্রভাকরা কোম্পানী মুদ্রিত গ্রন্থকারে প্রকাশ করে সকল ভারতীয়ের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে জ্যোতিষাচার্য্য ঝার মত এই যে অদ্ভুতসাগরের বিষয়বস্তু বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান।[৫]

তান্ত্রিকতায় দীক্ষা

প্রথম জীবনে বল্লালসেন ছিলেন পিতৃ পিতামহের ন্যায় বৈদিক আচারে বিশ্বাসী। কিন্তু যৌবনে অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সংস্পর্শে এসে তিনি তান্ত্রিকতার অনুরাগী হয়ে পড়েন; এই মতে সিদ্ধিলাভের আশায় নীচ জাতীয়া এক কুমারী এনে শক্তি সাধনায় প্রবৃত্তও হয়েছিলেন। পিতা বিজয়সেন তখন জীবিত; কিন্তু তাঁর নিষেধাজ্ঞা ফলপ্রসূ হয় নি। বল্লালের এই তন্ত্রপ্রীতির ফলে গৌড় সমাজে কতকগুলি নূতন শৈব-বৌদ্ধ মিশ্রাচার প্রচলিত হয়। সেগুলির মধ্যে নীলার ব্রত উল্লেখযোগ্য। বৃহন্নীলাতন্ত্রমে দেবী কি ভাবে নীলা সরস্বতীতে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন তার কাহিনী এবং তাঁর পূজাবিধি বর্ণিত আছে।[৫]

সিংহাসনে আরোহণের পর বল্লালসেন একদিন রাজসভায় বসে আছেন এমন সময় শৈবতান্ত্রিক সিংহগিরি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে যান এবং শাক্ত মতে দীক্ষা নেন। সেই থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই মতে আস্থাশীল ছিলেন। দেশ বিদেশে এই মত প্রচারের জন্য তিনি অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাসনযন্ত্রের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধর্মবিভাগ খোলেন। ধর্মাধ্যক্ষ, শাস্তিবারিক, সাস্ত্যাগারিক, পুরোহিত প্রভৃতি কর্মচারীগণ উচ্চ শ্রেণীর রাজপুরুষ বলে গণ্য হন। নিজ রাজ্যে তো বটেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও শাক্তমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মগধে ৫০, তিব্বতে ৩০, মৌরঙ্গে ৬০, উৎকলে ২২ ও রভঙ্গে ২২ জন শৈবতান্ত্রিককে স্থাপন করেন।

বল্লাল প্রেরিত তন্ত্রাচার্য্যদের চেষ্টায় ভারতের বহু অঞ্চল শক্তি-সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়। অগম প্রকাশের বিবরণ অনুসারে গুজরাটের পাবাগড়, পাটন প্রভৃতি স্থানে শাসকশ্রেণী গৌড়ীয় তান্ত্রিকদের কাছে শাক্তমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] সেখানে ও রাজস্থানে কয়েকটি কালী মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ

রাঢ় থেকে বহু তান্ত্রিককে নিয়ে গিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অহমরাজ নদীয়ার এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের হস্তে কামাখ্যা মন্দিরের ভার অর্পণ করেন। তাঁর বংশধর পর্বতীয়া গোঁসাইগণ আজও ওই মন্দির পরিচালনা করেন।[৭] শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশ গৌড়ের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

কলিকাতা নগরীর ভিত্তি স্থাপন

শক্তিসাধনা জনপ্রিয় করবার জন্য বল্লালসেন একদিকে যেমন দেশবিদেশে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন অন্যদিকে তেমনি নিজ রাজ্যে তন্ত্রাচার্য্যগণকে নানাভাবে উৎসাহ দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিকগণ নিজেদের বিভেদ মিটিয়ে ফেলে, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের পাষণ্ডী বলে ধিক্কার দিতে থাকে। গৌড় ইতিহাসের এই বিস্মৃত অধ্যায় উদঘাটিত করে জনৈক প্রবন্ধকার হিন্দী সাপ্তাহিক ধর্মযুগে লেখেন, তান্ত্রিকরা যাতে অন্যের সংস্পর্শ পরিহার করে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মকর্ম চালিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বল্লালসেন উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দাক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ তাদের জন্য সংরক্ষিত করেন। কালীঘাট ছিল এই কালিকাক্ষেত্রের নাভিকেন্দ্র।[৮] অন্যান্য যে সব শক্তিমন্দির কালিকাক্ষেত্রের স্থানে স্থানে নির্মিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে দক্ষিণেশ্বর, জটা ও বড়িয়ার মন্দিরগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

কালীঘাট বল্লালযুগের চেয়েও প্রাচীন। অষ্টম শতাব্দীতে আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্ষিতীশের বসতি-স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল মানভূম জেলার পঞ্চকোটে এবং তীর্থস্থান ও চতুষ্পাঠী কালীঘাটে। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পদ্মনাভ ঘোষাল লিখেছেন, কলিকাতা এক সুপরিচিত প্রাচীন নগরী। পুরাকালে হিন্দুরা এই স্থানকে কালীক্ষেত্র বলত। 'তখন এই নগরী উত্তরে দক্ষিণেশ্বর ও

দক্ষিণে বেহুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কলিকাতা নামটি সেই কালী-ক্ষেত্রের অপভ্রংশ। সেরার বংশধরদের হস্তে বল্লালসেন স্থানটি অর্পণ করেন।

সেরা কে এবং কতটুকু স্থান তাঁর বংশধরগণ গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ দিগ্বিজয়প্রকাশে বলা হয়েছে, পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্বে কালিন্দী নদী বেষ্টিত কিলকিলাভূমি নামক জনপদের মধ্যে কালীঘাট অবস্থিত। তন্ত্রগ্রন্থানুসারে এখানকার ভাগীরথীতীরে সতীর বাম হস্তের আঙ্গুল পড়ায় স্থানটি অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। কালীদেবীর প্রসাদে এখানকার অধিবাসীরা চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে সুখে শান্তিতে বাস করবে—

> পশ্চিমে সরস্বতীসীমা পূর্বে কালিন্দীকা মাতা।
> একবিংশতি যোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিধঃ॥
> কিলকিলাভূমিমধ্যে শ্রী দেশো নৃপশেখর।
> দানগলীসরিত্তীরে পশ্চিমপার্শ্বে বিরাজতে॥
> পীঠমালাতন্ত্রগ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।
> বামভুজাঙ্গুলিপাতো জাতো ভাগীরথীতটে॥
> কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলকিলাদেশবাসিনঃ।
> দ্রবিণৈঃ পূরিতা নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ॥ ১০

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালীঘাটকে এক বিশিষ্ট স্থান বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, গৌড়দেশের মঙ্গলকোটের অন্তর্গত উজানী নগর নিবাসী ধনপতি সওদাগর তাঁর পুত্র শ্রীমন্তসহ সাগরপারে বাণিজ্য করতে চলেছেন। তাঁদের ডিঙ্গা ভাগীরথীর উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের পানে। বেলা অবসানে পিতাপুত্র কলকাতা পাশে রেখে বেতাইচণ্ডীর পূজা দিলেন। সেখান থেকে একটি পথ হিজলী পর্য্যন্ত চলে গেছে।

কিন্তু তাঁদের রাতের বিশ্রামস্থল কালীঘাট—

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা এড়াইয়া যায়॥
বেতড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পুজা কৈল সাবধানে।
সমস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গি অবসান বেলা॥ ১১

চণ্ডীমঙ্গল প্রকাশের কিছুকাল পরে তুর্কী শাসনের অবসান ও মোগল যুগের সূত্রপাত হয়। সে সময়েও কলকাতার যে চিত্র দেখি তাতে একে কোন নগণ্য জনপদ বলা চলে না। আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল সুবে বাংলাকে যে কয়টি রাজস্ব বিভাগে ভাগ করেন সেগুলির মধ্যে সরকার সাতগাঁও ছিল অন্যতম। এই সরকারের অধীনস্থ কলিকাতা, মেকুমা ও বরবাকপুর* এই তিনটি মহল থেকে মোগল রাজকোষে বৎসরে ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ২১৫ দাম রাজস্ব সংগৃহীত হোত।[১২]

সময় চলেছে, কলকাতার কাহিনীও চলেছে। টোডরমলের রাজস্ব তালিকা যখন প্রস্তুত হয় তার কিছু দিন পরে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা এসে সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। ইংরাজদের আসতে আরও এক শতাব্দী সময় লেগেছিল। তখনও কলকাতা এক প্রাণচঞ্চল নগরী। সেই কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে তাদের প্রধান কুঠী নির্মাণ করে। যাঁরা বলেন যে কলকাতার জঙ্গলে সে সময়ে শিয়ালের ডাক ও বাঘের গর্জন শোনা যেত তাঁরা একেবারেই বাতুল।

* বরবাকপুর—এখনকার ব্যারাকপুর

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংরাজ এসেছিল বাণিজ্য করতে, শৃগাল বা ব্যাঘ্র শিকার করতে নয়! বৃহৎ নগরী ব্যতীত অন্য কোথাও যে জাহাজী বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন সম্ভব নয় একথা তো শিশুও জানে। কলকাতা সেরূপ এক নগরী ছিল বলেই জব চার্ণকের নেতৃত্বে ইংরাজের জাহাজ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এখানে এসে নোঙ্গর ফেলে।

ইংরাজ আগমনের কিছু কাল পরে বিশ্বব্যাপী শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়। সে সময় সাংহাই, মার্শাই বা নিউ ইয়র্কের ন্যায় কলকাতাও নূতন রূপ ধারণ করতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের লোক সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার; এখন প্রায় ১ কোটী।[১৩] ওই মহানগরীর শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিল্পবিপ্লব—কলকাতারও তাই। বিগত শতাব্দীতে শিল্প যুগের বাণিজ্যিক প্রয়োজনের উপর ইংরাজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী যোগ হওয়ায় কলকাতার কলেবর হু হু করে বেড়ে যায়। এই নগরীর সম্প্রসারণে ইংরাজের অবদান যথেষ্ট, কিন্তু তারা এর প্রতিষ্ঠাতা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। নিঃশঙ্ক-শঙ্কর গৌড়েশ্বর বল্লালসেন যে দিন কালীঘাটকে কালিকাক্ষেত্রের মধ্যমণিরূপে নির্দ্ধারিত করেন কলকাতার ভিত্তি সেই দিন স্থাপিত হয়।

১ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৯০
২ আনন্দভট্ট, বল্লালচরিতম্, উত্তর খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়
৩ অদ্ভুতসাগর
৪ ঐ মুরলীধর ঝার ভূমিকা
৫ বৃহন্নীলাতন্ত্রম্, ১১শ পটল
৬ আগমপ্রকাশ ১।১২
7 Eliot C. *Hinduism and Budhism, II, p. 288*
৮ ধর্মযুগ, এপ্রিল ১৮, ১৯৫৮
9 Ghosal P. *Indian Antiquiry, 1873, p. 370*
১০ কবিরাম, দিগ্বিজয়প্রকাশ ৬৬৫-৭০
১১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন চণ্ডী
12 Abul Fazle Allami *Ain-i-Akbari, Trans. R. Kennaway, p. 472*
13 *Encyclopaedia Britanica*

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

বল্লালসেনের সমাজ সংস্কার

কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন

নবম শতাব্দীতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঞীমালা সৃষ্টি করে ক্ষিতীশূর লোকান্তরিত হোলে অবনীশূর ও ধরণীশূর পর পর রাঢ়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁদের সময়ে দ্বিজগণের সামাজিক সত্ত্বার কোন পরিবর্তন হয় নি। ধরাশূর (৯০৫-৩৫) রাজদণ্ড হাতে নিয়ে দেখেন, কয়েকজন আদি গাঞী ব্রাহ্মণ তখনও জীবিত রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পরস্পারের মধ্যে গুণগত বৈষম্য যথেষ্ট। মুড়ি মিছরীর এক দর হতে পারে না, সবার মর্য্যাদা সমান হওয়া উচিত নয়। সেই কারণে তাঁর নির্দেশে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে গুণানুসারে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হোল।

ধরাশূরের কুলবিধি বংশানুক্রমিক হবার কথা নয়। কিন্তু কিছু কাল পরে দেখা গেল, কুলীন সন্তানরা পিতার মর্য্যাদা ভাঙিয়ে খাচ্ছে; গুণবাণ শ্রোত্রীয় সন্তানগণ তাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি অবনীশূরকে ভাবিয়ে তুলল, ব্রাহ্মণদের নিয়ে তিনি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তারা সপ্তশতীদের ছায়া মাড়ায় না, আবার নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানও করে না। এরূপ ব্যবস্থার অবসান ঘটান ভাল। কিন্তু তা সম্ভব নয়; কুলীনদের কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধ আসবে। শেষ পর্য্যন্ত অবনীশূর ব্রাহ্মণগণকে কুলাচল ও সচ্ছোত্রীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করলেন। পুরাতন সুরা নূতন

বোতলে ভয়ে পরিবেশিত হোল!

এর পর থেকে শূরবংশের অধোগতি সুরু হয়; ব্রাহ্মণদের বহু শাসনগ্রাম তাঁদের অধিকারের বাইরে চলে যায়। সেই কারণে তারা যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। অধ্যয়ন-পধ্যাপনা, যজন-যাজন, রাজকার্য্য বা বিষয়কর্ম করে তারা সংসার চালাত, পূর্বপুরুষদের মত রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকত না। সেনশক্তির অভ্যুদয়ের পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। বিজয়সেন একে শক্তিমান, তায় বৈদিকাচারে বিশ্বাসী। বৌদ্ধমতের কালিমা গঙ্গাজলে ধৌত করবার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে অনন্তভট্ট প্রমুখ কয়েকজন বেদবিদ ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে আনেন এবং রাঢ়ীদের মধ্যে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁদের সহযোগিতা লন। বৈদিক মত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বল্লালসেনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্যরূপ। তন্ত্র নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজকে ঢেলে সাজাবার জন্য তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রমুখ বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন বৌদ্ধ শাসনে বাস করায় তারা তন্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল। মহামন্ত্রী হলায়ুধের সমর্থনও মেলে। অজ্ঞাতনামা দু'জন তান্ত্রিক কুলার্ণবতন্ত্র ও কুল-চূড়ামণিতন্ত্র রচনা করে বলেন, সমাজ জীবনের একেবারে গোড়ার কথা কুল। সবাই যদি নিজ কুলকে কলুষমুক্ত রাখে তা হোলে সমাজ হবে শক্তিশালী। যোগীর দ্বারা এ কাজ হবার নয়, কারণ তাদের কাছে ভোগ সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। আবার ভোগীরা যোগী হতে পারে না। কিন্তু কুলধর্মের মধ্যে ভোগ ও যোগের সমন্বয় রয়েছে—

যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্‌ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং প্রিয়ে॥*

কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কৌলজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেন। ষড়দর্শন এই কৌলশাস্ত্রের ছয়টি অঙ্গ। বৈদিকাচার,

* কুলার্ণবতন্ত্রম্ ২।২৩

বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, বামাচার, দক্ষিণাচার কোন আচারই কুলাচারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যিনি কুলাচার ঠিকমত পালন করবেন সকল পার্থিব শক্তি তাঁর চক্ষে হবে মহাশক্তির বহিঃপ্রকাশ—স্ত্রীময় চ জগৎ সর্বম্। তিনি হবেন কুলীন।*

কৌলীন্যের এই ব্যাখ্যা বল্লালসেনের মনে তরঙ্গ তুলল। তন্ত্রবিধি অনুসরণ করে তিনি গঙ্গাতীরবর্তী যোগিনীভট্ট গ্রামে পূর্ণ এক বৎসর ধরে কুলদেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। হে দেবী! তুমি আমাকে জ্ঞান দাও শক্তি দাও; আমার প্রজাদের উচ্চতম কৌলধর্ম পালন করবার প্রেরণা জোগাও। তাদের কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত না হয় তা হোলে, বলো দেবী! জপতপ যাগযজ্ঞে প্রয়োজন কি? কুলদেবী! আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। কেশব ও কৌশকী অর্চনায় যে পুণ্য লাভ হয় তা আমার নয়। আমি যশ চাই না; কুলপথাচার গ্রহণ করায় যদি আমার অখ্যাতিও রটে আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করব। চাই তোমার করুণা। তুমি আমাকে পথের সন্ধান বলে দাও—

মন্নিন্দা যদি বাস্তু তে কুলপথাচারদূরং মাস্তু বা
কীর্তিঃ কেশবকৌশিকার্চনচরী নৈব স্তু মস্তং নিধিঃ।†

বল্লালসেনের আরাধনায় দেবী প্রসন্না হোলেন, পথের সন্ধান মিলল। সমাজের যারা মহত্তম ব্যক্তি তাদের ভিতর থেকে নূতন কুলীন সৃষ্টি করতে হবে, কৌলীন্য কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ধরাশূর যে সব ব্রাহ্মণকে কুলমর্য্যাদা দিয়েছিলেন তাঁদের নির্গুণ পুত্রেরা কুলীন সেজে সমাজে আর মাথা উঁচু করে বেড়াবে না; তাদের যথাযোগ্য স্থানে নেমে যেতে হবে। কুলীন হওয়া কি মুখের কথা? এই গুণে গুণবান হবার চেয়ে মুক্ত তরবারির উপর দিয়ে হাঁটা সহজতর। ধরাশূরের কুলবিধি নিপাত যাক, নিম্নবর্ণিত নয় গুণে

* কুলচুড়ামণিতন্ত্রম্ ১।৪২

† ,, ৭।২৫







গৌড়েশ্বরের অনুশাসন চিত্র

দ্বাদশ শতাব্দী

গুণশালী প্রকৃত কৌলধর্মী সৃষ্টি হোক—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

এই নবগুণের সমাবেশ যাঁদের মধ্যে দেখা যাবে কেবলমাত্র তাঁরা হবেন কুলীন। যাঁদের মধ্যে একটি গুণের অভাব হবে তাঁরা হবেন সিদ্ধ শ্রোত্রীয়, দুটি গুণের অভাব হলে সাধ্য শ্রোত্রীয় এবং বাকী সবাই কষ্ট শ্রোত্রীয়। কুলীন শুধু রাজমর্য্যাদা নয়, তার সঙ্গে কুলস্থান এবং শাসনগ্রামও পাবেন। রাজসভার দ্বার তাঁর সম্মুখে সব সময়ে থাকবে অবারিত।

এই মহামর্য্যাদা লাভের জন্য প্রার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন আবেদন জানিয়েছিলেন কি না এবং কি ভাবে তাঁদের গুণের বিচার করা হয়েছিল তা জানবার উপায় নেই। সব প্রার্থীকে কোনও এক নির্দিষ্ট দিনে রাজদত্ত মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল কি না তাও কেউ বলতে পারে না। তবে যে সব ব্যক্তি কৌলীন্য লাভ করেছিলেন বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থে তাঁদের নাম এইভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে—

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়	জাহ্লন	বন্দ্য
,, ,,	মহেশ্বর	,,
,, ,,	দেবল	,,
,, ,,	বামন	,,
,, ,,	মহাদেব	,,
,, ,,	মকরন্দ	,,
,, ,,	ঈশান	,,
কাশ্যপ গোত্রীয়	বহুরূপ	চট্ট
,, ,,	শূচ	,,
,, ,,	অরবিন্দ	,,
,, ,,	হলায়ুধ	,,
,, ,,	বাঙাল	,,

বাৎস্য	গোত্রীয়	গোবর্দ্ধন	পুতিতুণ্ড
,,	,,	শিব	ঘোষাল
,,	,,	কানু	কাঞ্জিলাল
,,	,,	কুতুহল	,,
ভরদ্বাজ	গোত্রীয়	উৎসাহ	মুখটি
,,	,,	গরুড়	,,
সাবর্ণ	গোত্রীয়	শিশু	গাঙ্গুলী
,,	,,	রোষাকর	কুন্দলাল

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

শাণ্ডিল্য	গোত্রীয়	সাধু	বাগচী
,,	,,	রুদ্র	,,
কাশ্যপ	,,	লোকনাথ	লাহিড়ী
,,	,,	ক্রতু	ভাদুড়ী
,,	,,	মধু	মৈত্রেয়
বাৎস্য	,,	লক্ষ্মীধর	সান্যাল
,,	,,	জয়মান	মিশ্র
ভরদ্বাজ	,,	সায়নাচার্য্য	ভাদুড়ী

বৈদ্য

ধন্বন্তরী	গোত্রীয়	বিনায়ক	সেন
মৌদ্গল্য	,,	চামু	দাস
,,	,,	পদ্ম	দাস
কাশ্যপ	,,	কায়ু	গুপ্ত
,,	,,	ত্রিপুরা	গুপ্ত

কায়স্থ

সৌকালীন	গোত্রীয়	পুরুষোত্তম	ঘোষ
,,	,,	সুভাসিত	ঘোষ
গৌতম	,,	কৃষ্ণ	বসু
,,	,,	পরম	বসু
বিশ্বামিত্র	,,	শ্রীধর	মিত্র
,,	,,	অশ্বপতি	মিত্র

কুলাচার সকল আচারের উর্দ্ধে বলে এই আচার যিনি পালন করেন তিনি জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। সেই কারণে ধরাশূরের কুলবিধি যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বল্লালসেন সেক্ষেত্রে সকল বর্ণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক, চাষাধোপা, প্রভৃতি বর্ণের কয়েকজন গুণী ব্যক্তি তাঁর কাছে কৌলিন্য লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যেও কুলমর্য্যাদা প্রচলিত হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকদের মধ্যে হয় নি। বল্লাল রাজত্বের কিছু দিন পূর্বে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র সবেমাত্র বঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উত্তর বরেন্দ্রে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীন নেই ; ওই ভূভাগ তখন বোধ হয় কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বল্লালের বিধান অনুসারে প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর কৌলীন্য ব্যবস্থার সংস্কার হবার কথা। সে সময়ে পুরাতন কুলীন বংশগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা ও নূতন প্রার্থীদের দাবী বিবেচনা করা হবে। কিন্তু প্রথম সংস্কারের সময় যখন এল স্রষ্টা তখন ইহজগতে নেই এবং সেনশক্তি রাঢ় ত্যাগ করে শেষ আশ্রয়স্থল বিক্রমপুরে চলে গেছে। সময় অত্যন্ত দুর্য্যোগপূর্ণ, নূতন রাজধানীতে যে কোন সময়ে তুর্কী আক্রমণ আসতে পারে। এখন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। সেই কারণে রাজাদেশে পূর্বতন কুলীনদের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রইল এবং কয়েকজন নূতন কুলীন সৃষ্টি করা হোল। কায়স্থদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় দশরথ গুহ কুলমর্য্যাদা পেলেন। বঙ্গে তাঁরা হোলেন কুলীন, রাঢ়ের 'আড়াই ঘর গুহ' হয়ে রইল মৌলিক !

স্মরণাতীত কাল থেকে সকল দেশে রাজশক্তি উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে পাণ্ডিত্য, রণদক্ষতা, শিল্পসঙ্গতি বা অনুরূপ গুণের জন্য কৌলীন্য প্রদান করেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এরূপ কুলীন বংশ যথেষ্ট রয়েছে। এখনও লেলিন পদক বা পদ্মবিভূষণে ভূষিত কুলীন

কম সৃষ্টি হয় না। এই সম্ভ্রান্তশ্রেণী যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে মর্য্যাদা লাভ করে, তেমনি শাসকগণকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য দেয়। কিন্তু বল্লাল নির্দ্ধারিত কৌলিন্যের মানদণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবধা কুল লক্ষণের মধ্যে শৌর্য্য ও সঙ্গতির উল্লেখ নেই। কোন যোদ্ধা বা ভূস্বামী তাঁর কাছ থেকে কৌলীন্য পান নি। এরূপ আদর্শ মানদণ্ড দিয়ে কোন দেশে কখনও কুলীন সৃষ্টি করা হয় নি। অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই বল্লাল প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা শত ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিহত করে আজও টি:কে রয়েছে!

'বল্লাল - চরিত'

সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃতের সঙ্গে হলাহল বড় কম ওঠে নি। যে মানদণ্ডে কৌলিন্য লাভের যোগ্যতা বিচার করা হয়েছিল বিশাল সেন-রাজ্যে অর্দ্ধশত ব্যক্তির মধ্যেও তা ছিল না। সেই মুষ্টিমেয় শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ রাজমর্য্যাদা লাভ করে গৌড়ের কৃষ্টিজীবন ফলেফুলে ভরিয়ে তোলেন, কিন্তু ব্যর্থ প্রার্থীদের মনে যথেষ্ট উষ্মার সঞ্চার হয়। মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত এবং মন্ত্রী ব্যাস সিংহ পর্য্যন্ত কৌলিন্য লাভে বঞ্চিত হয়ে সুযোগ পেলেই বল্লালসেনের বিরোধিতা করতে থাকেন। সেনশক্তির পতনের পর তাঁদের বংশধরদের সকল আশা চিরতরে লুপ্ত হওয়ায় তাঁরা বল্লাল চরিত্র এমনভাবে মসীলিপ্ত করেন যে আসল বল্লালকে তার ভিতর থেকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়।

সেনরাজগণ ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা কায়স্থ নয়। তাঁদের নিজেদের বিবরণ ও উমাপতিধরের রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ রাখে নি। এত স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কুৎসাকারীগণ তাঁদের ভিন্ন বর্ণীয় বলে বর্ণনা করেন। শুধু কি তাই! বল্লালসেনকে পিতার ক্ষেত্রজ পুত্র বলতেও তাঁদের সঙ্কোচ হয় নি। এই বিরোধীদের প্রথম পুস্তক 'বল্লাল-চরিত' রচিত হয় ১৫১০ খৃষ্টাব্দে। তুর্কী তরবারির

নিরাপদ আশ্রয়ে বসে গ্রন্থকার আনন্দভট্ট অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণদের দাসানুদাস বলে পুস্তকের মুখবন্ধ রচনা করেন। কোন রাজার পক্ষে যে ঋণের জন্য প্রজার কাছে রাজ্যাংশ বন্ধক রাখা বা প্রজার পক্ষে রাজাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা একেবারেই অসম্ভব একথা জানা না থাকায় আনন্দভট্ট লিখেছেন, বল্লালসেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের নেতা বল্লভানন্দের কাছে বহু টাকা ঋণ চাওয়ায় তিনি গৌড়েশ্বরকে আর্থিক অপব্যয়ের জন্য যথেষ্ট ভৎ‍্সনা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হারিকেল বিষয় জামিন পেলে ঋণ দানে সম্মত হন। বণিকের এই স্পর্দ্ধায় রুষ্ট হয়ে বল্লালসেন সমগ্র সুবর্ণবণিক সমাজকে অবনমিত করেন। সেই দুর্দিনে তাদের একমাত্র সহায় ছিলেন আনন্দভট্টের পূর্বপুরুষ ; তাই তিনি কৌলীন্য লাভে বঞ্চিত হন!

সুবর্ণবণিকদের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান বণিক সম্প্রদায় কেন যে সমাজে অধঃপতিত হয়েছিল কেউ তা জানে না। তবে বল্লালসেন তাদের শত্রু ছিলেন, এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা তো তিনিই প্রবর্তন করেন। প্রজাদের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় বহু সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্য্যাদা তিনি উন্নততর করেছিলেন। কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার প্রভৃতি শিল্পীজীবিগণ তাঁর কাছ থেকে উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদা পায়। মাহিষ্য নেতা মহেশ পূর্বে ছিলেন মহত্তর, বল্লাল তাঁকে করেন মহামাণ্ডলিক। আজও যে গৌড়-বঙ্গের কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের অচ্ছ্যুৎদের ন্যায় হীন নয় তার পিছনে রয়েছে তন্ত্রবিশ্বাসী বল্লালসেনের গোপন হস্তের স্পর্শ!

সূত্র উল্লেখ না করে আনন্দভট্ট লিখেছেন, প্রৌঢ় বয়সে মৃগয়ায় গিয়ে বল্লালসেন অস্পৃশ্যা কোরিকন্যা পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। কিন্তু প্রজারা সেই তিক্ত বটিকা গলধঃকরণ করতে অস্বীকার করে। বল্লালসেন নিশ্চয়ই গৌড়েশ্বর, কিন্তু তাঁর হীন জাতীয়া পত্নীকে তারা গৌড়েশ্বরী বলে মেনে নিতে পারে না। চারিদিক

থেকে প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠল। শিক্ষাগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট হোলেন কুপিত, রাজপুরোহিত ভীম ওঝা হোলেন রুষ্ট, যুবরাজ লক্ষ্মণসেন রাজধানী ছেড়ে বঙ্গে চলে গেলেন, বধূরাণী বসুদেবী কক্ষদ্বার রুদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণাবতীর সমস্ত আলোক নিমেষের মধ্যে নিভে গেল !

আনন্দভট্ট বলেন, প্রজাপুঞ্জের সেই মৌন প্রতিরোধ অসহ্য হওয়ায় বল্লালসেন পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। বায়াদুম্ব নামে এক যবনের সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। যবন পরাজিত হয়, কিন্তু আরব্যোপন্যাসের ন্যায় এক অদ্ভুত ঘটনায় বল্লাল পরলোক গমন করেন। সেন যুগে লেখা কোন গ্রন্থে বল্লাল-চরিতের এসব কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবরণ লিখে গেছেন। সেই কারণে পুস্তকটির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নয় ; তবু এর উল্লেখ না করলে আমাদের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের এক শত গাঞী

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বরেন্দ্র জয়ের পর রাঢ়াধীশ ভূশূর সদ্য-বিজিত রাজ্যের সমাজ জীবনের উন্নয়নের জন্য পঞ্চগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রাঢ় থেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ সেই পঞ্চবিপ্রের পরিচয়—

শাণ্ডিল্য	গোত্রীয়	ক্ষিতীশের	পুত্র	দামোদর
বাৎস	,,	সুধানিধির	,,	ধরাধর
কাশ্যপ	,,	বীতরাগের	,,	সুষেণ
ভরদ্বাজ	,,	তিথিমেধার	,,	গৌতম
সাবর্ণ	,,	সৌভরির	,,	পরাশর

ব্রাহ্মণগণ এইভাবে বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু কাল পরে নবোত্থিত পালশক্তির প্রবল চাপে শূর সৈন্যগণ রাঢ়ে চলে আসতে বাধ্য হয়।

ব্রাহ্মণগণ কিন্তু তাঁদের নূতন বাসভূমি পরিত্যাগ করেন নি। ধর্মপাল তাঁদের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা দেখাতে থাকেন এবং দামোদরের এক পুত্রকে ধামসার নামে একখানি গ্রাম দান করেন। দানগ্রহীতা এই ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র সমাজে আদি গাঞী ওঝা নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে বাস করায় এই ব্রাহ্মণদের বংশধরগণ রাঢ়ীদের ন্যায় জনসাধারণের সামাজিক জীবনে আধিপত্য বিস্তার করবার সুযোগ কোন দিন পায় নি। কিন্তু তাদের মধ্যে যাঁরা গুণবাণ তাঁদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পালরাজগণ কখনও কার্পণ্য দেখান নি। একাধিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিভিন্ন পালরাজের অধীনে মন্ত্রীর কাজ করেন। রাজ সরকারের উর্দ্ধতম কার্য্যে নিযুক্ত হন অনেকে। কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের দশম বংশধর স্বর্ণরেখ দ্বিতীয় ধর্মপালের কাছ থেকে করঞ্জ গ্রামখানি লাভ করেন। এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও রাঢ়াধীশ ক্ষীতিশূরের ন্যায় পৃষ্ঠপোষক না থাকায় বারেন্দ্রদের মধ্যে গাঞীমালা সৃষ্টি হয় নি। রাঢ়ীদের গাঞী আছে, অথচ তাদের নেই এরূপ ব্যবস্থা বল্লালসেনের মনঃপূত হয় নি। যে গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টকে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় সম্মান করতেন তিনি যখন এই সম্প্রদায়ভুক্ত তখন এরা বিশেষ মর্য্যাদা নিশ্চয় আশা করতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করে বল্লালসেন একশ' জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নিম্নবর্ণিত গ্রামগুলি দান করেন—

শাণ্ডিল্য গোত্রে দামোদরের বংশে—

১। রুদ্র বাগচি
২। সাধু বাগচি
৩। লাহিড়ী
৪। চম্পাটী
৫। নন্দনাবাসী
৬। কামেন্দ্র
৭। সিহরি
৮। তাড়োয়াল
৯। বিশি
১০। মৎস্যাশী
১১। চম্প
১২। সুবর্ণতোটক

১৩। পুরাণ
১৪। বেলুড়ি

বাৎস্য গোত্রে ধরাধরের বংশে—

১। সপ্তারিনী
২। ভীমকালী
৩। ভট্টশালী
৪। কামকালী
৫। কুড়বুড়ি (বলিহার)
৬। ভাড়িয়াল
৭। লক্ষ
৮। যামরুক্ষী
৯। শিমলি (রাজশাহী জেলার শিমলা)
১০। ধোসালি
১১। তানুরী (তানোর, রাজশাহী)
১২। বৎসগ্রামী
১৩। দেউলি (বগুড়া জেলায় করতোয়া তীরে)
১৪। নিদ্রালি
১৫। কুকুটী
১৬। বোড়গ্রাম
১৭। শ্রুতবটী
১৮। অক্ষগ্রামী

কাশ্যপ গোত্রে সুষেণের বংশে—

১। মৈত্র
২। ভাদুড়ী (রাজশাহী জেলা)
৩। করঞ্জ (পাবনার নিকট)
৪। বালযষ্টি
৫। মোষা
৬। বলিহারী
৭। সোয়ালী
৮। কিরল
৯। বীজকুঞ্জ
১০। সরগ্রামী
১১। সহগ্রামী
১২। কটি
১৩। মধ্যগ্রামী
১৪। মঠগ্রামী
১৫। গঙ্গাগ্রামী
১৬। বেলগ্রামী
১৭। চমগ্রামী
১৮। অশ্রুকোটি
১৯। সাহরী
২০। কালী
২১। ভীমকালী
২২। পৌণ্ড্রকালী
২৩। কালিন্দী
২৪। চতুরাবন্দী

সাবর্ণ গোত্রে পরাশরের বংশে—

১। সিংদিয়াড়
২। পাকড়ি
৩। দধি
৪। শৃঙ্গী
৫। মেদড়ী
৬। উন্দুড়ি
৭। খুন্দুড়ি
৮। তাড়োয়াড়
৯। সেতু
১০। নৈগ্রামী
১১। নেধুড়ি
১২। কপালী
১৩। টুটুরী
১৪। পঞ্চবটী
১৫। খণ্ডবটী
১৬। নিকড়ি
১৭। সমুদ্র
১৮। কেতুগ্রামী
১৯। যশোগ্রামী
২০। শীতলী

ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতমের বংশে—

১। ভাদড়
২। লাড়লি
৩। ঝম্পটী (ঝাঁমাল)
৪। আতর্থী
৫। রাই
৬। রত্নাবলী
৭। উচ্ছরখী
৮। গোচ্ছাসি
৯। বাল
১০। শাকটি
১১। শিম্বি
১২। বহাল
১৩। সরিয়াল
১৪। ক্ষেত্রগ্রামী
১৫। ঘৰিয়াল
১৬। পুতি
১৭। কাছটি
১৮। নন্দিগ্রামী
১৯। গোগ্রামী
২০। নিখটি
২১। পিপ্পলি
২২। শৃঙ্গ
২৩। খেজেরি
২৪। গোষ্ঠালখী

গ্রামগুলি সব বরেন্দ্রে অবস্থিত। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঞী নিয়ে যেরূপ গবেষণা হয়েছে এগুলি নিয়ে তা হয় নি। সেই কারণে গ্রামগুলির সঠিক অবস্থান আজও অনির্দ্ধারিত রয়েছে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

লক্ষ্মণসেন ও তাঁর পঞ্চরত্ন সভা

শত্রু পরিবৃত সেন রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় বল্লালসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা মহিষী লক্ষণার গর্ভজাত পুত্র লক্ষ্মণসেন। অস্ত্রবিদ্যায় তিনি এমনই দক্ষ ছিলেন যে কিশোর বয়সে তাঁর নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে গঙ্গার ওপারের লক্ষ্যবস্তু অব্যর্থভাবে বিদ্ধ হোত। সেন বাহিনী যখন যেখানে যুদ্ধ করতে যেত তিনি থাকতেন তাদের পুরোভাগে। মধুর ব্যক্তিত্ব, রণক্ষেত্রে বীরত্ব ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য পিতা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর নামানুসারে গৌড় রাজধানীর নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় লক্ষ্মণাবতী।

যে যুদ্ধের ফলে মগধের পূর্বার্দ্ধ সেনশক্তির হস্তগত হয় কুমার লক্ষ্মণসেন তাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সাফল্যের পর পাল রাজধানী ওদন্তপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া শক্ত হোত না। কিন্তু লক্ষ্মণসেনেরই ন্যায় আর একজন যুবরাজ, কনৌজের বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র, সসৈন্যে মগধের দিকে অগ্রসর হওয়ায় তারা নিরস্ত হয়। পূর্ব সীমান্তে কামরূপ ও দক্ষিণ সীমান্তে উড়িষ্যার গঙ্গা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও যুবরাজ লক্ষ্মণসেন যুদ্ধ করেছিলেন। চেদির কলচুরিগণও তাঁকে বিশ্রাম দেয় নি। তাদের উপর ভর করেই তো তাঁর প্রপিতামহ হেমন্তসেন গৌড়ে এসেছিলেন। একখানি শিলালিপিতে দেখা যায় জনৈক কলচুরি সামন্ত বল্লভরাজের হস্তে সেনবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই,

কিন্তু তার ফলে গৌড়ের কোন ভূভাগ যে সেন বংশের হস্তচ্যুত হয় নি একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এই সব সামরিক সাফল্যের জন্য সেন শক্তি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তাই বল্লালসেন যখন ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে নিজের শূন্য সিংহাসনে পুত্রকে অভিষিক্ত করে অবসর লন সকল সীমান্ত তখন আপদশূন্য। এরূপ নিরাপত্তা লক্ষ্মণসেনকে উদ্বেগহীন জীবন যাপনের সুযোগ দেয়। কয়েক বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনার পর পুত্রের উপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি ধর্মসাধনার জন্য নবদ্বীপে বাস করতে থাকেন। সেখানে গঠিত হয় তাঁর পঞ্চরত্ন সভা। এই সভার অন্যতম রত্ন ধোয়ীর পবনদূত থেকে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হোল*—

পবনদূত—কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী

১

অখিল জগতে সুন্দরতম চন্দন নামে গিরি—
যক্ষের পুরী কনক নগরী আছে সে পাহাড় ঘিরি।
চুমিছে গগন বিলাস-ভবন-হৈম-শিখরে তার,
দেখে মনে হয় অমরাবতীর শাখা সে চমৎকার।

২

সেথা কোন এক যক্ষের বালা কুবলয়বতী নামে
রূপের পাথারে অরূপ পদ্ম এ-মর মর্ত্তধামে।
একদা দেখিয়া ভুবনবিজয়ী লক্ষ্মণসেন ভূপে
কুসুম ধনুর বশীভূতা হ'ল সহসা সে কোন রূপে।

* অনুবাদ—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য, ভট্টগ্রাম, মেদিনীপুর

কিন্তু রাজা তখন স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। সেই কারণে বিরহবিধুরা গন্ধর্ববালা বার্তা পাঠাবার জন্য মলয় বায়ুর শরণাপন্ন হোলেন। তাকে সম্বোধন করে কুবলয়বতী বলছেন—

৪

ওগো দক্ষিণ বায়ু!
সারা জগতের প্রাণভূত তুমি নিঃশ্বাস সম আয়ু।
মন অতি বেগবান
তারপরই জানি তোমার আসন হে উদার মতিমান্।
তাই করি নিবেদন—
মহাজন পাশে ভিক্ষা বিফল হয় না তো কদাচন।

৫

বিরহ-বিধুর শ্রীরামেরে হেরি মারুতি যে মহাবীর
লঙ্ঘি' সাগর ঘুচাল প্রভুর দুই নয়নের নীর—
মোর তরে যাও হে অবাধগতি তুমি তো জনক তার,
গৌড় নগর মলয়-ভূধর কত দূর হবে আর!

৬

আজি বসন্তে কুসুম-সময়ে গৌড়ে দেখিবে তুমি—
উপবন-তরু শ্যামলিমা তার ছেয়েছে গগনভূমি,
আমার জীবন রাখিতে রাজারে কহিও আমার কথা
— তব সম জন লভয়ে জনম নাশিতে পরের ব্যথা!

৭

চন্দন তরু সৌরভ তুমি আহরণ করি' নাও,
চঞ্চল পদে মলয়-প্রদেশ কানন ছাড়িয়া যাও—
নতুবা তোমায় একটি চুমুকে নিঃশেষ করি লবে
হেথা ক্রীড়ারত মৎসরমতি যত ভুজঙ্গ সবে।

৮

ছাড়ি শ্রীখণ্ড পর্ব্বত ক্রমে ক্রোশ দুই গেলে পর
দেখিতে পাইবে পাণ্ড্য প্রদেশ অপরূপ মনোহর।
সেথা গেলে সমীরণ,
তাম্রপর্ণী নামে নদী তীরে দেখিবে গুবাক্-বন।
তারি মাঝে লুকোচুরি
খেলা করে যেন একটি নগরী—নাম সে উরগপুরী।

১১

রামেশ্বরের মহাপবিত্র মন্দির মাঝে চমৎকার—
চন্দ্রচূড়ের চূড়া-চাঁদখানি ক্রুদ্ধা মালিনী গৌরী তার
চারু-কিশলয়-করে ধরি টানে হেরিবে পবন বন্ধুবর।
আরো কিবা আছে জান কি হে তুমি? শুন বলি তবে
অতঃপর—
সেথা সুন্দরী পুরললনার কটিতে ত্রিবলি-গঠন দেখি,
মনে হবে তব তাদের গড়িতে বিধির হস্ত কেঁপেছে সে কি!

পবন আসছে। সুবলা নদীর উপর দিয়ে, চোল দেশ পিছনে ফেলে, কাবেরী নদী, মাল্যবান পর্বত, মণ্ডকর্ণি ঋষির পঞ্চাপ্সরা সরোবর, অন্ধ্র, গোদাবরী, কলিঙ্গ, যযাতি নগরী পার হয়ে সুহ্মদেশের ভিতর দিয়ে পবন গৌড় রাজ্যে প্রবেশ করছে। এখানকার শোভা বর্ণনায় কুবলয়বতী বলছেন—

২৬

গঙ্গার তীরে অতি মনোরম সৌধ শোভিত সুহ্মদেশ*
রসময় ভূমি যেও সেথা তুমি বিস্ময় তব না রবে শেষ।
সেথা সুকোমল শশীকলা সম কিশলয়-তালীপত্র দিয়া
কর্ণভূষণ রচিছে যতনে রাজার যতেক পরাণপ্রিয়া।

* সুহ্মদেশ—রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ

২৭

সে দেশে যাইলে বীর
সেন ভূপতির কীর্ত্তি হেরিবে বিষ্ণুর মন্দির।
সেথা বিরাজেন কমলাকান্ত
মুরারি-মূরতি অতি প্রশান্ত ;
প্রকৃতি-সুভগা দেবদাসীগণ লীলা-কমলিনী হাতে,
নিয়ত ঘেরিয়া লক্ষ্মীর মত সেবে যেন প্রাণনাথে।

৩০

মাঝখানে বহে তটিনী গঙ্গা—
এপারে ওপারে সে ব্যবধান,
দূর করি দিয়া নৃপ বল্লাল
সেতু রচি লভে কীর্ত্তি মান।
সেই সেতুপথে ওগো সমীরণ,
যদি যাও চলি একটু দূর—
দেখিবে অমরাবতীর সমান
রাজধানী নাম—বিজয়পুর। †
সেথা গঙ্গায় স্নান করি লোকে
দুই ভাবে দেব-নগরে যায়
ভাগীরথী-স্নান রাজ দরশন—
পুণ্য লভিয়া স্বরগ পায়।

কবির ছদ্মনাম ধোয়ী, আসল নাম অজ্ঞাত। পবনদূত ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থ যে তিনি রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগুলি লোপ পেয়েছে। আনন্দভট্টের বল্লালচরিতে শরণ দত্তের রচনা থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি থাকলেও মূল লেখা কিছু আবিষ্কৃত হয় নি।

† বিজয়পুর—নবদ্বীপের প্রাচীন নাম। গৌড় জয়ের পর বিজয়সেন এখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন।



বিষ্ণু ত্রিবিক্রম

সেন যুগ

প্রদ্যুম্নেশর মন্দিরের প্রস্তরলিপি উমাপতিধরের রচনা ; তাঁর আর কোন লেখা পাওয়া যায় নি। পঞ্চরত্ন সভায় চতুর্থ রত্ন আচার্য্য গোবর্দ্ধন ছিলেন শৈব। তাই তাঁর আর্য্যসপ্তশতী শিবের স্তব দিয়ে সুরু হয়েছে। পুস্তকটিতে আদিরসের প্রাধান্য থাকলেও আদ্যোপান্ত দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতিতে ভরপুর। মুখবন্ধে কবি লিখছেন*—

> বিবাহ সময়ে ভস্মভূষিত যে ঐশ বপু পুলকিত হয়ে উঠেছিল এবং যে বপুতে অনঙ্গদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই বপুর জয় হোক! ১
>
> আতঙ্কগ্রস্থ পিতামহ ব্রহ্মা যাকে বলেছিলেন 'হে প্রভু এই বিষ সম্বরণ করুন' সলজ্জ-কজ্জল-মলিনাধর সেই শম্ভুর জয় হোক! ২
>
> প্রিয়াপদান্তে নীলকণ্ঠের স্নানজলের আরতিস্বরূপ যে তৃতীয় নেত্র গলবদ্ধ করবালে শরণ্য হয়েছিল তার জয় হোক! ৩
>
> উমার নমস্কারে চন্দ্রশেখরের যে পক্ষল ললাট মদনের সকণ্টক ধনুর ন্যায় বক্রদৃষ্টি হেনেছিল তার জয় হোক! ৪
>
> জটাজুটশোভিত বিষকণ্ঠ মুণ্ডবলয় গঙ্গেশের বদনমণ্ডলের জয় হোক! ৫
>
> সর্প-বলয়-পীত হস্তে সন্ধ্যাঞ্জলির বারিধারা ধারণ করে গৌরীর মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় যে শিব বিজয়ার হাস্যের উদ্রেক করেছিলেন তাঁর জয় হোক। ৬
>
> সে সলিলাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁর কম্পিত স্বেদসিক্ত হস্ত থেকে অঞ্জলি ভূপতিত হয়েছিল শম্ভুর সেই সলিলাঞ্জলির জয় হোক! ৭
>
> গোধূলির চন্দ্রকলায় প্রণয়কুপিত প্রিয়াচরণের অলক্তরেখা যে শিবশিরে পতিত হয়ে নিকষ প্রস্তরের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল সেই শিবের জয় হোক! ৮

* অনুবাদ—গ্রন্থকার

গৌরীপদে নত চন্দ্রমৌলির যে চন্দ্রলেখা শোভা পাচ্ছে তার জয় হোক ! ৯

পদ্মনয়ন মহেশ্বরের যে দৃষ্টি উমার সুঠাম জঘন প্রদেশের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি তা হস্ত দ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন সেই দৃষ্টি তোমাদের সবাইকে সুখী করুক ! ১০

পঞ্চরত্ন সভার অয়স্কান্ত মণি জয়দেবের জন্ম হয় বীরভূম জেলায় অজয় তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে ব্রাহ্মণ ভোজদেবের গৃহে। মাতার নাম বামাদেবী। বাল্যকাল থেকে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়ে তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেন। কিন্তু বল্লালসেনের উদ্যোগে সেন রাজ্যে তখন তান্ত্রিকতার যে বন্যা বইছিল জয়দেবের বৈষ্ণবমত তার নীচে তলিয়ে যায় এবং সেই প্লাবনের উপর ভাসতে ভাসতে তিনি উপনীত হন নীলাচলে—পুরীতে। সেখানে দক্ষিণী তরুণী পদ্মাবতী তাঁর জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন।

পুরীতে কবি যে সব সঙ্গীত রচনা করেন সেগুলি বিদ্যুৎ বেগে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে জনমনের উপর অভূতপূর্ব ঝঙ্কার তোলে। এক মালিনীর কণ্ঠে সেই সঙ্গীত শুনে পুরীরাজ এমনই মুগ্ধ হয়ে যান যে মহিষীসহ জয়দেবের কুটীরে গিয়ে কবি দম্পতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। সেই থেকে রাজাদেশে সেই মালিনী ও তার বংশধরগণ প্রতি প্রভাতে জগন্নাথ বিগ্রহের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান করে। পুরীর এই রাজা ছিলেন গঙ্গা সম্রাটের সামন্ত। তাঁর মুখে জয়দেবের পরিচয় জানতে পেরে সম্রাট অনঙ্গভীমদেব তাঁর বিরাট উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুরীর মন্দিরকে অগ্রাধিকার দেন; স্থপতি পরমহংস বাজপেয়ী কর্তৃক ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মহামন্দিরের নির্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়।

বল্লালসেনের তিরোধানের পর জয়দেব যখন স্বগ্রাম কেন্দুবিল্বে ফিরে আসেন গৌড়ভূমিতে তখন তান্ত্রিকতায় অবসাদ এসেছে, বৈষ্ণবমত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব; গীতগোবিন্দের প্রভাব

তাঁর উপর খুব বেশী। সেই গ্রন্থের রচয়িতা যে তাঁরই রাজ্যের অধিবাসী একথা জানতে পেরে তাঁর গর্বের অন্ত নেই। পরম আদরে জয়দেবকে রাজধানীতে আহ্বান করে তিনি সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হোল*—

গীতগোবিন্দ—মহাকবি জয়দেব

প্রথম সর্গ

"মেঘের থর থর মেদুর অম্বর
তমাল-তরু-শ্যামা বনের মাঝে
নামিছে বিভাবরী হেরিয়া ভীরু হরি
ঘরেতে লহ রাধে! আজিকে সাঁঝে।"

—নন্দ নির্দ্দেশে দয়িতে লয়ে পাশে
শ্রীমতী রাধা চলে কুঞ্জবনে,
রাধা মাধব জয় জীবন মধুময়
যমুনা কুলে রহ গুঞ্জরণে ॥ ১

বাগ্‌দেবতা যার হৃদয়ে আছে আঁকা
চরণ পদ্মাব্রতী চারণ কবি
মুগ্ধ বাসুদেব লীলায় বিহ্বল
আঁকিছে জয়দেব তাঁহার ছবি ॥ ২

শ্রীহরি স্মরণে সরস মন যদি
জানিতে চাহ যদি লীলার গীতি
কোমল-কান্ত পদ কাব্য কোকনদ
শুনহ জয়দেব ভারতী নিতি ॥ ৩

উমাপতিধর অশেষ প্রতিভাধর
সাজায় কবিতামালা পল্লবি' বচনে।

* অনুবাদ—গ্রন্থকার

শরণ রচে পদ দুরূহ মনোরম
গোবর্দ্ধন সুনিপুণ আদিরস রচনে।
ধোয়ী সে শ্রুতিধর রচনা মনোহর
কবিক্ষ্মাপতি তিনি কবির মাঝ
সুমধুর ভাবময় অনুপম গীতচয়
রচিলেন সুরতানে জয়দেব আজ ॥ ৪

গীত

প্রলয়ের কালে সাগরের জলে
বেদ সব যবে মিলাল অতলে
বাঁচালে তাহার হয়ে মীন-তরী
হোক তব জয় জগদীশ হরি ॥ ৫

বিপুলা এ পৃথিবী শোভে তব পৃষ্ঠে
ধরিয়া ধরণী কিণ-চক্র গরিষ্ঠে
কূর্ম্ম রূপ ধরি বাঁচালে তাহারে
হোক তব জয় জগদীশ হরে ॥ ৬

দশনশিখরে তব ধরা হল লগ্না
কলঙ্করেখা যেন হিমাংশু মগ্না
তোমার বরাহরূপ আজ তাই স্মরি
হে কেশব তব জয় জগদীশ হরি ॥ ৭

বামন রূপেতে ছলি বলিরাজে তুমি
চাহিয়া লইয়াছিলে ত্রিপাদের ভূমি
পূত হোল ত্রিভুবন তব পদ-নীরে
হোক জয় হে কেশব জগদীশ হরে ॥ ৮

করের কমলবরে মেলি' নখশৃঙ্গ
হিরণ্যকশিপুর দলি' তনু ভৃঙ্গ
সেদিন ধরিয়াছিলে রূপ নরহরি
হে কেশব তব জয় জগদীশ হরি ॥ ৯

ক্ষত্রিয় রুধিরে তুমি ধুয়ে ফেলি ধরা
অপগত করিবারে পাপ তাপ ত্বরা
ভৃগুপতি রূপ ধরি এলে পৃথ্বী 'পরে
হে কেশব তব জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

দশাননে বধি' তুমি দশ শির তার
দশ দিক্‌পালে প্রভু দিলে উপহার
সেদিন শ্রীরামরূপে দেখিনু তোমায়
জয় তব হে কেশব জগদীশ জয় ॥ ১১

তব হল কর্ষণে বাজে যেন শঙ্খ
জলদাভ বসনেতে যমুনা আতঙ্ক
হলধর রূপ ধরি' হইলে উদয়
জয় তব হে কেশব জগদীশ জয় ॥ ১২

পশুর হনন দেখি দেবযজ্ঞ স্থানে
করুণার ধারা বহে তব দু নয়নে
নিন্দিলে তাহারে তুমি বুদ্ধ রূপ ধরি
জয় হোক হে কেশব জগদীশ হরি ॥ ১৩

ম্লেচ্ছ নিধন তরে লয়ে তরবারি
ধূমকেতু বেগে তুমি আসিলে মুরারি
কল্কিরূপে সেই দিন এলে ধরা 'পরে
হে কেশব তব জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪

যুগে যুগে কত রূপে এলে তুমি দেব
তাই তব দশ রূপ স্মরে জয়দেব
সুখদায়ী শুভদায়ী তব নাম স্মরি
জয় হোক হে কেশব জগদীশ হরি ॥ ১৫

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

পশ্চিম গগনের কালো মেঘ

ইসলামের মন্থর অগ্রগতি

পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি যে ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় থেকে ভারত জয়ের পরিকল্পনা আরবদের ছিল। দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ের পর ইরাকের উৎসাহী শাসনকর্তা হেজাজের তরুণ সেনাপতি মহম্মদ বিন্‌ কাশিম ৭১১ খৃষ্টাব্দে খলিফার সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বারোহী বাহিনীসহ সিন্ধুতে এসে উপনীত হন এবং তুমুল সংগ্রামের পর দেবল অধিকার করেন। বিজিত নগরীর সকল পুরুষ অধিবাসীকে ধর্মান্তরিত নতুবা হত্যা করবার পর বিন্‌ কাশিম হাজার হাজার তরুণীকে পাঠিয়ে দেন হেজাজের নিকট। ৭১২ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন এই মহাসমরের শেষ সংগ্রামে হিন্দু সৈন্যগণ অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে লড়েও শেষ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। বিজয়ী সেনাপতি প্রথানুযায়ী লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ সহ সিন্ধুরাজ দাহিরের দুই কন্যা সূর্য্যদেবী ও পরিমলদেবীকে খলিফার শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেই ধর্মনেতার গৃহাভ্যন্তরে দুই বিষধর সর্প প্রবেশ করেছিল! তরুণীদ্বয় সুকৌশলে খলিফাকে দিয়ে বিন্‌ কাশিমের হত্যা সাধন করেন। তার পূর্বে তাঁদের জননী মহারাণী রাণীবাঈয়ের নেতৃত্বে ষোল শ' সিন্ধুবালা জহরের আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিল![১]

খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভারত প্রবেশের চেষ্টাও সমান ব্যর্থতার ইতিহাস। খলিফার নির্দেশে সেনাপতি ওবাইদুল্লা ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে গান্ধার আক্রমণ করে সেখানকার শাহীরাজের কাছে পরাজিত ও বন্দী হন;

সাত লক্ষ দির্‌হাম মুক্তিমূল্য দিলে তবে তাঁকে দেশে ফেরবার অনুমতি দেওয়া হয়। দুই বৎসর পরে ইরাকের অধিপতি হেজাজের সেনাপতি আবদুল রহমান শাহীরাজ রণবলের হস্তে পরাজিত হয়ে বিজয়ী পক্ষে যোগ দেন এবং পরিশেষে আত্মহত্যা করেন। খলিফা হারুণ-অল-রসিদের (৭৮৬-৮০৯) সৈন্যবাহিনীও কাবুল জয়ে অসমর্থ হয়। গান্ধার ভারতের শেষ সীমান্ত প্রদেশ হয়ে থাকে এবং দূর দূরান্ত থেকে উৎপীড়িত বৌদ্ধগণ এসে উদয়নের রাজধানী গজনীতে আশ্রয় নেয়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে সেখানকার শাহীরাজের ব্রাহ্মণমন্ত্রী নিজ প্রভুকে কোণঠাসা করে এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করলে পশ্চিম থেকে মুসলমান এবং পূব থেকে সেই নূতন ব্রাহ্মণ বংশের চাপে শেষ শাহীরাজের পতন হয় এবং কাবুল ৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বিজেতারা আরব নয়—নবদীক্ষিত তুর্কী মুসলমান।

তারিখ-ই-নাসিরীর বিবরণানুসারে পারস্যের অগ্নি উপাসক শাসন-রাজ ইয়েজদর্দের বংশধরগণ ইসলামে দীক্ষা নেবার পর তুর্কী তরুণীদের বিবাহ করে শেষ পর্য্যন্ত তুর্কীতে পরিণত হন। এই বংশীয় সাবুক্তিগীনের* মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মামুদ যে ভাবে নিজ ভ্রাতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাতে তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি যখন দিগ্বিজয়ের নেশায় মেতে ওঠেন কোন প্রতিবেশী রাজ্য তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। মুসলমান দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ তিলক ছিলেন তাঁর এক প্রধান সহায়। মধ্য-এশিয়ায় ইলাক খাঁর বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য তিনি তিলককে যথেষ্ট পুরস্কার দেন।

ভারত জয়ের সাধ মামুদের ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাঁর আক্রমণের সময়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতীয়দের সে কি মরণপণ সংগ্রাম! তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে জয়পাল জ্বলন্ত

* মতান্তরে সাবুক্তিগীন একজন তুর্কী ক্রীতদাস

চিতায় জীবন বিসর্জন দেন। মহাবনরাজ কুলচাঁদ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের বুকে ছুরি বসিয়ে পরে নিজে আত্মহত্যা করেন।[২] মুজাওয়ান আক্রমণের সময়ে শেষ হিন্দু সৈন্যটি নিহত না হওয়া পর্য্যন্ত মামুদ সে স্থান লুণ্ঠন করতে পারেন নি। কনৌজের অধিপতি রাজ্যপাল মামুদের বিরুদ্ধে কাপুরুষতা দেখিয়েছিলেন বলে চান্দেল্লরাজ ধঙ্গের পুত্র বিদ্যাধর তাঁর প্রাণ সংহার করেন।[৩] মামুদের ষষ্ঠ অভিযানের সময়ে বহু ভারতীয় রাজা লাহোরে গিয়ে আনন্দপালের সঙ্গে যোগ দেন এবং সম্মিলিত বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য সারা ভারতের নারীরা দেহের অলঙ্কার আনন্দপালের নিকট পাঠায়। সৈন্যদের আহারের জন্য কৃষকরা উদ্বৃত্ত শস্য রাজধানীতে পৌঁছে দেয়। শুধু কি তাই! হিন্দু সৈন্যগণ যে ভারতের স্বাধীনতা ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য হাজার হাজার নারী মাথার বেণী কেটে রণক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে পাঠায় ধনুকের জ্যা তৈরী করবার জন্য। উন্দের সেই ভীষণ যুদ্ধে মামুদ যে রক্ষা পেয়েছিলেন, মিনাজ-উস্-সিরাজের মতে, সে কেবল দৈববল![৪]

এই সব অভিজ্ঞতায় মামুদ হিন্দুস্থান জয়ের আশা ত্যাগ করে অরক্ষিত নগর ও মন্দির লুণ্ঠন করে দিগ্বিজয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেন। শুধু সোমনাথেই তিনি পঞ্চাশ হাজার পূজারী ও তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেছিলেন। ভারত থেকে তাঁর সৈন্যগণ এত নরনারীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল যে গজনীর নাখাশে তাদের ক্রেতা মিলত না। ইরাক ও খোরাশান থেকে বণিকরা এসে এক একটি বিজিত দাসকে মাত্র ৪।৫ দির্হাম মূল্যে খরিদ করত। তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন প্রায় ২০ হাজার এবং সেজন্য খলিফা আল-কাদির বিল্লা তাঁকে আমীন-উল-ইসলাম ও ইয়ামিন-উল-দৌল্লা উপাধিতে ভূষিত করেন ও সুলতান পদবী দেন। তিনিই ইসলাম জগতের প্রথম সুলতান।

সুলতান মামুদের প্রতিভা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছিল না।

সেই কারণে তাঁর তিরোধানের পর থেকে ইয়ামানি সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দীন নামক এক তুর্কী যোদ্ধা মামুদের শেষ বংশধর খসরু মালিককে কারারুদ্ধ ও হত্যা করে ভারত জয়ের রঙীন স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

ভারতীয় রাজগণের অন্তকলহ

পূর্ব ভারতের আকাশ বাতাস এই সময়ে জয়দেবের পদাবলীতে ঝংকৃত হচ্ছিল, কিন্তু উত্তর ভারত দুইটি রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিষময় হয়ে ওঠে। দিল্লীর অধীশ্বর অনঙ্গপাল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরীকে কনৌজরাজ বিজয়চন্দ্র এবং কনিষ্ঠা কন্যা কমলাকে আজমীরের অধিপতি সোমেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। আবার সোমেশ্বর-কমলার একমাত্র কন্যা পৃথার বিবাহ হয়েছিল মেবারের রাণা সমরসিংহের সঙ্গে। এইভাবে আত্মীয়তার বন্ধনে অবদ্ধ রাজবংশ তিনটি পূর্বদিকে গৌড় সীমান্ত থেকে পশ্চিমে সিন্ধু নদী এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত সকল ভূভাগ নিয়ন্ত্রিত করত। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে কোন বহিঃশত্রু ভারত আক্রমণের কথা চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু বিপদ বাধালেন বৃদ্ধ অনঙ্গপাল। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি কমলার পুত্র কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করে ধর্ম সাধনার জন্য বদরিকাশ্রমে চলে যান।[৫] আশাহত জয়চাঁদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন; পৃথ্বীরাজের অনিষ্ট সাধন তাঁর একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়।

দুজনের মধ্যে সম্বন্ধ এমনই তিক্ত হয় যে এক সময়ে দেবগিরির সঙ্গে কনৌজের যুদ্ধ আসন্ন হোলে পৃথ্বীরাজ প্রকাশ্যভাবে দেবগিরির পক্ষাবলম্বন করেন। তার ফলে জয়চাঁদ আত্মসংবরণ করলেও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেন তাঁর নিজ কন্যা সংযুক্তা। কন্যার বিবাহের জন্য জয়চাঁদ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে পৃথ্বীরাজের মৃন্ময় প্রতিহার মূর্তি স্থাপন

করেন সেই সভার দ্বারদেশে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সমাগত রাজপুত্রগণ দেখেন, তাঁদের সবাইকে উপেক্ষা করে সংযুক্তা সেই মূর্তির গলায় মাল্য অর্পণ করছেন। ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজ নিকটেই ছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্তাকে ঘোড়ায় তুলে বিদ্যুৎবেগে সেখান থেকে অন্তর্হিত হন। সভাস্থ সকলে হতবাক্ হয়ে বসে থাকেন!

মঞ্চাভিনয়ে এই নাটকীয় দৃশ্য দর্শকদের চক্ষে হৃদয়গ্রাহী হোলেও জয়চাঁদের পিতৃহৃদয় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজ শক্তিতে কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ, পৃথ্বীরাজ শুধু আজমীর-দিল্লীর অধীশ্বর নন গুজরাটের উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করেছেন। তার উপর মেবারের রাণা সমরসিংহ তাঁর ভগ্নিপতি ও অভিন্নহৃদয় সুহৃদ। এরূপ শক্তিশালী বৈরীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে লাভ নেই। সেই কারণে জয়চাঁদ মিত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন।

মহম্মদ ঘোরীর ভারতাক্রমণ

তুর্কী শিবিরে এই সময়ে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শন দেখা যায়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরোজ-কোর সিংহাসন লাভ করে গিয়াসুদ্দীন তাঁর ভ্রাতা মৈজুদ্দীন মহম্মদ শামকে প্রথমে রাজচিহ্ন-বাহক ও পরে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই মৈজুদ্দীন মহম্মদ শাম ভারত ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। সে মহাবল সুলতান মামুদ পূর্বে গজনীতে রাজত্ব করতেন তাঁর প্রতিভার কণামাত্রও ঘোরীর মধ্যে ছিল না। মামুদ বংশের হাত থেকে গজনী অধিকার করতে গিয়ে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং পরে যত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তাতে জয় অপেক্ষা পরাজয় বরণ করেন বেশী। অথচ সুলতান মামুদ যা পারেন নি তিনি তাই করেন—ভারতে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন!

তরুণ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে অনঙ্গপাল

বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন শুনে মহম্মদ ঘোরী তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের রণকৌশল এবং তাঁর মন্ত্রী কৈমাসের বুদ্ধিবলে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। প্রচুর মুক্তিমূল্য দিয়ে তবে তাঁকে পৃথ্বীরাজের কারাগার থেকে মুক্তি ক্রয় করতে হয়।[৬] উচা ও মূলতান আক্রমণ করেও তিনি পরাজয় বরণ করেন। পরে অবশ্য উচার অধিপতি মূলরাজের মহিষী স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁর হস্তগত হয়। তারপর ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অনিলবাড়া আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি রাজা ভীমদেবের হস্তে শোচনীয়রূপে পরাজিত হন।

সুলতান মামুদের শেষ বংশধর খসরু মালিককে বন্দী করে ঘোরী ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করেন। তারপর সাত বৎসর ধরে সমর সজ্জার পর ভাটিণ্ডা অধিকার করলে পৃথ্বীরাজ এগিয়ে যান তাঁর দর্প চূর্ণ করবার জন্য। থানেশ্বরের সাত ক্রোশ পূর্বে তরাইন প্রান্তরে উভয় পক্ষে যে লোমহর্ষক সংগ্রাম হয় তাতে বর্শার আঘাতে ঘোরী পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা দিল্লীপতি গোবিন্দরাজের দুটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললে গোবিন্দরাজ তাঁকে এমনভাবে আহত করেন যে অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকা অসম্ভব হয়। সে দিন যে তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিলেন দৈবানুগ্রহ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর অর্দ্ধমৃত দেহ নিয়ে জনৈক খিলজী সৈনিক রণস্থল ত্যাগ করলে তুর্কী যোদ্ধারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চারিদিকে পালাতে সুরু করে। তুর্কীবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং ঘোরীর রাজ্যের এক অংশ পৃথ্বীরাজের হস্তগত হয়।[৭]

সেই বিপর্য্যয়ের পর ঘোরীর পক্ষে পুণরায় ভারতাক্রমণের কথা চিন্তা করা সহজ নয়। কিন্তু তাঁর পরাজয় কনৌজরাজ জয়চাঁদকে হতাশ করে দেয়। তিনি গজনীতে দূত পাঠিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোরীকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। জম্মুরাজ বিজয়দেব আগে

থেকে ঘোরীর সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। দুইজন শক্তিশালী হিন্দু রাজার কাছ থেকে সাহায্যের অঙ্গীকার পেয়ে ঘোরী দুই বৎসর পরে পুনরায় দিল্লীর দিকে আসতে থাকেন। একই তরাইন প্রান্তরে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। দু'জন দেশদ্রোহী যেমন ঘোরীকে সাহায্য করেছিল পৃথ্বীরাজ তেমনি তাঁর ভগ্নিপতি সমরসিংহ এবং কয়েকজন দেশভক্ত রাজার সাহায্য পেয়েছিলেন। বহু আফগান এবং গক্কড় তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তাঁর সমর নেতৃত্ব ঘোরী অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের ছিল। এই সকল কারণে পরাজয়ের বিন্দুমাত্র হেতু থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাঁর ব্যূহের পশ্চাৎ দিকে শত্রুর গোপন হস্ত পূর্ব থেকে সক্রিয় ছিল। তারই প্রভাবে সেই মহাবীরের পতন হয়।[৮]

জয়চাঁদও রক্ষা পান নি। যে আগুন দিয়ে তিনি আপন আত্মীয়কে পোড়াতে চেয়েছিলেন এক দিন নিজেই তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। দিল্লী জয়ের এক বৎসর পরে ঘোরী তাঁর এই পরম সুহৃদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে জয়চাঁদের সৈন্যগণ তাঁকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিরোধের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। চান্দোয়ালের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং সিপাহ্‌সালার ইজুদ্দীনের নিক্ষিপ্ত শরে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৯]

গৌড় সীমান্তের ওপারে তুর্কীদের শিবির স্থাপিত হয়।

1 *Cambridge History of India, Vol. III, p. 2-9*
3 Elliot H. M. & Dowson J. *History of Gazni, p. 39*
3 Mukherji R. K. *Ancient India, p. 407*
4 Minhaj-us Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Raverty's Trans., Tabakat XI*
৫ চাঁদ কবি, পৃথ্বীরাজ-রাসো, দিল্লীদান ৩৯
৬ ঐ ঐ কৈমাস যুধ
7 Minhaj-us Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Elliot & Dowson's Trans. Tabakat XVII*
8 Ibid Ibid
9 Ibid Ibid

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

বাগদাদ-তাব্রিজ পরিকল্পনা

ইসলাম প্রসারে নিজামিয়া মাদ্রাসা

ছাব্বিশ বৎসর ধরে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যা চালিয়ে সুলতান মামুদ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে দেখা গেল যে ভারতমাতা ধর্ষিতা হয়েছেন, কিন্তু ইসলামের স্রোত ৭১২ খৃষ্টাব্দে যেখানে প্রতিহত হয়েছিল সেখানেই রয়ে গেছে। অথচ খলিফা এল-কাদিরের কাছ থেকে ইসলাম প্রসারের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে মামুদ হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছিলেন এবং অন্ততঃ দু'জন হিন্দু সেনাপতি তিলক ও সুখপালকে যে ভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন আর কাউকে তা দেন নি। সুখপাল কলমা পড়ে শুদ্ধ হোলে তিনি বিজিত মুসলমান রাজ্য মুলতান তাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু এত সুখ সুখপালের সইল না; মামুদের প্রস্থানের পর তিনি দলবলসহ প্রায়শ্চিত্ত করে সনাতন ধর্মে ফিরে এলেন। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমানগণ বুঝে নেয় যে হিন্দুত্ব যে ভাবে নিজের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে বসে রয়েছে তাতে ভারতকে দীক্ষিত করা সহজসাধ্য হবে না।

অস্ত্রবলে যে দুয়ার খোলা গেল না অহিংসার দ্বারা কি তা খোলা সম্ভব?—হ্যাঁ সম্ভব, বললেন সুলতান মামুদের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ মাসাউদ গাজী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দেশে ফিরে গিয়ে সেই সৈনিক সামরিক পোষাক খুলে ফেলেন এবং পীরের খার্কা পরিধান করে আবার আসেন ভারতে। তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয় এবং সেগুলিকে ঘিরে ছোট ছোট মুসলমান

উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সেই শান্তিপূর্ণ ভজনালয়গুলিকে সন্দেহ করবার কোন কারণ সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ দেখেন নি ; তাই তারা নির্বিবাদে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায়।

মাসাউদ গাজীর পরিকল্পনার পিছনে যে খলিফার আশীর্বাদ ও আর্থিক সাহায্য ছিল এরূপ অনুমান আমরা করতে পারি। কারণ, ইসলামের রক্ষণ ও প্রসারের দায়িত্ব মুখ্যতঃ তাঁর। তাঁর সাম্রাজ্য তখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হোলেও মুসলিম জগতের উপর তাঁর রাজধানী বাগদাদের প্রভাব একটুও কমে নি। তখনও বাগদাদ বিশ্বের এক সমৃদ্ধতম নগরী এবং ইসলামী শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র। বাগদাদ! হারুণ-অল-রসিদের বাগদাদ! শেহেরাজাদীর বাগদাদ! এই বাগদাদে রাজকুমারী শেহেরাজাদী এক হাজার এক রাত্রি ধরে ক্রমাগত গল্প বলে সম্রাটের মনোরঞ্জন করেছিলেন। এই বাগদাদে কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ও তাঁর বেগম জুবেদা বিরাট জঁাকজমকের সঙ্গে রাজত্ব করতেন। আবার এই বাগদাদে ভারত থেকে পণ্ডিতগণ গিয়ে আরব জগৎ ও ইউরোপকে গণিত, জ্যোতিষ ও রসায়ন শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১]

আলোচ্য সময়ে প্রতিবেশী সালজুক সুলতান আল্প আর্সলান ও তাঁর পুত্র মালিক সাহ্‌র সঙ্গে খলিফার সদ্ভাব না থাকলেও তাঁদের উজির নিজাম-উল-মুলক মুসলিম ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠতম শাসকরূপে পরিচিত হয়ে রয়েছেন। খলিফার অনুমতি নিয়ে তিনি ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ সহরে নিজামিয়া মাদ্রাসা নামে যে মহাবিদ্যালয়টি নির্মাণ করেন ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তার গুরুত্ব কম নয়। খলিফা এই মাদ্রাসাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দিতেন। এখানকার গ্রন্থাগারে যত ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত ছিল আর কোথাও তা ছিল না। মাদ্রাসাটির নির্মাণ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং দলে দলে ছাত্র সেখানে এসে

অধ্যয়ন করতে থাকে। বহু শক্তিশালী উলেমা ও খ্যাতনামা সুফী এই মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দু'জন বিখ্যাত সুফী পীর সিহাবুদ্দীন সাহ্‌রোয়ার্দি এবং আব্দুল কাদির আল-জিলানি এখানে অধ্যাপনা করতেন। পীর সাহ্‌রোয়ার্দিকে খলিফা সুফী সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।২

পারস্যের তথা ইসলাম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কবি সাদির তারুণ্য এই নিজামিয়া মাদ্রাসায় কেটে যায়। এখানে আব্দুল কাদির আল-জিলানি ছিলেন তাঁর মুর্‌শিদ; তাঁর বুস্তানে আল-জিলানিকে পঞ্চ মুখে প্রশংসা করেছেন। এই গুরুর সঙ্গে তিনি কয়েকবার তীর্থ ভ্রমণের জন্য মক্কা ও মদিনায় গিয়েছিলেন। সিহাবুদ্দিন সাহ্‌রোয়ার্দির কাছে তিনি সুফীবাদ শিক্ষা করেন এবং মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের সময়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ভারতে আসেন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগ দিতে।

শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তি

নিজামিয়া মাদ্রাসায় শেখ সাদীর দু'জন সহপাঠী শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তি ও শেখ জালালুদ্দীন মখদুম শাহ্‌ তাব্রেজী সৈনিক-কবির আগমনের কিছু কাল পূর্বে ভারতে এসে পৃথ্বীরাজ ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের মধ্যে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। মুসলমানগণ শেখ চিস্তিকে হিন্দুস্থান প্রবেশদ্বারের উন্মোচক বলে মনে করে। পারস্যের খোরাসান প্রদেশের চিস্ত্‌ সহরে ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। সে সময়ে বিধর্মী তাতারগণ খোরসানের মুসলমানদের উপর এরূপ অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল যে মৈনুদ্দীনের পিতা বাধ্য হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিশাপুরে চলে যান। সেখানে এবং বোখারায় তিনি উস্‌মান্ হারুনি, হিসামুদ্দীন বোখারি, নিজামুদ্দীন কিব্রিয়া প্রভৃতি পণ্ডিতদের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। একবার মৈনুদ্দীন তাঁর মুর্‌শিদ উস্‌মান হারুনির সঙ্গে মক্কায়

তীর্থ করতে গেলে নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিহাবুদ্দীন সাহ্‌রোয়ার্দির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর তিনি বাগদাদে এসে সেই পীর এবং আবু সৈয়দ তাব্রেজী ও আব্দুল কাদের আল-জিলানির কাছে স্ফুফীবাদ অধ্যয়ন করেন।

বিশ বৎসর ধরে উস্‌মান হারুনীর কাছে শাস্ত্রাধ্যায়নের পর শেখ চিস্তি ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর পীর-ও-মুর্‌শিদ প্রদত্ত খারকা-ই-খেলাফৎ পান। সেই থেকে তাঁর নাম সকল মুসলমান দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে ভারতের শৈবতান্ত্রিকরা যেমন শ্মশানকে পবিত্র জ্ঞান করত তিনিও তেমনি গোরস্থানকে সেইরূপ মনে করে যেখানেই যেতেন আস্তানা স্থাপন করতেন সেখানকার কোনও গোরস্থানের এক ধারে। এই ভাবে দেশ ভ্রমণ করতে করতে একবার মদিনায় গিয়ে তিনি বস্‌রাৎ শোনেন—হিন্দুস্থানে যাও, সেখানকার অধিবাসীদের ইস্‌লামে দীক্ষিত করো। এই দৈববাণী সার্থক করবার জন্য শেখ চিস্তি ৪০ জন অনুচরসহ চলে আসেন দিল্লীতে এবং সেখান থেকে পৃথ্বীরাজের রাজধানী আজমীরে। আনা সাগরের তীরে নির্মিত হয় তাঁর আশ্রম।

সীমান্তের ওপারে যখন রণ প্রস্তুতি চলছে সেই সময়ে শেখ চিস্তি যে কি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর রাজধানীতে এসেছিলেন একথা অনুমান করতে পৃথ্বীরাজের অসুবিধা হয় নি। কিন্তু পীরের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখলেও সময়োচিৎ দৃঢ়তা তিনি দেখান নি। তার ফলে শেখ চিস্তি অজয়পাল প্রমুখ ৭০০ লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং পরে স্বয়ং পৃথ্বীরাজের কাছে আহ্বান পাঠান ইসলাম গ্রহণের জন্য। সে আহ্বান তিনি তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করলে পীরের পীর আল্লার কাছে প্রার্থনা জানান—পাপিষ্ঠ পৃথ্বীরাজ যেন ধ্বংস হয়, হিন্দুস্থানের আকাশ আজানের ধ্বনিতে ভরে ওঠে!

করুণাময় আল্লা পীরের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হোলে বিজয়ী মহম্মদ ঘোরী রণক্ষেত্র থেকে সোজা চলে যান আজমীরে—শেখ চিস্তির আস্তানায়![৩]

জালালুদ্দীন মখ্‌তুম সাহ্‌ তাব্রেজী

নিজামিয়া মাদ্রাসার আর একজন ছাত্র জালালুদ্দীন মখতুম সাহ্‌ এসেছিলেন গৌড়ে। ইরাণের তাব্রিজ সহরে এক অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয় এবং সেখানকার বিশিষ্ট পীর আবু সৈয়দ তাব্রেজীর কাছে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আসেন বাগদাদে। এখানকার নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হোলে তাঁর ধর্মানুরাগ ও বুদ্ধিমত্তাতে মুগ্ধ হয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিহাবুদ্দীন সাহ্‌রোয়ার্দি তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। এই মুর্‌শিদকে তিনি এতই শ্রদ্ধা করতেন যে একবার মক্কায় তীর্থযাত্রার সময়ে পথে তাঁকে উজুর জন্য যে কোন সময়ে গরম জল সরবরাহ করবার উদ্দেশে মাথার উপর জ্বলন্ত চুল্লি নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুরতেন!

সহপাঠী শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির ন্যায় জালালুদ্দীন মক্কায় বা অন্য কোথাও কোন দৈববাণী শুনেছিলেন কিনা তা বলা যায় না, তবে তাঁরই ন্যায় মহম্মদ ঘোরীর ভারতাক্রমণের প্রাক্কালে তিনি আসেন দিল্লীতে এবং সেখান থেকে গৌড়ে—লক্ষণসেনের রাজত্বে। সেই সময়ে রচিত শেক শুভোদয়া নামক অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা একখানি পুস্তক থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে এই পীরের প্রথম সাক্ষাৎ হয় গঙ্গাতীরে। হলায়ুধ মিশ্র তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পীরের কয়েকটি অলৌকিক ক্ষমতা দেখে গৌড়েশ্বর এতই প্রীত হন যে রাজসভায় আসবার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান।

সেখ চিস্তিকে পৃথ্বীরাজ যেরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখেছিলেন জালালুদ্দীনকে সেভাবে দেখবার প্রয়োজন লক্ষ্মণসেনের হয় নি। তাই তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য পীরকে পাণ্ডুয়ায় একখণ্ড জমি দান করেন। ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশের অধিকারও তিনি পান এবং সভাসদদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। স্বয়ং গৌড়েশ্বরী বল্লভদেবী তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতেন। মহাকবি জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী

পদ্মাবতীর সঙ্গে পীরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে পীর গৌড়ে এসেছিলেন তা সুসম্পন্ন করতে হলে বহু অর্থের প্রয়োজন। তার কোন অভাব হয় নি ; বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সঙ্গে এনেছিলেন এবং তাই দিয়ে বাইশ হাজার মুদ্রা আয়ের এক জমিদারী ক্রয় করেন। জমিদারীটির মূল অংশ ছিল বর্দ্ধমান জেলায়। তার আয় থেকে তিনি বহু লোককে বশীভূত করেছিলেন। অর্থবলে স্বয়ং লক্ষ্মণসেনকে পর্য্যন্ত খুসী করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয় নি। একবার ভূগর্ভ থেকে তিনি স্বর্ণালঙ্কার ভরা একটি কলসী পান! কিন্তু ফকির মানুষ, কি করবেন অলঙ্কার নিয়ে? তাই সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মণিটি দেন গৌড়েশ্বরকে। রাজনর্তকী শশীকলা ও বিদ্যুৎকলা দু'গাছা করে এবং হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, জয়দেব ও পদ্মাবতী একগাছা করে কঙ্কন পেয়েছিলেন। মধুকর বণিকের পত্নী মাধবী ছিলেন পীরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী, সেইজন্য তাঁকে দেওয়া হয় দু'গাছা কঙ্কণ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইভাবে পীরের কাছ থেকে মাঝে মাঝে উপহার পেতেন এবং সেজন্য তাঁর সদাশয়তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েকজন সভাসদ তাঁর গতিবিধি সুনজরে দেখেন নি। তাঁরা নিজেদের সন্দেহের কথা গৌড়েশ্বরের গোচরে আনেন, কিন্তু তাঁর ছিল পীরের উপর অগাধ বিশ্বাস! তাই দেখে বিরোধীদের নেতা উমাপতিধর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে পীরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফল হয় বিপরীত ; তাঁরাই জনসাধারণের কাছে হেয় হন এবং পীরপক্ষীয়দের প্রভাব আরও বেড়ে যায়।[৮]

যে বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকের গৌড়ের সমাজ জীবনের সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তাঁর স্বধর্মীয়গণ তাঁরই আগমনের কিছু কাল পরে বিনা যুদ্ধে নবদ্বীপ অধিকার করে নেয়! সে সময়কার দ্রুত পরিবর্তনশীল নাটকে তিনি যে কোন ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন

সে কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সেই যুগান্তকারী ঘটনায় নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে বসে থাকলে স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এক বিধর্মী অধ্যুষিত দেশে তাঁর আসবার কোন প্রয়োজন হোত না। ইতিবৃত্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব নয়। পীরের আগমনের কিছু কাল পরে বখ্‌তিয়ার খিলজী যখন নবদ্বীপ জয় করেন তখন পীরকে আমরা ভিন্ন রূপে দেখতে পাই। তাঁর আদেশে পাণ্ডুয়ার সমস্ত মঠ ও মন্দির ধ্বংস এবং বরেন্দ্রের বহু দৈত্যের বিনাশ সাধন করা হয়।[৫] বিজয়ীর চক্ষে পরাজিত শত্রু চিরদিনই দৈত্য!

জালালুদ্দীন এদেশে মকদুম পীর নামে পরিচিত। প্রথম গৌড়ে আসবার কয়েক বৎসর পরে তিনি একবার কিছু দিনের জন্য দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বখ্‌তিয়ার খিলজী যখন নবদ্বীপ ধ্বংস করেন তখন তিনি পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁর দরগা আছে। প্রতি বৎসর রজব মাসের ২২ তারিখে সেখানে তাঁর ফতেহা হয়।

সর্বব্যাপী সমর প্রস্তুতি

তিলক তাঁর হিন্দু সৈন্যদের নিয়ে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় সুলতান মামুদ তাঁকে উজীর নিযুক্ত করেছিলেন। মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ যখন পিতৃসিংহাসনের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন সেই সময়ে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র মাসুদের পক্ষাবলম্বন করে জ্যেষ্ঠ আহ্‌মেদকে নিহত করেন এবং তাঁর ছিন্ন মস্তক পাঠিয়ে দেন নূতন সুলতানের কাছে মার্ভ্‌ নগরীতে। তাঁর আদেশে আহ্‌মেদপক্ষীয় মুসলমান সেনানীদের উভয় হস্ত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।[৬] এইভাবে মাসুদকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে সেই হিন্দু ক্ষৌরকারপুত্র গজনী সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসেন!

এর পর ইসলামের জন্য ভারত জয়ে ইয়ামানি বংশের কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। গজনীর ওপারে নবদীক্ষিত সালজুকগণ যথেষ্ট শক্তিশালী হোলেও খলিফার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। সালজুক সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ অবরোধ করে খলিফাকে নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছিলেন। এই সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখালেন মহম্মদ ঘোরী। তিনি উচ্চাকাঙ্খী ও খলিফার প্রতি অনুরক্ত। ইসলাম প্রসারের জন্য তাঁর কোন আগ্রহ না থাকলেও তাঁকে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব হবে মনে করে নিজামিয়া মাদ্রাসার পীরগণ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

সুলতান মামুদের ন্যায় মহাবীর যখন বহু বৎসর যুদ্ধের পর তবে পাঞ্জাব অধিকার করতে পেরেছিলেন তখন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সম্মুখ সমরে ঘোরী যে ব্যাত্যাহত তৃণের মত উড়ে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নিজামিয়া মাদ্রাসার ছিল না। কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না! ঘোরীর সমর প্রস্তুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শত্রুব্যূহের পশ্চাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর অভিযান সুরু করবার পূর্বে যে সব অগ্রদূত গিয়ে বিভিন্ন রাজধানীতে আত্মগোপন করে থাকবেন তাঁদের যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হোল। অসাধারণ আত্মিক বলে বলীয়ান সেই পীরগণ গেলেন ভারতে। স্থানীয় অধিবাসীদের তাঁরা দীক্ষা দেবেন এবং তাদের ভিতর থেকে পঞ্চম-বাহিনীর সৃষ্টি হবে। যদি সম্ভব হয় পীরগণ রাজসভা এবং সৈন্যবাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁদের উদ্যোগে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকা ভারতের আকাশে উড়তে থাকবে! এই মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে পীর মৈনুদ্দীন এলেন আজমীরে—জালালুদ্দীন মখ্দুম সাহ্ গৌড়ে। ভারত জয়ের পটভূমিকা তৈরী হোল।

খলিফা আল্-নাসির (১১৮৮–১২০৫) নিরপেক্ষ ছিলেন না। মহম্মদ

তুর্কী আক্রমণের সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

ঘোরীর অভিযানের উপর তিনি জেহাদের টীকা পরিয়ে দেওয়ায় বহু মুসলমানের মনে ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনা জেগে ওঠে ; তারা এসে অভিযাত্রী বাহিনীতে যোগ দেয়। কিন্তু খলিফা নিজে কিছু করতে পারেন নি। কারণ, বাগদাদে সে সময়ে গণবিক্ষোভ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্নিহিত অঞ্চল থেকে দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিরা এসে ওই সহরে প্রতিনিয়ত বিভীষিকার সৃষ্টি করত ; তার উপর ছিল সিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব, বন্যা ও গৃহদাহ। এই অবস্থায় খলিফার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ইসলাম কিন্তু প্রসার লাভ করছিল। মধ্য-এশিয়ায় যে সব পার্বত্য জাতি কিছু কাল পূর্বে ওই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল ইসলামের পতাকা হস্তে তারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতে যারা এসেছিল কুল পরিচয়ে তারা তুর্কোমান এবং প্রকৃতিতে যাযাবর। জীবিকার সন্ধানে তারা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খোরাসান, সিয়েস্তান ও আফগানিস্থানে চলে আসে এবং আরও প্রসারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। তাদের সংগঠিত করে মহম্মদ ঘোরীর ভারতাভিযানের পরিকল্পনা রচিত হয়।

মগধ জয়

সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য এই তুর্কী যাযাবরদের পক্ষে সুগঠিত দেহ, দ্রুতগামী অশ্ব এবং এক প্রস্থ হাতিয়ার অপরিহার্য্য ছিল। ঘরম্‌শির নিবাসী খিল্‌জী যুবক ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের কোনটিই ছিল না। তাঁর দেহ বলিষ্ঠ হোলেও অবয়ব ছিল খর্ব ও কদাকার ; অর্থাভাবে ঘোড়া বা হাতিয়ার কেনবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। সেই কারণে যখন তিনি নিজ দলবল ছেড়ে চাকুরীর সন্ধানে গজনীতে এলেন তখন তাঁকে সৈন্যবাহিনীতে না নিয়ে দেওয়ান-ই-আর্জ্‌এ একটি নিম্ন স্তরের কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু অযোগ্যতার জন্য উপরওয়ালাদের বিরাগভাজন হওয়ায় সে কাজ তিনি বেশী দিন রাখতে

পারেন নি। একই সময়ে গক্কড়গণ মহম্মদ ঘোরীকে হত্যা করায়* গজনীতে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে কারও কাছে আবেদন করবার সুযোগও মেলে নি।

নিরক্ষর হোলেও বখ্‌তিয়ার বুঝেছিলেন যে তরাইনে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের ফলে ভারত ইতিহাসে এক যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ সুযোগ হেলায় হারালে ভবিষ্যতে অনুতাপের অন্ত থাকবে না। তাই কর্মচ্যুতিতে হতাশ না হয়ে তিনি চলে আসেন দিল্লীতে—কুতুবুদ্দীন আইবেকের রাজসভায়। কিন্তু সেখানেও কিছু সুবিধা হোল না। তাই আরও পূর্ব দিকে চলতে চলতে শেষ পর্য্যন্ত বুদাউনে উপনীত হোলেন। সেখানে সিপাহ্‌সালার হিজবারুদ্দীনের অধীনে একটি কাজ মিলল। বাঁধা মাইনের কাজ, বেতন খারাপ নয়। কিন্তু বখ্‌তিয়ারের ন্যায় উচ্চাকাঙ্খী যুবক এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিছু দিন বুদাউনে চাকুরী করবার পর ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চলে আসেন অযোধ্যায়। সেখানকার মসনদে তখন সমাসীন তাঁরই ন্যায় আর একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক মালিক হিসামুদ্দীন উঘলাবাক্। বখ্‌তিয়ারকে তাঁর প্রয়োজন ছিল; অনির্দিষ্ট পূর্ব সীমান্তে সালাৎ ও সালী নামক দুইটি জায়গীর দিয়ে তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বখ্‌তিয়ারও ঠিক এমনি সুযোগ খুঁজছিলেন। মীর্জাপুর জেলার সেই জায়গীরকে কেন্দ্র করে তিনি মগধের অভ্যন্তরে মুঙ্গের পর্য্যন্ত অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাতে লাগলেন। তাঁর লুঠেরাদের নিষ্ঠুরতায় সর্বত্র বিভীষিকার সৃষ্টি হোলেও সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু খিল্‌জি ভাগ্যান্বেষী এসে তাঁর দলে যোগ দেয়। সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁকে খেলাৎ পাঠান।

এই ভাবে বৎসরাধিক কাল ধরে লুঠতরাজ চালাবার পর বখ্‌তিয়ার

* মতান্তরে বন্দী পৃথ্বীরাজ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে ঘোরীকে নিহত করেন।

—পৃথ্বীরাজ-রাসৌ, বাণবেধ প্রস্তাব

বুঝে নেন যে মগধের পাল বংশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। যে রাজশক্তি দস্যু দমন করতে অক্ষম তারা আত্মরক্ষা করবে কেমন করে? এক দিন দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীর সম্মুখে এসে আবির্ভূত হোলেন। তাদের দেখে নগরবাসীরা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ে—নগরদ্বারে যুদ্ধও হয়। কিন্তু সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে বখ্‌তিয়ার ওদন্তপুরী অধিকার করে নেন। প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন তাঁর হস্তগত হয় এবং মুণ্ডিতমস্তক সকল ব্যক্তিকে তিনি তরবারির আঘাতে নিশ্চিহ্ন করেন। পরে সেখানকার গ্রন্থাগারে রক্ষিত অসংখ্য পুস্তকের পাঠোদ্ধার করবার জন্য তিনি কয়েকজন পণ্ডিতের খোঁজ করলে তাঁকে জানান হয় যে তাঁদের সবাই তুর্কী সৈন্যদের তরবারীর আঘাতে নিহত হয়েছেন। তখন বখ্‌তিয়ার বুঝতে পারেন যে ওদন্তপুরী মহাবিহারকে তিনি দুর্গ বলে ভ্রম করেছিলেন![৭]

পাল রাজ্যের প্রাণবায়ু আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; তাই ওদন্তপুরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বংশের উপর শেষ যবনিকা পড়ে। মগধের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাল সৈন্যরা তুর্কীদের বিরোধীতা করবার জন্য যদি এগিয়ে এসেও থাকে তার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল না। প্রায় বিনা বাধায় বখ্‌তিয়ার সমস্ত মগধ অধিকার করে নেন।

এবার গৌড়! মগধ জয়ের পর তুর্কীরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে গৌড় সীমান্তে এসে বিশ্রাম নেয়।

1 Hitti P. K. *History of the Arabs* p. 307-8

2 Rouart S. & N. *Encyclopaedia of Arabic Civilisation*, p. 418

3 Begg M. W. *Holy Biography of Khwaja Moinuddin Chisti*, p. 42-67

৪ শেকশুভোদয়া, সম্পাদনা, সুকুমার সেন

৫ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭৯

6 Abul Fazl Baihaki *Tarikh-ul Hind*, *Elliot's trans.* p. 115-20

7 Minhaj-us Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Tabakat XX*

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

শেষ অঙ্ক

অদূরদর্শী লক্ষ্মণসেন

সুলতান মামুদ যখন সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করছিলেন বা মহম্মদ ঘোরী যখন দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন গৌড়ের রাজশক্তি তখন গুজরাট বা দিল্লী-আজমীর অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। বিপুল ছিল তার ঐশ্বর্য্য, অমিতবিক্রম ছিল সৈন্যবাহিনী। এই সামরিক বলের জন্য কোন বহিঃশত্রুর পক্ষে দীর্ঘ চার শতাব্দীর মধ্যে গৌড়ে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। এরূপ গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিকায় একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে এই রাজ্যের শাসনযন্ত্র বিনা যুদ্ধে তুর্কীদের হাতে চলে যায়। কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। মিন্‌হাজ-ই-সিরাজের বিবরণ অনুসারে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী ১২০১ খৃষ্টাব্দে গৌড় প্রাসাদে আবির্ভূত হন এবং বিনা প্রতিরোধে লক্ষ্মণসেনের হাত থেকে অস্থায়ী রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করে নেন।*

কাহিনীটি শুনতে আরব্যোপন্যাসের মত অলীক বলে মনে হোলেও মিথ্যা নয়। লক্ষ্মণসেন বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ রাজনীতি জ্ঞান তাঁর ছিল না। তুর্কীদের দিল্লী অভিযানের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী থেকে এক অক্ষৌহিনী সৈন্যও পৃথ্বীরাজের সাহায্যের জন্য তরাইন প্রান্তরে পাঠান হয় নি। কিন্তু গৌড়ের প্রথম রক্ষাব্যূহ তো

* Tabakat-i-Nasiri, Tabakat XX

সেখানেই ছিল। দিল্লীজয় তুর্কীদের আশু লক্ষ্য হোলেও শেষ লক্ষ্য ছিল না। মহম্মদ ঘোরী লাহোর ও মুলতানে যে দু'টি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন সেখান থেকে সমগ্র আর্য্যাবর্ত জয় করবার জন্য তাঁর সৈন্যদের তৈরী করা হচ্ছিল। সুলতান মামুদের সাম্রাজ্য ধ্বংস করে তিনি পাঞ্জাব পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর দিল্লী-আজমীর অধিকার করলে তাঁর গতিরোধ করবে কে? কনৌজ জয় ও মগধ গ্রাস করে তুর্কীবাহিনী এসে গৌড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না? শুধু পৃথ্বীরাজের জন্য নয়, নিজের জন্য লক্ষ্মণসেনের উচিত ছিল একটি শক্তিশালী বাহিনী তরাইনে পাঠান। তাতে পৃথ্বীরাজ রক্ষা পেতেন, তিনিও বাঁচতেন।

সেই মহা দুর্য্যোগের দিনে লক্ষ্মণসেন বিন্দুমাত্র দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নি। কোন এক সঞ্জয়ের মুখে তিনি তরাইন যুদ্ধের বিবরণ শুনলেন, কিন্তু তুর্কী বাহিনী যে পরোক্ষে তাঁর রাজ্যও আক্রমণ করছিল সে কথা উপলব্ধি করতে পারলেন না। শুধু কি তাই? দিল্লী জয় করে তুর্কী সৈন্যগণ যখন পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিল মিথিলা ও উৎকলের অধিপতিরা তাদের সম্মুখীন হবার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, গৌড়েশ্বর কিন্তু তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যাসের আদেশ দেন নি।

স্পেনীয়দের অ্যামেরিকা জয় ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় বখ্‌তিয়ারের গৌড় জয়ের আর কোন তুলনা নেই। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্পেনীয়গণ যখন দক্ষিণ অ্যামেরিকায় গিয়ে উপনীত হয় সেই সময়ে ইকোয়েডর থেকে চিলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ইন্‌কা সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করতেন সম্রাট আতাহুয়ালপা। এই সাম্রাজ্যের স্বর্ণ দিয়ে আমাদের বর্তমান সভ্যতার আর্থিক বনিয়াদ নির্মিত হয়েছে। সেই স্বর্ণের লোভে যে সব স্পেনীয় নাবিক ইন্‌কার বিভিন্ন বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙর করে তার মধ্যে ছিলেন ফ্রানসিস্‌কো পিজারো

—স্পেনের বখ্‌তিয়ার খিলজী। বখ্‌তিয়ারেরই ন্যায় কদাকার, নিরক্ষর ও নিষ্ঠুর এই জলদস্যু ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে যখন তাম্বেজ বন্দরের নিকট অবতরণ করে ইন্‌কা তখন গৃহবিবাদে অবসন্ন। এক বিভীষণী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর পিজারো কাজামারকা সহরে গিয়ে সম্রাট আতাহুয়ালপাকে নিজ তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করে। সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি যখন স্বদেশীয় প্রথানুসারে নিরস্ত্র দেহরক্ষীসহ পিজারোর তাঁবুতে আসেন স্পেনীয়গণ তখন তাঁকে আপ্যায়িত করে লৌহশৃঙ্খল পরিয়ে!

বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দানের শক্তি দুর্দ্ধর্ষ ইন্‌কাবাসীদের ছিল। কিন্তু তখন তাদের পতনের দশা! তাই সম্রাটকে মুক্ত করবার জন্য স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে পিজারোর কাছে চার কোটী টাকার সোনা পাঠিয়ে দেয়। দস্যু তা গ্রহণ করে, কিন্তু সম্রাট নিহত হন! তখন পিজারো তাঁর রাজধানী কুজকোয় গিয়ে বালক কুমার মন্‌কোকে সিংহাসনে বসায় এবং সমস্ত সোনা স্পেনে পাঠিয়ে দিয়ে প্রভূত পরিমাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ ইন্‌কায় আনে। সেগুলি এসে পৌছালে মন্‌কোকে হটিয়ে ইন্‌কার রাজধানী অধিকার করা হয়।

নূতন জগতের ইন্‌কা সাম্রাজ্যের ন্যায় পুরাতন জগতের গৌড় বিনা প্রতিরোধে বিদেশীর হাতে চলে যায়। জাতীয় অসম্মানের এই চিন্তায় প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও শাসক ও শাসিতদের অধঃপতনের কথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে তারা উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। রাজা রাজধর্ম ভুলে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় ডুবেছিলেন, পারিবারিক দ্বন্দ্বে রাজপ্রাসাদ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, প্রজাগণ আত্মসম্বিত হারিয়েছিল। শত্রু যখন দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে তখনও তারা বিশ্বপ্রেমের মহাসঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করছিল, পঞ্চম-বাহিনী ঘরের মধ্যে বসে যে মধুর বীণা বাজাচ্ছিল তারই তালে নৃত্য করছিল। আলস্য, শিথিলতা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা

ব্যভিচার ও বিশ্বাসঘাতকতা সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে জাতীয় চরিত্রকে পতনের এরূপ গভীরতম খাদে নামিয়ে দিয়েছিল যে গৌড়বাসীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করবার জন্য যে ব্যাধ ছদ্মবেশে গৃহাভ্যন্তরে অপেক্ষা করছিল যে অনায়াসে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করে !

কর্মতৎপর পঞ্চম-বাহিনী

লক্ষ্মণসেন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ—স্থবির। তাঁর সৈন্যবাহিনীও এক অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে তাঁরই মত স্থবির হয়ে পড়েছিল। তুর্কীদের এক সুদক্ষ পঞ্চম-বাহিনী গৌড়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাদের অকর্মণ্য করে দিয়েছিল। সংখ্যায় নগণ্য হোলেও এই অগ্রগামী দলটী ছিল স্বধর্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও সঙ্গতিসমৃদ্ধ। গৌড় জীবনের সর্ব স্তরে অনুপ্রবেশ করে তারা জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছিল। সৈন্য বাহিনী, সরকারী দপ্তরখানা, এমন কি রাজপ্রাসাদে পর্য্যন্ত তাদের ছিল অবাধ গতি। মসজিদ নির্মাণের জন্য স্বয়ং গৌড়েশ্বর তাদের ভূমি দান করেছিলেন ; তাঁর বৃদ্ধা মহিষী তাদের কাছে ধর্মকথা শুনতেন। গৌড় পতনে এদের কে কোন ভূমিকা অভিনয় করেছিল ইতিহাসে তা লেখা নেই, কিন্তু একথা চিন্তা করে সকল দেশপ্রেমিকের হৃদয় অবসাদগ্রস্ত হয় যে বখ্‌তিয়ার তাঁর সুপরিকল্পিত অভিযানের D-দিবসে যখন গৌড় সীমান্ত অতিক্রম করেন তখন কেউ তাঁকে বাধা দেয় নি। এমন কি তাঁর সৈন্যগণ অশ্বব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলে তোরণদ্বারে কোন প্রহরী তাদের দেহ তল্লাস করে নি। সেই মহা দুর্য্যোগের দিনে গৌড়ের রাষ্ট্রযন্ত্র এমনই নিখুঁতভাবে স্যাবোটেজ করা হয়েছিল।

রাজা তাঁর রাজধর্ম বিসর্জন দিয়ে সাধন-ভজনে ডুবে থাকতেন ; জনসাধারণ হয়ে পড়েছিল স্পন্দনহীন জড়স্তূপ। নিম্ন শ্রেণী অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবেছিল ; উচ্চ শ্রেণী বিলাস সমুদ্রে গা ভাষাত।

কবিআপতি ধোয়ী তাঁর পবনদূতে গৌড় রাজধানীর যে বিবরণ লিখে গেছেন তাতে দেখা যায়, দিবাভাগে বারবনিতার দল প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরে বেড়াত এবং নিশাগমের পর তাদের প্রণয়ীদের পদধ্বনিতে সমস্ত নগরী মুখরিত হোত। এই পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে দূরে সরে গিয়ে লক্ষ্মণসেন নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু জাতিকে বাঁচাতে পারেন নি। সেই পলিতে পুষ্টিলাভ করে যে সব বিষবৃক্ষ জন্ম লাভ করেছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল কিছু সংখ্যক আদর্শবাদী যুবক যারা পররাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের পুনর্গঠন সাধনে ব্রতী হয়।

এই ভ্রান্ত আদর্শবাদীদের নেতা পাণ্ডুয়াবাসী বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ* বোধ হয় গৌড়-বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান। তাঁর ন্যায় আরও অনেক যুবক ইসলামে দীক্ষা নিয়ে বহির্ভারতীয় দেশগুলিকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করত। সেই সব দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কারও ছিল না, পরের দেওয়া বিবরণ থেকে যে রঙ্গিন চিত্র তারা নিজেদের মানস নেত্রে অঙ্কিত করেছিল তার উপর রঙ চাপিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করত। সে দেশে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, উচ্চ নেই, নীচ নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই, উৎপীড়ক নেই, উৎপীড়িত নেই—আছে সাম্য মৈত্রী শান্তি। সেই সব দেশের ছাঁচে গৌড়কে ঢালাই করলে তার সকল ব্যাধির নিরাময় হবে। সে জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেন বংশের উচ্ছেদ সাধন। এক গোপন হস্তের নির্দেশে সেই কাজ করবার জন্য তারা প্রাণপাত চেষ্টা করতে লাগল।

এই ভ্রান্ত আদর্শবাদীগণকে সংগঠিত করবার জন্য বিদেশী চররা যে গৌড়ের অভ্যন্তরভাগে কাজ করছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। কোনও সুযোগ পেলেই তারা তার সদ্ব্যবহার করত। তাদের পিছনে ছিল প্রচুর অর্থবল এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রচার যন্ত্র। প্রচারের প্রথম

* পাণ্ডুয়ায় কালু পীরের সমাধি আছে

পর্য্যায়ে তারা দেশপ্রেমিকদের পঙ্গু করে দেয় এবং তার পর স্থুরু করে ব্যাপক স্যাবোটেজ। জাতির স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকলে এরূপ ভয়ঙ্কর রোগ বীজাণু বাড়বার সুযোগ পেত না, কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত গৌড়ের মহামন্ত্রী পশুপতি মিশ্র ছিলেন লক্ষ্মণসেনের ন্যায় স্থবির। রাজা থাকতেন ধর্মকর্ম নিয়ে, তিনি থাকতেন জ্যোতিষ নিয়ে। পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার মহামন্ত্রী কটকে বড়বাটী দুর্গ নির্মাণ করেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গরক্ষীর ব্যবস্থাও পশুপতি করেন নি। তাঁর নিশ্চেষ্টতায় উৎসাহিত হয়ে মগধ পতনের পর প্রচ্ছন্ন পঞ্চম বাহিনীর কর্মতৎপরতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়; তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে কি শাসক কি জনগণ কেউ দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারত না। গৌড়ের শেষ দিন যে আগত এ কথা যেন সবাই ধরে নিয়েছিল!

পূর্বে বলেছি, এই পঞ্চম-বাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক পীর। সমান শক্তিশালী আর এক পীর সাহ্ জালালের সাহায্য পেয়ে তুর্কী সেনাপতি সেকেন্দার গাজী ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জয় করেন। খুল্লতাত সৈয়দ আহ্মদ সাহ্রোয়ার্দির কাছে শিক্ষা সমাপনের পর সাহ্ জালাল তাঁর মুর্‌শিদের দেওয়া এক মুষ্টি লাল মৃত্তিকাসহ চলে আসেন হিন্দুস্থানে। প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পড়তে তিনি পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছেন—পথ চলেছে শত শত মাইলব্যাপী মুসলমান রাজ্যের ভিতরে দিয়ে। সর্বত্রই তিনি অভ্যর্থনা পেলেন, কিন্তু প্রার্থিত মৃত্তিকার সন্ধান কোথাও পেলেন না। শেষ মুসলমান শাসিত ভূভাগ লক্ষ্মণাবতী পার হবার পর কাফের রাজ্য শ্রীহট্টে প্রবেশ করে তিনি দেখেন, সেখানকার মাটির রং মুর্‌শিদের দেওয়া মাটির সঙ্গে মিলে গেল। আল্লা এখানে আছেন! পীর সেখানে তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন।

লক্ষ্মণসেনের অদূরদর্শিতার পরিণাম জেনেও রাজা গৌরগোবিন্দ

সাহ্ জালালকে স্বরাজ্যে প্রবেশ ও চলাফেরার অবাধ অধিকার দেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও ধীরে ধীরে তিনি দলবল নিয়ে রাজ্যের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। তার পর সুরু হয় গোহত্যা। রাজশক্তি তাতে বাধা দেওয়ায় পীর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হন, মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণের প্রতিকার প্রার্থনা করে লক্ষ্মণাবতীর সুলতানের কাছে লোক পাঠান। ঘৃণ্য কাফেরের এত বড় স্পর্দ্ধা! সুলতান ফিরোজ সাহ্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল গাজীকে শ্রীহট্টে পাঠিয়ে দেন। তিনি ওই রাজ্যে প্রবেশ করে দেখেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য একটি সশস্ত্র বাহিনী যেমন প্রস্তুত রয়েছে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তেমনি বহু লোক অপেক্ষা করছে। রাজা গৌরগোবিন্দ বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু শত্রু তো শুধু সম্মুখ থেকে আক্রমণ করছিল না, পিছন থেকেও আঘাত হানছিল। তাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।*

প্রাসাদ চক্রান্ত

লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠা মহিষী বসুদেবী ছিলেন অনন্যসাধারণ বিদুষী ও গুণবতী রমণী। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। গৌড় রাজপ্রাসাদে মাঝে মাঝে যে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোত তাতে জয়দেব, উমাপতিধর প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও অংশ গ্রহণ করতেন। দানশীলতায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। রাজকোষ থেকে যে বিপুল অর্থ তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল তার প্রায় সবটাই সাধু সজ্জন ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এই সব গুণের জন্য প্রজারা বসুদেবীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। যৌবনে তিনি ছিলেন প্রাসাদের পুত্তলিকা, বার্দ্ধক্যে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শ্বশুর বল্লালসেন যখন কঠোর হস্তে গৌড়ের শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন তখন তাঁর বিরাট

* Gait E. *History of Assam*, p. 276-77

ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস কারও ছিল না। কিন্তু পুত্রবধূর কাছে তিনি ছিলেন শিশু। বধূমাতাও শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মত। একবার কুমার লক্ষণসেন দূরদেশে চলে গেলে বিরহবিধুরা রাজবধূ আত্মহত্যা করবার সংকল্প করে নিম্নলিখিত শ্লোকটি একখণ্ড তালপত্রে লিখে রাখেন—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনা মুদা
অদ্য কান্ত কৃতান্ত বা দুঃখশান্তি করতু মে।

প্রাসাদের জনৈকা পরিচারিকার হাতে লেখাটি পড়ায় সে সঙ্গে সঙ্গে সেটি বল্লালসেনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি দ্রুতগামী নৌকা পাঠিয়ে কুমারকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন; বধূরাণীর জীবন রক্ষা পায়।

ইনি শেষ গৌড়েশ্বরী! মুষ্টিমেয় নিরক্ষর বর্বর যখন বিনা যুদ্ধে এই রাজ্য অধিকার করে তখন এই মহীয়সী নারী ছিলেন এখানকার রাজরাণী। স্বামীর ন্যায় তাঁরও ছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের ধর্মনেতাদের সঙ্গে তিনি শাস্ত্রালোচনা করতেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্তহস্তে সাহায্য দিতেন। তাঁর এই ঔদার্য্যের অপব্যবহার করে তুর্কীদের অগ্রগামী দল রাজপ্রাসাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে নেয়!

লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠা মহিষী বল্লভাও ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্তু সপত্নীর ঔদার্য্য তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে ধর্মকর্ম্ম অপেক্ষা তাঁর অনুরাগ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার উপর বেশী। রাজার পরিণত বয়সের পত্নী, সেই কারণে স্বামীকে প্রভাবিত করবার সুযোগ ছিল যথেষ্ট। পরবর্তী কালের নূরজাহানের ন্যায় এই নারী প্রাসাদাভ্যন্তরে বসে গৌড়ের শাসন ব্যবস্থায় অহর্নিশি হস্তক্ষেপ করতেন; সুযোগ পেলে স্বামীর নামে নিজ হুকুমনামাও জারী করতেন। এইভাবে রাজকর্তৃত্ব আত্মসাৎ করায় বল্লভা সভাসদদের বিরাগভাজন হন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে

আত্মকলহের বীজ বপন করে সেই চতুরা রমণী নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁর সমর্থকগণ হোত পুরস্কৃত, বিরোধীগণ নিগৃহীত।

অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে বল্লভা রাজোচিৎ শিক্ষা কোন দিন পান নি। তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন চরিত্রহীন ভ্রাতা কুমারমিত্র। ভ্রাতা ভগ্নির নীচ ব্যবহারে রাজ্য মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। একবার গঙ্গার ঘাটে এক স্ত্রীলোকের গলার হার দেখে বল্লভা তার প্রশংসা সুরু করেন। ইঙ্গিত স্পষ্ট! তা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটি যখন তাঁকে হারছড়াটি দেবার লক্ষণ দেখাল না তখন বল্লভা প্রকারান্তরে তা কেড়ে নেন। অথচ তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বরের সহধর্ম্মিণী!

যেমন ভ্রাতা তেমন ভগ্নি! কুমারগুপ্ত এক ব্রাহ্মণ যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করেন। তাঁর অনুরূপ অপকর্মের জন্য জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে; কিন্তু রাজ-শ্যালকের সাত খুন মাপ! এই সব উশৃঙ্খলতার খবর মাঝে মাঝে রাজার গোচরে আসত, কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু পত্নীকে সংযত করা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। আশাহত লক্ষ্মণসেন বেশী করে পরলোকের চিন্তায় ডুবে যেতে লাগলেন।

সপত্নীপুত্র বিশ্বরূপসেনের প্রতি বল্লভার বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি রাজার নামে অবাস্তব নির্দেশ লক্ষ্মণাবতীর এই ক্ষত্রপের কাছে পাঠাতেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করতেও তিনি পরান্মুখ ছিলেন না। এই ভাবে শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাণী বল্লভা তুর্কী আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেন।

এই প্রাসাদ চক্রান্তের সংবাদ পল্লবিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজবংশের মর্য্যাদা তাতে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে এই মর্য্যাদার মূল্য অপরিসীম। সে মর্য্যাদা পূর্বে ছিল, কিন্তু রাণী বল্লভা ও তাঁর ভ্রাতা তাকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

গৌড়ের অন্তিম সময়ে এই ছিল তার রাজপ্রাসাদ! নীতিজ্ঞান-বর্জিত এক জাতির উপর বসেছিলেন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত শাসক। ধূলির ধরণীতে বাস করেও তিনি মহাজীবনের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। সীমান্তের ওপারে প্রাচীন রাজ্যগুলি যখন একের পর এক তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছিল তিনি তা দেখেও দেখেন নি। তাঁর নিষ্ক্রিয়তায় রাজবংশ প্রজাদের আস্থা হারায়, রাজসভা বিবদমান কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতি দলই প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করবার জন্য মিত্রের সন্ধান করতে থাকে। সে মিত্র কাছেই ছিল—লোকচক্ষুর অন্তরালে!

বৌদ্ধ নির্য্যাতন

শতাব্দীকাল পূর্বে সেন বংশের অভ্যুদয়ের ফলে পাল শক্তি মগধের এক প্রান্তে সরে গেলে বৌদ্ধগণ যে তাঁদের সঙ্গে গৌড় ছেড়ে সেখানে চলে গিয়েছিল এমন নয়, কিন্তু সেনরাজগণ তাদের সম্পর্কে বরাবর একটা সন্দেহের ভাব পোষণ করতেন। হয় তো তারা বৌদ্ধ রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে, হয় তো বা তাদের আশ্রয় করে পালরাজগণ গৌড় পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছেন! তাদের বিশ্বাস করা যায় না। দুই রাজবংশের এই মানসিক দ্বন্দ্বে উলুখাকড়াদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে!

শাসক সম্প্রদায়ের এই মনোভাব বহু ব্রাহ্মণের মধ্যে সংক্রামিত হয়; তারা বৌদ্ধদের উপর নানাভাবে অত্যাচার সুরু করে। পাল যুগের সুদিন যখন চলে গেছে বৌদ্ধগণ তখন বৈদিকদের প্রাধান্য মানতে বাধ্য! যে না মানত তার উপর চলত উৎপীড়ন। রাজশক্তির হয় তো তাতে প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল না, কিন্তু নিগৃহীত সম্প্রদায়ের রক্ষা ব্যবস্থাও তাঁরা করেন নি। হতভাগ্যগণ যায় কোথায়? প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে না পেয়ে তারা মনে মনে সেন বংশের পতন কামনা

করত। তুর্কী চরগণ যে সেই ধূমায়িত বহ্নিকে কাজে লাগায় নি এমন কথা কেউ বলতে পারে না। নবদ্বীপ পতনের পর তাদের অনেকে বখ্‌তিয়ার ও তাঁর অনুচরবর্গকে নিজেদের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে; রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের মধ্যে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত কবিতাটি সন্নিবেশিত হয়—

মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিসপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশ বিস হয্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে* করএ বিনাস॥
বেদে করে উচ্চারণ বেরাযে অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিযা ধর্ম্ম মনেতে পাইযা মর্ম্ম
মারাত হোইল অন্ধকার
ধর্ম্ম হোইল যবনরূপী মাথাঅত কাল টুপি
হাতে সোভে তিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয ত্রিভুবনে লাগে ভয
খোদাঅ বলিযা এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈল্য ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ সভে হয্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হইল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।

* সদ্ধর্ম্মী—বৌদ্ধ

গণেশ হইল্যা গাজী কাৰ্ত্তিক হইল্যা কাজী
ফকির হইল্যা মহামুনি ॥
তেজিআ আপন ভেক নারদ হৈলা সেখ
পুরন্দর হইল্যা মৌলানা।
চন্দ সূৰ্জ্জ আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজান বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবিনুর।
যত্তেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খাঅ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধৰ্ম্মের পাঅ রামাই পণ্ডিত গাএ
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

কাণ্ডারীহীন রাষ্ট্রতরী

এক দিকে আদর্শের নামে আত্মঘাতী কার্য্যকলাপ এবং অন্য দিকে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এই যে সব বিশৃঙ্খলা তার মূলে ছিল জাতীয় স্বাস্থ্যহীনতা। জাতীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকলে কোন রন্ধ্রপথ দিয়ে বিধ্বংসী শক্তি এভাবে মাথা তুলতে পারত না। তেমনি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন বিজয়সেন। তাঁর প্রাড়্বিবাক জীমূতবাহনের কথা পূর্বে বলেছি। বল্লালসেনের সময়ে রাষ্ট্র তার দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে সমগ্র সেন রাজ্যকে ছেয়ে ফেলে। তখন রাষ্ট্রের বহু কাজ—তাই বহু বিভাগ। সকল বিভাগের উপরে ছিলেন মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র। তাঁর পরিচালনাধীনে সেনরাজ্য বেশ দক্ষতার সঙ্গে শাসিত হোত। পরে যখন তিনি মহাধর্মাধিকারীর পদ অলঙ্কৃত করেন তখন তাঁর ভ্রাতা পশুপতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক হরি ঘোষের স্থান ছিল হলায়ুধের নীচে। তাঁর নীতিকৌশলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক রক্ষিত হয় যে বল্লালসেন যখন এক সীমান্তে যুদ্ধ চালাতেন অন্যান্য সীমান্ত পার হয়ে কেউ গৌড় আক্রমণ করত না। তাঁর ভ্রাতা মহেশ ঘোষ ছিলেন নৌ-সেনাপতি। নদীবহুল সেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহিরাক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষার জন্য নৌ-বাহিনীর গুরুত্ব যে কতখানি তা ভালভাবে উপলব্ধি করে মহেশ ঘোষ যে নৌ-বহর সংগঠিত করেন সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার পর তেমনটি আর কেউ পূর্ব ভারতে দেখে নি। তরাইন, চান্দোয়াল ও ওদন্তপুরী জয়ের ফলে তুর্কীরা যে ভাবে সমগ্র দিল্লী-আজমীর, কনৌজ ও মগধ অধিকার করে নবদ্বীপ জয়ের পর যে গৌড়ে তা সম্ভব হয় নি তার প্রধান গৌরব এই নৌ-বাহিনীর। এর রক্ষণাধীনে সেনশক্তি সকল রাজকীয় দপ্তর ও সশস্ত্র বাহিনীসহ বঙ্গে চলে যায় এবং সেখানে থেকে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে তুর্কীদের সঙ্গে সংগ্রাম চালায়।

আলোচ্য সময়ের বহু পূর্বে হরি ঘোষ ও মহেশ ঘোষ পরলোক গমন করেছিলেন। হলায়ুধ ইহলোকে বিদ্যমান থাকলেও এক করুণ অবস্থার মধ্যে নিজ জীবনের অবসান ঘটান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে কিনা জানি না এক গভীর নিশিথে জনৈকা যুবতী তাঁর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে। হলায়ুধ হয় তো তাকে নিজ স্ত্রী বলে ভুল করেছিলেন, হয় তো বা তাকে পরস্ত্রী জেনেও আসক্ত হয়ে পড়েন। উন্মাদনার যখন অবসান ঘটল তখন এল অনুতাপ। একি করলেন তিনি! তিনি না গৌড়ের মহাধর্মাধিকারী। ঈশ্বর সাক্ষী করে গৌড়েশ্বরের কাছে শপথ নিয়েছিলেন দুর্বলকে রক্ষা করবেন, দুষ্কৃতকে বিনাশ করবেন, নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন। আর সেই তিনিই হোলেন হন্তারক!

অপরাধ যখন করেছেন তখন শাস্তি নিতে হবে, পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ব্যভিচারীদের তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতেন; কিন্তু সে দণ্ড গ্রহণের অধিকারী সাধারণ নাগরিক। আসামী যেখানে স্বয়ং মহাধর্মাধিকারী সেখানে দণ্ড আরও কঠোর হওয়া চাই। আত্মানুশোচনায় রাত কাটাবার পর হলায়ুধ পর দিন প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হোলে তাঁর অবসাদগ্রস্ত মুখাবয়ব দেখে সভাসদরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সোজা রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা অকপটে বিবৃত করে বলেন যে অপরাধীর প্রতি মহাধর্মাধিকারীর দণ্ড তিনি পূর্বেই দিয়েছেন। তাঁর আদেশে ভৃত্যরা তুষানল প্রস্তুত করল; প্রশান্ত মুখে তার উপর উপবেশন করে চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র!

গৌড় পতন

হলায়ুধের পর গৌড়ের সকল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ভ্রাতা পশুপতির উপর। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোলেও অগ্রজের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা এই ভদ্রলোকের মধ্যে ছিল না। তাঁর নীতিজ্ঞান সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিম্বদন্তী এই যে তিনি বখ্‌তিয়ার খিলজীর সহায়তায় বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে অপসারিত করে গৌড়ের অধীশ্বর হবার স্বপ্নও দেখেছিলেন।

সমসাময়িক লিপিকার মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ বখ্‌তিয়ারের দু'জন সহকারীর মুখ থেকে শোনা বিবরণের ভিত্তিতে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে দেখা যায়, লক্ষ্মণসেন ছিলেন হিন্দুস্থানের এক শ্রেষ্ঠতম নরপতি। অন্যান্য নরপতিরা তাঁকে নিজেদের প্রধান বলে মেনে নিয়ে খলিফার মত সম্মান দেখাতেন। প্রজাদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তার কোন তুলনা ছিল না। সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য লোকেদের মুখে মিন্‌হাজ শুনেছিলেন যে উচ্চ হোক নীচ হোক কোন ব্যক্তিই লক্ষ্মণসেনের কাছে কখনও অবিচার পায় নি। বদান্যতায়

তিনি ছিলেন হাতিম তাই; এক লক্ষ কড়ির কম অর্থ কখনও দান করতেন না।

মিন্‌হাজ বলেন, বখ্‌তিয়ারের মগধ জয়ের পর তাঁর খ্যাতি লক্ষ্মণসেনের কানে পৌঁছায় এবং পল্লবিত হয়ে গৌড় ও কামরূপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন জ্যোতিষী গৌড়েশ্বরের কাছে এসে নিবেদন করেন, তুর্কীদের গৌড় জয় যে সুনিশ্চিত এরূপ কথা প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ লিখে গেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর উচিত বৃথা রক্তপাত পরিহার করে বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে একটা আপোষ রফায় উপনীত হওয়া। প্রয়োজন হোলে সকল প্রজাকে অন্যত্র অপসারণ করাও যেতে পারে। এই গণনার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তুর্কী শিবিরে গুপ্তচর পাঠিয়ে যখন দেখা গেল যে বখ্‌তিয়ারের অবয়ব জ্যোতিষীদের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে তখন সন্দেহ করবার আর কোন কারণ রইল না! বহু লোক ভীতসন্ত্রস্ত মনে জগন্নাথক্ষেত্র, বঙ্গ ও কামরূপে চলে গেল।

এই অহেতুক সন্ত্রাস লক্ষ্মণসেনকে ব্যথিত করলেও তিনি রাজধানী ছেড়ে কোথাও যান নি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সবাই অন্যত্র চলে যাচ্ছিল আর তিনি বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই দেখছিলেন! অবশেষে এক সন্ধ্যায় বখ্‌তিয়ার যখন অষ্টাদশ অশ্বারোহীসহ নবদ্বীপ প্রাসাদের তোরণদ্বারের সম্মুখে এসে উপনীত হোলেন তখন তিনি সবেমাত্র নৈশ ভোজনে বসেছেন। প্রথানুযায়ী সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে তাঁকে বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়েছিলেন। কিন্তু সবই পড়ে রইল! বাইরের ফটকে গগনভেদী কলরব শুনে লক্ষ্মণসেন যখন সচকিত হয়ে উঠেছেন সেই সময়ে বখ্‌তিয়ার সদলবলে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সবাইকে অস্ত্রাঘাতে বধ করতে লাগলেন। এমনি কিছু যে ঘটবে কয়েক দিন ধরে গৌড়েশ্বর সেরূপ আশঙ্কা করছিলেন; তাই সেখানে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয় বুঝে খিড়কি দরজা

দিয়ে নগ্নপদে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল; তাতে আরোহণ করে তিনি শক্তিশালী রণতরীর প্রহরায় চলে গেলেন বঙ্গে।

যে নগরী পিছনে-ফেলে রেখে লক্ষ্মণসেন পথে বেরিয়েছিলেন সেখানে যে কী নারকীয় বীভৎসতা নেমে এসেছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবন সেনার নিষ্পীড়নে ব্যাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাতিক দলে, ভূরি ভূরি খড়্গী, ধানুকি, শূলিসমূহ সমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বাররুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

'যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। কোথায়ও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায়ও বা শঠতাপূর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব অপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরচ্ছেদ, ইহা নিয়মপূর্ব্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।'*

এই সর্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞে যে পীর জালালুদ্দীন মখ্‌দুম্ সাহ্ তাব্রেজী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এরূপ অনুমান করবার কারণ আছে। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে দেখা যায় সে তাঁর আদেশে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বহু দৈত্যের বিনাশ সাধন করা হয়। এই

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণালিনী, সপ্তম পরিচ্ছেদ

দৈত্য কারা? প্রাচীন যুগের শ্রীরামচন্দ্র থেকে আমাদের সমসাময়িক চার্চিল-রুজভেল্ট পর্য্যন্ত সকল বিজয়ীর চক্ষে পরাজিত শত্রুগণ দৈত্য ছাড়া তো আর কিছু নয়। জালালুদ্দীনের দৈত্যগণ অবশ্যই ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তাদের মন্দিরগুলি ধ্বংস করে তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষ্মণসেন চলে গেলেন! কিন্তু গৌড়েশ্বরী বসুদেবী? রাণী বল্লভা? তাঁরা কি তুর্কীদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না। আলোচ্য সময়ের দশ বৎসর পূর্বে পৃথ্বীরাজের পতনের পর এক পরাজিত হিন্দু রাজার কন্যাকে আজমীরের পীর শেখ চিস্তির কাছে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সেই হতভাগিনীকে ইসলামী মতে বিবাহ করেছিলেন। জালালুদ্দীন সেরূপ কোন অমূল্য রত্ন পেয়েছিলেন কি না তা জানা না থাকলেও মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ লিখেছেন, লক্ষ্মণসেনের নিষ্ক্রমণের পর নবদ্বীপ প্রাসাদের সকল তরুণী বখ্‌তিয়ারের হস্তগত হয়। জেহাদের নিয়মানুসারে যে তাদের বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার, ভারতীয় প্রথানুসারে বহু নারী যে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জহরের অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল সে কথাও ঠিক। বোধ হয় সেই অগ্নিশিখার মধ্যে বিলীন হয়ে যান শেষ গৌড়েশ্বরী—বসুদেবী!

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সূচী

সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা

তারাতন্ত্রম্, সম্পাদনা গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ২৯৬
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটকারিকা ১৯০
দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ২৬২
দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস ১১৫
ধর্মযুগ ৩১২
ধোয়ী, পবনদুত, অনুবাদ বোমকেশ ভট্টাচার্য্য ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১৯২, ১৯৭, ২০৩, ২৮৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গেশনন্দিনী ১৮০
,, ,, মৃণালিনী ৩৭১
বনমালী ভট্টাচার্য্য, সাগর প্রকাশ ২০৬
বল্লালসেন, দানসাগর, সম্পাদনা শ্যামাচরণ কবিরত্ন ২৮৩, ২৯৫, ৩০৭-১০
,, অদ্ভুতসাগর, সম্পাদনা মুরলীধর ঝা ৩১০
বাকপতিরাজ, গোঁড়বাহো ১৫১-৫৩, ১৬০
বাচস্পতি মিশ্র, দুর্গোৎসব প্রকরণম্ ৩০১
বানভট্ট, হর্ষচরিতম্, সম্পাদনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৩৪, ১৩৮
বাল্মিকী রামায়ণম্ ৮
বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস ৪৬
বিশ্বকোষ ১৮৫
বৃহন্নীলাতন্ত্রম্, সম্পাদনা রামচন্দ্র কাক ও হরভট্ট শাস্ত্রী ৩১১
মহানির্বাণতন্ত্রম্, সম্পাদনা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮৯, ৩০২, ৩০৩
মহাভারত ৩, ৭৪
মিলিন্দ পন্‌হো, অনুবাদ বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ৬৪
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৩১৪
যতীন্দ্রনাথ রায়, ঢাকা জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ৯
যদুনন্দন মিশ্র, ঢাকুর ২৮৩
রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ৩০৫, ৩৫২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষণিকা ৪৮
,, ,, গীতাঞ্জলি ৯০
,, ,, উৎসর্গ ২৩৬
রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা ২৮৪
রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস ১৫

English and other foreign languages

Cambridge History of India 28, 338, 351
Chachnama, Trans. Elliot H. M. & Dowson J. 155
Cœdes C. *Les etats Hindouises d'Indochine et d' Indonesie* 106, 132, 234
Colebrooke H. T. *Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance* 285-292
Conz E. *Budhism—its essence and development* 258
Cunningham A. *Book of Indian Eras* 92
,, ,, *Ancient Geography of India* 76
,, ,, *Coins of Mediaeval India* 117
,, ,, *Numismatic Chronicles* 93
Dey N. L. *Geographical Dictionery of Ancient and Mediaeval India* 279
Dipavamsa, Turnout's Trans. 57, 58
Diwakar R. R. *Bihar Through the Ages* 37
Divyavadan, E. B. Cowell & R. A. Neil's Ed. 57, 65
Datta B. N. *Mystic Tales of Lama Taranath* 222, 257
Eliot C. *Hinduism and Budhism,* 232, 312
Encyclopaedia Britanica 315
Epigraphia Indica, 237-39, 244, 265, 277
Fitzgerald C. P. *China* 157
Fleet J. F. *Inscriptions of Gupta Kings* 123-25, 153
Futuhu-I Buldan, Trans. Elliot H. M. & Dowson J. 156
Gait E. *History of Assam* 361, 362
Gibbon E. *Decline and Fall of Roman Empire* 115
Goodrich L. C. *Short History of the Chinese People* 106
Hall D. G. E. *History of South-east Asia* 132
Hitti P. K. *History of the Arabs* 346
Hoffman H. *The Religions of Tibet* 227
Huart C. *Ancient Persia and Iranian Culture* 102
Indian Antiquery 92, 218, 313
Iswari Prasad *Mediaeval India* 351
Journ. Asiat. Soc. Beng. 210, 243, 282
Krishnaswami Aiyangar J. *Ancient India and South Indian History* 267
Krishnaswami Aiyangar J. *Contribution of South India to Indian Culture,* 269
Li Tieh-Tsung *Historical Status of Tibet* 143

Smith Vincent A. *Asoka* 59

Strange G. L. *Lands of the Eastern Khaliphate* 157

Stutterheim W. F. *Javanese Period in Sumatran History* 235

" " *Studies in Indonesian Archeology* 235

Sumpa Khan-po Yese Pal-Jor *Pag Sam Jon Zang, Trans. Sarat Ch. Das* 225, 256, 276

Suzuki D. T. *Zen and Japanese Budhism* 111, 112

Thomas F. W. *Tibetan Literary Texts and Documents Concerning Chinese Turkesthan* 223

Thomas P. *Cultural Empire of India* 106

Vidyabhusan S. C. *Mediaeval School of Indian Logic* 228-34

Waddel L. A. *Budhism in Tibet* 257

Wahiduddin Begg M. *Holy Biography of Khwaja Muinuddin Chisti* 347, 348, 372

Wells H. G. *History of the World* 88

Wilson H. H. *Hindu History of Kashmir* 93, 159

Yung-Hsi, *Budhism and Chan School of China* 110

Zimmer H. *Art of Indian Asia* 85, 106, 219, 237, 299

শব্দসূচী

আ

ই

ঈ

প

ফ

ভ

য

হ

গৌড় কাহিনী সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকা ও মনীষীর অভিমত—

The author shows the same spirit as Kalhana displays in Rajtarangini

This is simply told history of Bengal from the earliest time to the advent of Muhammad Ghori and the flight of Lakshman Sen.

Paucity of materials has not permitted Sri Sailendra Kumar Ghosh to be very critical. He has accepted with delight whatever materials have been available and with these has spun a fabric, charming and graceful.

He never gets on readers nerves by showing his acumen on numerous controversial data. He shows the same spirit as Kalhana displays in his famous Rajatarangini.

There are too many dark spectra in Bengal's early history and this does not allow any historian to be sure of his ground. But with the materials available an attractive and rounded history can be written and this the learned author has done superbly. It is a book in which an intelligent reader can browse with interest.

—Amrita Bazar Patrika

A laudable attempt to trace Bengal's history

For some time now the early history of Bengal has become a popular subject for research. In fact, since Stewart's *History of*

Bengal—a pioneer work, though very haphazard—there was a long gap in research in this branch of history. In *Gaur Kahini*, the author has made a laudable attempt to trace the history of Bengal from the time of the Ramayana and the Mahabharata to the advent of Islam. It is true, very little is known of the principalities now known as Bengal during the time of the epics and the Puranas except their casual mention as powerful and rich kingdoms. King Dasaratha promised to conquer Banga and Magadha and make a present of their accumulated treasures to his favourite queen Kaikeyi. In Mahabharata time Anga, a part of Bengal, was ruled by Karna and references have been made to Samudrasena and Chandrasena, two rulers of Banga. All this goes to show that for all practical purposes Bengal, though divided into several parts, was independent, powerful and prosperous.

From the Maurya times to the reign of Ballalasena, who reformed and reorganised the Bengali social order, Bengal had produced many eminent personalities. Bhadrabahu, the Guru of Chandragupta Maurya, was a Bengali. Bengalis had successfully repulsed the Chinese and Tibetan onslaughts. Throughout the centuries Bengali culture spread far and wide and even now traces of the influence of the pioneers can be clearly found in the social and religious life of Kerala, Maharastra, Kashmir and many other parts of India.

Bengal had withstood waves of foreign invaders but fell an easy prey to the Islamic hordes. The story of Bakhtiyar and his eighteen horsemen who conquered Bengal is no flight of imagination. The old, weak and senile king, Lakshmanasena, sought safety in East Bengal, leaving his subjects to the mercy of Bakhtiyar's men. But it was only the most natural thing, as the vitality of the Bengali nation and Bengal as a state was sapped long ago. The Muslim invasion was a pre-planned affair and the plan was hatched in far away Baghdad.

Mr. Ghosh has given an interesting account of the vicissitudes

through which Bengal passed from the time of the epics to the invasion of Bakhtiyar in 1201 A. D. It is more a sociological history of the period than political, and it has become more valuable on this account. The book is attractively printed and contains a number of interesting and rare pictures.

—**Hindusthan Standard**

Brilliant work of a keen researcher

Known as Gauda in the past the present state or West Bengal has a distinct history of its own within the framework of Indian history....Untiring efforts of a historical researcher was necessary to investigate into the past events of this region and I am pleased to find that my good friend Sri Sailendra Kumar Ghosh undertook that task and published the results of his findings in a Bengali journal which has subsequently been republished in book form under the title of Gauda Kahini. In it the author has rightly placed greater importance to the cultural contribution of this region to human civilisation and also to the evolution of its social life than to the flow of political events moulded by kings and conquerers.

Under the Pals who ruled over Gauda for a long period begining from the eighth century this region remained the last citadal of Budhism in India. During this period powerful Budhist preachers like Kumarghosh, Dipankar Atish, Princess Taradevi and others of Gauda went to distant lands with the message of Budha and spread new light there. Budhist Tantrikism was perfected in this period in Nalanda, Vikramsila, Shompuri and other universities of Gauda and radiated its glow to all lands as far north as Korea and Japan.

Budhist Tantrikism was later converted to Shaiva Tantrikism with the advent of Sen power from the south in the twelveth century. This new Tantrikism mingled with Shakti

worship of Karnataka moulded into a new school of Shakti cult which produced goddesses Durga, Kali, Saraswati etc. to to be found nowhere else in India. But Budhism did not die altogether and a brilliant master like Ramai Pandit was born in modern Bankura district in the twelvth century and tried to revive that faith with his preachings contained in the Sunya Purana.

In spite of having such a bright cultural and social background Gauda was overrun by a handful of Turks at the close of the twelveth century when a poet of Jaidev's eminence had just completed his Gita Govinda. Behind this easy victory of the foreigners there was a master plan whose blueprint, according to the author's finding, was prepared at Baghdad. This chapter of the book deserves particular attention, as it has striven to find out a missing link in the history of India.

Having spent the greater part of my life in historical investigation I feel considerable delight in the work of others in this line. On going through the pages of Gauda Kahini I have reached the conclusion that here is a brilliant worker who devoted many years of hard labour to collect facts and has the imagination to recast them in proper setting. The author has done well in writing in the language of the region, but as the subject matter has a wider interest I would advise him to publish an English edition of the book.

Radha Kumud Mookerji

এই গ্রন্থ না পড়লে বাংলাদেশকে জানা হবে না—

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখিত 'গৌড় কাহিনী' পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। পুস্তকখানিতে এমন বহু তথ্য আছে যা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। কি ভাবে রাঢ়ের রাজপুত্র বিজয় সিংহ সমুদ্র পার হয়ে সিংহল দ্বীপ জয় করেন তা ওই দেশের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশ থেকে লেখক বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। গৌড়েরই এক জৈন সন্ন্যাসী শ্রুতকেবলি

ভদ্রবাহু যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন একথা জানা সকল বাঙালীর উচিত। এত দিন আমরা শুনে এসেছি যে বৌদ্ধ ধর্মের চ্যান শাখার প্রবর্তক বোধিধর্ম ছিলেন কাঞ্চিপুরের রাজপুত্র, কিন্তু লেখক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে তিনি গৌড়ের অধিবাসী। বিভিন্ন অব্দের উদ্ভাবন রহস্য নিয়ে আলোচনা করে শৈলেন্দ্রবাবু যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পর সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ধীরে ধীরে হ্রাস পেলেও অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল রাজগণের অধীনে যে গৌড়ে আবার ওই ধর্মের পুনরভ্যুদয় ঘটে শৈলেন্দ্রবাবু তা ভাল করে দেখিয়েছেন। সে সময়ে এখানকার নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুরী প্রভৃতি মহাবিহার বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সব বিহারে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা পূর্ণতা লাভ করে এবং একাদশ শতাব্দীতে পাল বংশের পতনের পর শৈবতন্ত্রে পরিণত হয়।

শশাঙ্ককে গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিলেও তিনি কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নি। তাঁর তিরোধানের পর থেকে গৌড় ও কনৌজের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময়ে বহু যোদ্ধা যে ভারত ছেড়ে ইন্দোচীনের উপকূলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল লেখকের এই দাবী বোধ হয় মিথ্যা নয়। ওই সকল অঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে ও হল্যাণ্ডের লাইদেন মিউজিয়াম রক্ষিত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে আমি ইন্দোচীনে বাঙালী প্রভাবের চিহ্ন যথেষ্ট দেখেছি।

অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কনৌজরাজ যশোবর্মা ও কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য এসে পর পর গৌড় জয় করায় এখানকার রাষ্ট্রীয় জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দেয়। তার পরেই প্রথমে পাল ও পরে সেন বংশ কয়েক শতাব্দী ধরে গৌড় শাসন করলেও এই ভূভাগকে বরাবর অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। এরই ফলে যে তুর্কীরা প্রায় বিনা যুদ্ধে গৌড় অধিকার করে নেয় একথা সবাই জানে। কিন্তু সেই জয়ের পরিকল্পনা যে খলিফার রাজধানী বাগদাদে রচিত

হয়েছিল সেকথা সাক্ষ্য প্রমাণ উল্লেখ করে প্রকাশ করায় লেখক সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে এখানি না পড়লে বাংলা দেশের অতীত ইতিহাসের বহু কথা অজানা থেকে যাবে। এমন অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা পূর্বে কেউ জানত না। সেজন্য গ্রন্থকার বহু দিন ধরে বহু সূত্র থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে পাঠকগণ যখন জানবে যে এই অবহেলিত প্রদেশ ভারত ও ভারতের বাহিরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তখন তারা গর্ব অনুভব না করে পারবে না।

হিন্দুযুগের বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে শৈলেন্দ্রবাবু এমন সব ঐতিহাসিক দলিল ও আখ্যানাদির উল্লেখ করেছেন যেগুলি সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আগে জানত না। আমার অধ্যাপক আচার্য্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বাংলার ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান আমল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। কিন্তু এখনও বহু জিনিষ অলিখিত রয়ে গেছে। শৈলেন্দ্রবাবু যাতে সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন যেজন্য তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

বিপুল পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় রচিত ইতিবৃত্ত—

'গৌড় কাহিনী' কোন আসরে বসে গল্প বলার ভঙ্গিতে লেখা। বস্তুত: আলোচ্যকালও কিংবদন্তী, কাব্য, গাথা আর কল্পনা রহস্যের। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, বাংলার ইতিহাস নেই, বস্তুত: বাংলার ইতিহাসের উপাদানও কত কম। সমগ্র ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, এখন যাকে আমরা বাংলা দেশ বলি—সেই অঞ্চলও একজন রাজার শাসনে থেকেছে খুব কম। ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেশ, ছোট ছোট সামন্ত রাজা, মারামারি, ষড়যন্ত্র—সুতরাং বিবরণ বা প্রামাণ্য দলিল রাখার অবসর তাঁরা পান নি, রাখলেও নষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না বাংলা দেশে অমুক অমুক বিখ্যাত রাজা